উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন

ও

বাংলা সাহিত্য

(১৮৫০-১৯০০)

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

UNIS SATAKE NARIMUKTI ANDOLAN -O-
BANGALA SAHITYA (1850 - 1900)

By
Dr. Ranjit Bandyopadhyay
M. A. Ph. D.

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৯৯

প্রকাশক
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রচ্ছদ
অমিতাভ ভট্টাচার্য

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৭২/৩ এফ/১ আর. কে. চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪২

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

আমার শিক্ষক
স্বর্গত হরনাথ পালকে

লেখকের নিবেদন

বিষয়টা আমার কাছে ছিল শুধু আকর্ষণীয় নয়, দায়িত্বপূর্ণ। 'নারীমুক্তি' শব্দটার মধ্যে দিয়ে ফিরে দেখতে চেয়েছি আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যকে। এ কাজে যাঁদের সহযোগিতা প্রথমেই পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন সনৎ রায়চৌধুরী (স্বামী দয়াঘননন্দ), টাকি রামকৃষ্ণ মিশন ও মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের পুণ্য আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বন্ধুবর শ্রী চিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

আমার মত একজন অনভিজ্ঞ লেখককে দিয়ে কাজ করানোর সমস্ত বিড়ম্বনা হাসি মুখে সহ্য করেছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। আমাকে হাতে ধরে লেখা শিখিয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা, কর্মব্যস্ততা সব কিছুর মধ্যেও এই গ্রন্থটির জন্য দীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তিনি আমাকে ভাবতে শিখিয়েছেন, লেখাকে পরিমার্জিত করতে শিখিয়েছেন। গ্রন্থটি আমার লেখা, এ কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণের বোঝা ভারী করলাম।

আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু স্বপন বসু (অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) এই লেখা শুরু করা থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময় আমাকে সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কর্মকাণ্ড শেষ করা সম্ভব হত না। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর দীপক চন্দ (বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা) প্রথম পর্বে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

প্রতি মুহূর্তে যাঁর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত আমার কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই পিতৃতুল্য শিক্ষাগুরু হরনাথ পাল (অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা) আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বইটি তাঁর হাতে তুলে না দেওয়ার বেদনা আমাকে অহরহ দগ্ধ করছে।

আমি বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ শ্রী নিমাইচাঁদ চক্রবর্তী ও দুর্গাপদ বর্মণের কাছে। এঁরা দুজনেই ছিলেন টাকি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক।

সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন বন্ধু শ্রী শৈলেন বিশ্বাস, সহকর্মী শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ রায়, শ্রী অনীশ রায়চৌধুরী। রজিপুরের নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, থুবার শ্রী স্মৃতি গুহ অনেক উৎপাত সহ্য করেছেন। স্নেহভাজন শ্রী অশোককুমার চক্রবর্তী ও শ্রী হরিদাস দাস আমার পরিশ্রম অনেক লাঘব করেছে।

সহধর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক দায়দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে

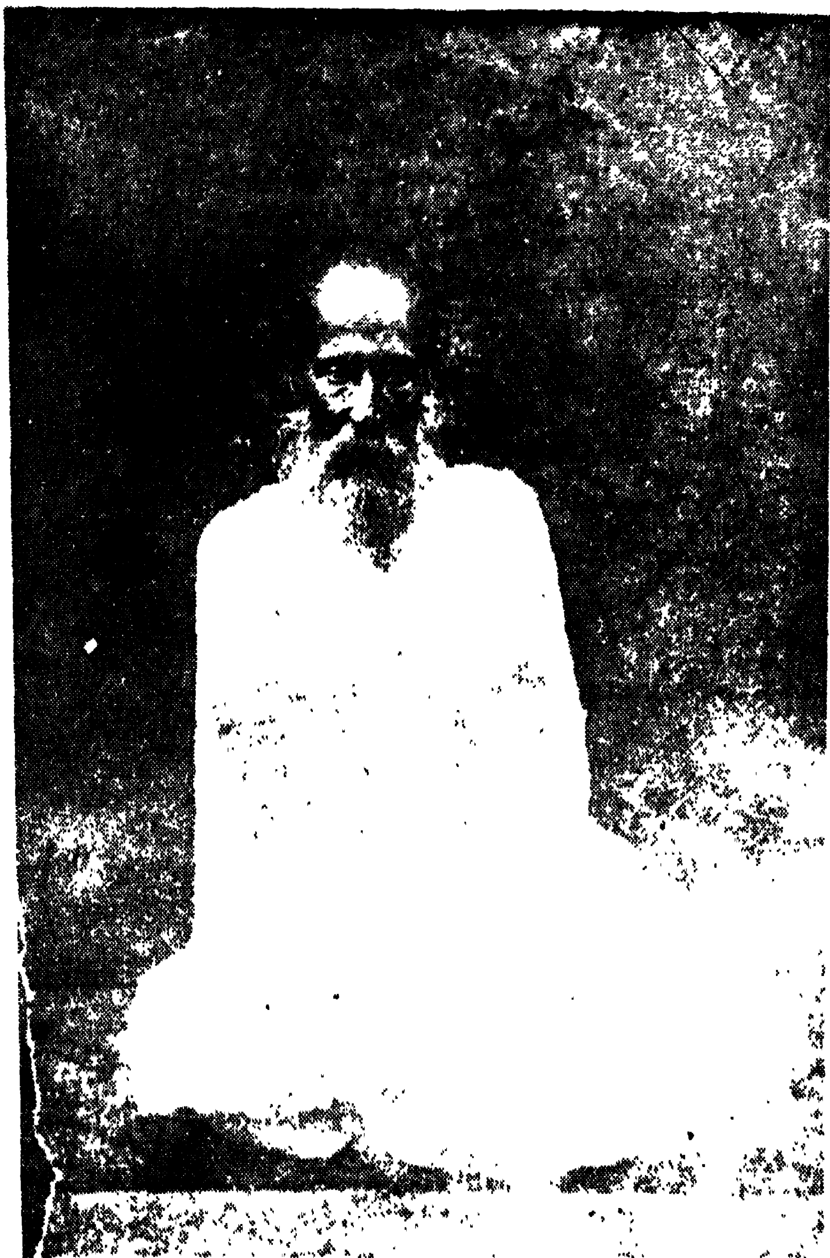
আমাকে গবেষণার কাছে সহযোগিতা করেছেন। এ কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকাকে ছোট করে দেখার নয়।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতা সবসময় পেয়েছি। দু-চারজন যাঁদের কাছে সবসময় গিয়েছি তাঁদের নাম মাত্র উল্লেখ করছি। প্রয়াত প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নিমাইন্দু ঘোষ, শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ (টাকি জেলা গ্রন্থাগার)। শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য, শ্রী শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শ্রী অরুণচাঁদ দত্ত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা)। শ্রী তপন বৈদ্য (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা)। শ্রী সনৎ বিশ্বাস, শ্রী রতন দাস, সুবোধ বিশ্বাস (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীমতী সুতৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পৃথকভাবে সকলের নাম উল্লেখ করতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত
রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকঘর : টাকি
জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা
দোলপূর্ণিমা, ২ মার্চ ১৯৯৯

সূচিপত্র



সহবাস-সম্মতি আইনের প্রবল বিরোধী শশধর তর্কচূড়ামণি

তৃতীয় সংখ্যা



প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহে অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধ



পরদিন প্রভাতে লোকে দেখিল পাগলী উদ্বন্ধনে. প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিতেছে, মুখে মাছি বসিয়াছে, কাকে চক্ষু খুলিয়া খাইবার জন্য ঠোকর মারিতেছে। যে দেখিল সেই বুঝিল, কেন সরলা মরিল। সরলা জলে ডুবিয়া মরিল না কেন? সরলা মন্নুর পার্শ্বে চিতার উপর শুইল না কেন, অন্ধকার রাত্রি কেহত দেখিতে পাইত না। এমন করিয়া মরিলে দেশের লোক তাহার দোদুল্যমান মগ্ন শরীরের দিকে ত তাকাইত না, এমন করিয়া কাকে ত সোনার অঙ্গে ঠোকোর মারিত না। পোষ্টমর্টেমের জন্য পুলিশে ত রজ্জু কাটিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইত না! না—তাহা হইলে দেশের লোক ত রাজাকে ধিক্কার দিত না, দানব পিশাচেরা এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া লজ্জিত, ভীত হইত না। তাহা হইলে সমাজ সংস্কারকেরা নিজদিগের কৃত কর্মসকলের এমন নিদর্শন দেখিয়া, এত স্পর্দ্ধা ত করিতে পারিত না। সরলা এত কথা বুঝিয়াছিল, তাই জীবনধিকারছবী নিজ জীর্ণ শরীরকে গাছের আগায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল।

সহবাস সম্মতি আইন পাশের পরিণতি

সুলভ সমাচার —
১ম বর্ষ, ১২৮৬, ২৬ অগ্রহায়ণ।



স্বাধীন স্ত্রী।

শ্রীমতী গদাধরী স্বাধীন হইয়াছেন। তিনি আর এখন কটকী পেড়ে সাড়ী পরিধান করেন না, দিন কতক সাড়ী ছাড়িয়া গাউন ধরিয়াছিলেন, এবং খোপানী মেম্ সাহেব বলিয়া না ডাকিলে মনে মনে বড় রাগ করিতেন। তারপর তিনি শ্রবণ করিলেন যে ইংরাজদিগের ভিতর স্ত্রী স্বাধীনতারূপ বিক্রম ষোল আনা ফূর্ত্তি পায় নাই। মেমদিগকে আজও সাহেবদের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়; মেমেরা যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যার নিকট ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন না। গদাধরী এই সকল অসহ্য সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই চটিয়া গেলেন। বলিলেন কি এখনও, ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও স্ত্রী পুরুষের ভেদ বিচার? ইংরাজ হইয়া স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার! ইংরাজ জাতিটা বয়ে গিয়াছে। কেন মেয়ে পুরুষ কি সমান নহে? মেয়েরা কি মানুষ নহে? সাহেবেরা পেণ্টুলান পরিবে, মেমেরা গাউন পরিবে; সাহেবেরা এক রকমের টুপী পরিবে মেমেরা অন্য রকমের টুপী পরিবে; সাহেবেরা মুখে চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আফিসে যাইবে, আর মেমেরা ঘরে বসিয়া সন্তান পালন করিয়া সোণার জীব

স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে সুলভ সমাচারের মনোভাব

ভূমিকা

নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত :

মুসলমান শাসনকর্তাদের সময়ে ঐতিহাসিক কারণে স্বাভাবিক ভাবেই নারীস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।[১] অত্যাচারের ভয়ে তখন মানুষের ধনসম্পত্তি ইত্যাদির নিরাপত্তা প্রায় ছিলই না। সমাজের সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থায়, নারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল একের পর এক বাধানিষেধ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি। ফলে হিন্দুসমাজে নারীর স্বাধীন স্বকীয় আত্মবিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

উনিশ শতকে আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নব্য বঙ্গসমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মতোই নারীর শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। বাংলায় নারীকল্যাণমুখী সামাজিক আন্দোলনগুলি তারই ফলশ্রুতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইউরোপ থেকে এলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ, এলেন মেরি কার্পেন্টার, আবির্ভূত হলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মধুসূদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, উদারহৃদয় বেথুন প্রমুখ সংস্কারক। এঁরা সকলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে আত্মবিকশিত নারীর ভূমিকার অসামান্য গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এঁদের চেষ্টায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশে বইতে লাগল নারীকেন্দ্রিক নানা সামাজিক আন্দোলনের ঢেউ। যথা,

১) সতীদাহ নিবারণ।

২) স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন।

৩) বিধবাবিবাহ আন্দোলন।

৪) বহুবিবাহ আন্দোলন।

৫) বাল্যবিবাহ আন্দোলন।

নারীকেন্দ্রিক এই মুখ্য আন্দোলনগুলির পাশাপাশি আরও কয়েকটি গৌণ আন্দোলন উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা,

১. Iswari Prosad, 'History of Mediaeval India', (3rd Ed.), p. 525.

১) পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দাবির আন্দোলন।
২) পণপ্রথার বিলোপ আন্দোলন।
৩) পর্দাপ্রথার বিলোপ আন্দোলন।
এছাড়া নিম্নের দুটি আন্দোলন নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল :
১) অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন।
২) অসম বিবাহ লোপ।
এই গৌণ আন্দোলনগুলির কথাও আমার আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

এ সময়েই আইনের আশ্রয় নিয়ে সমাজদেহ থেকে আরও একটি কুসংস্কাররূপ ব্যাধির মূল উৎপাটন করেছিলেন সমাজসংস্কারকরা। যেমন,

গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন।

॥ ২ ॥

সংস্কারকগণের নারীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার কারণ :

নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি ছাড়া সেদিন ছিল দেশজোড়া অশিক্ষা। জনগণের দুঃখ দারিদ্র্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অথচ সংস্কারকগণের কাছে এগুলি রইল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, তাঁরা তাঁদের মনোযোগের লক্ষ্য করলেন প্রধানত নারীকে। ব্যাপারটা আপাত বিস্ময়কর, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কুচিত রূপটিই চোখে পড়ে। এর পশ্চাৎপটে কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হলে আমরা দেখতে পাব যে, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের সংস্কারকদের সামনে পাশ্চাত্যের তুলনায় এদেশের নারীর শোচনীয় হীনাবস্থা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁরা দেখেছিলেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তাই এর প্রতিবিধানই তাঁদের কাছে আশু প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। সামাজিক নির্যাতন থেকে নারীদের মুক্ত করে, মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার তাগিদেই এঁরা তাই সংগ্রামব্রতী হয়েছিলেন। মিশনরিগণও এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালির মনে জেগেছিল আত্মমর্যাদা ও তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্র মূল্যবোধ। মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই এ যুগে মানবধর্মের সাধনা বলে একান্তভাবে গণ্য করা হয়েছিল। তাই নারীত্বের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধ সংস্কারকদের নারীকল্যাণে নিয়োজিত করেছিল। সমাজের সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করেও অনেকে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকে নারীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহনশীলতা, স্নেহবাৎসল্য, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের সান্নিধ্যে এসে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত সম্ভবত এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, যা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আলোচ্য পর্বের কয়েকজন খ্যাতনামা মনীষী যথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সংস্কারক অথবা দেশনেতা এইভাবে হয় বাইরের প্রভাব অথবা অন্তরের তাগিদ, অথবা উভয় কারণে নারীমুক্তি ও নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাজেই এঁরা দাবি তুললেন নারীকে শিক্ষার অধিকার দিতে হবে, পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার মেনে নিতে হবে। পুরুষের যদি দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার থাকে, নারীরই বা থাকবে না কেন? স্বাধীন জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের আগেই নারীকে বিবাহের জাঁতাকলে ফেলে তাকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্রে পর্যবসিত দেখতে সংস্কারকরা রাজি ছিলেন না। ফলে ঊনবিংশ

শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস নানা সংস্কারাত্মক আন্দোলনের আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠেছিল। তার সবগুলি অবশ্য নারীকেন্দ্রিক নয় কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশ বড় আন্দোলন নারীর অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে গড়ে উঠেছিল।[২] প্রথমার্ধের সতীদাহ আন্দোলনকে বাদ দিলে দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য পর্বে নারীকেন্দ্রিক প্রধান প্রধান সংস্কার আন্দোলন এইগুলি :

১) স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন।
২) বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও তৎসহ বিবাহে রেজিস্টেশন।
৩) বহুবিবাহ আন্দোলন।
৪) বাল্যবিবাহ আন্দোলন।

উপরি উক্ত আন্দোলনগুলি সমাজকে কী গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল, আমাদের এই গ্রন্থে একদিকে যেমন তার পরিচয় বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সমকালীন সাহিত্যে ঐ আন্দোলনসমূহের প্রতিফলনের ব্যাপারটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

বিষয় ও সময় নির্বাচনের কারণ :

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন ও তার গতিপ্রকৃতির লক্ষণ জানা একান্ত প্রয়োজন। উল্লিখিত লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের পূর্ণচিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান প্রধান সংস্কার আন্দোলন যথা, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ আন্দোলন ও বাল্যবিবাহ আন্দোলনের (প্রথমার্ধে এগুলির সূত্রপাত মাত্র) যে বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেছি তা ইতিপূর্বে ঐ আকারে আর কোথাও উপস্থাপিত হয়নি। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ আন্দোলনকে যথাযোগ্য পটভূমিকাসহ তুলে ধরার যে প্রয়াস পেয়েছি তার গুরুত্ব সুধীমহলে স্বীকৃত হবে বলে আশা করি। নারীকেন্দ্রিক সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহ আন্দোলনই

২. ক) It is Somewhat singular that almost all the important Social reforms of the Nineteenth century should centre round women.
R. C. Majumdar, 'British Paramouncy and Indian Renaissance', Part II (1965), p. 260.
খ) 'The Social Reforms in the 19th century were mainly directed towards removing the sufferings and disabilities of women.'
R. C. Majumdar, 'Renascent India' (Nineteenth Century), p. 72.
গ) R. C. Majumdar, 'Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century', (1960), p. 54.
ঘ) Nemai Sadhan Bose, 'The Indian Awakening and Bengal' (2nd Ed. 1968, p. 38)
ঙ) S. Natarajan, 'A Century of Indian Social Reform', p. 18.
চ) Narendra Krishna Sinha (Ed.), 'The History of Bengal' (1757-1905) 1964, p. 220.
ছ) Pradip Sinha, 'Nineteenth Century Bengal', 1965, p. 104.
জ) Atul Chandra Gupta (Ed.), 'Studies in Bengal Renaissance' 1958, p. 10.

সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সবথেকে বেশি নাড়া দিয়েছিল। অথচ দ্বিতীয়ার্ধের এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি সম্বন্ধে গবেষকরা প্রায় নীরব। সেই উপেক্ষার বাধা অতিক্রম করে এই আন্দোলনের স্বরূপটি আমরা এখানে তুলে ধরেছি এবং লুপ্তপ্রায় পত্রপত্রিকা থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

॥ ৪ ॥

নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের সাহিত্যে প্রতিফলন :

এই গ্রন্থে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের সাহিত্যে প্রতিফলনের ব্যাপারটিও অভিনবত্বের দাবি রাখে। ইতিপূর্বে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন সেই আন্দোলনসমূহের সাহিত্যে প্রতিফলনের দিকটি উপেক্ষাই করে গেছেন। আমরা বহু আয়াস স্বীকার করে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, যথা কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকার বিভিন্ন রচনায় নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রতিফলন দেখিয়েছি। প্রসঙ্গত বলে রাখছি যে, যে সমস্ত গ্রন্থকে এখানে নাটক বলে উল্লেখ করেছি, তাদের অধিকাংশই নাটক নয়, লঘু প্রহসন মাত্র। আবার, কেবল রসের দিক দিয়েই যে প্রহসন তাও নয়। আকারের দিক থেকেও অধিকাংশ রচনাই সাধারণ প্রহসনের আকৃতি থেকেও ক্ষুদ্র। সুতরাং এদের নিতান্ত শিথিলভাবে নাটক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাটকের মাধ্যমে সমস্যাগুলির বাস্তব পরিচয় যত অস্পষ্ট হোক, এদের রূপায়ণে সাহিত্য শিল্পের দাবি অনেকখানি পূরণ হয়েছে। সামাজিক উপন্যাস ও সামাজিক নাটকের প্রকৃতিগত এ পার্থক্যও চোখে পড়বে।

ইতিহাসকেন্দ্রিক গবেষণায় অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমরা যেমন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত অনেক সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছি, ঠিক তেমনি নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত যে ভবিষ্যতে খণ্ডিত হবে না এমন অনড় দাবি আমাদের নেই।

তবে একথা ঠিক, বর্তমান নারীসমাজ যে সবদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছে এর ইতিহাস জানতে হলে বিগত শতকের নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ও সমকালীন সমাজমনের পরিচয় সমগ্রভাবে জানার একান্ত প্রয়োজন, যা আমি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছি।

বর্তমান পণপ্রথার বিভীষিকা থেকে নারীসমাজকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় এ প্রশ্ন আজ আমাদের সকলের। আমার আলোচনা তার পথ দেখাবে। ভবিষ্যৎ নারীসমাজের অগ্রগতির আরও নতুন নতুন পথ আবিষ্কারে সহায়ক হবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে নারীর অধিকারের দাবি নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, আমার গ্রন্থটি তাকে শক্তিশালী করবে। বিগত শতকে পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের চিত্র দেখে বর্তমান সভ্যসমাজ ঘৃণায় তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। পুরুষ সমাজের চোখ ফুটবে। হয়তো নিজেদের কুকর্ম দেখে লজ্জা পেয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বধূহত্যার উপশম হবে। এককথায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ যুগোপযোগী।

সমাজের সাধারণ মানুষের স্বার্থ ছাড়া গ্রন্থটি বাংলা অনার্স ও এম.এ ছাত্র-ছাত্রীদের কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ—এককথায় সাহিত্য-আলোচনায় বিশেষ সহায়ক হবে। আগামী দিনের গবেষকরাও নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাবেন, যা আমি লুপ্তপ্রায় পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধার করেছি। পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কাছে বিগত শতকের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার এটি এক বিনীত প্রয়াস।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন
(১৮৫০-১৯০০)

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিস্টান মিশনরি সম্প্রদায়। ১৮১৪-তে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মিঃ মে নামে এক খ্রিস্টান মিশনরি এ বিষয়ের সূত্রপাত করেন। মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বাঙালি মেয়েদের খ্রিস্টান করা। ১৮১৮-এ তাঁর মৃত্যুতে সাময়িকভাবে এ প্রয়াসে ছেদ পড়ে। তবে ১৮১৭-এ একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' বা 'স্কুল সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে।

ত্রিশের দশকে ইয়ং বেঙ্গলরা পত্রপত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখালেখি শুরু করেন, সভাসমিতিতে আলাপ-আলোচনা চালান এবং ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ মেয়েদের বাড়িতে ইংরেজি ও বাংলা লিখতে পড়তে শেখান। এঁদের প্রচেষ্টায় এক শ্রেণীর মানুষ সে সময় এ বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনরি সম্প্রদায় ও ইয়ং বেঙ্গল ছাড়া কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। পত্রপত্রিকা ও সভাসমিতিতে এ নিয়ে আলোচনা চলে। তবে এ পর্বে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল কোনও মনোভাব গড়ে ওঠেনি বরং একদল রক্ষণশীল মানুষ এর বিরুদ্ধে বেশ সক্রিয়। অবশ্য মিশনরিদের ধর্মান্ধতা ও ইয়ং বেঙ্গলদের অসামাজিক আচরণ এজন্য অনেকাংশে দায়ী। ধর্মশিক্ষার বাড়াবাড়ির জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও মিশনরি স্কুল সম্পর্কে বিরূপ হয়ে ওঠেন। বাঙালি সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পর্দাপ্রথা তখনও উঠে যায়নি। ফলে ভদ্রঘরের মেয়েরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পড়তে আসত না। যারা আসত, বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজব্যবস্থায় তাদের স্থান ছিল পায়ের নীচে। তারাও কতটা শেখার আগ্রহে ও কতটা সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রলোভনে আসত তা ঠিক বলা যায় না।

এ দেশীয়দের উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭-এ বারাসতে। উদ্যোক্তা বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র ও সহোদর নবীনকৃষ্ণ মিত্র। উদার মানসিকতার শরিক হতে

না পেরে, এ দুঃসাহসিক কাজের অপরাধে বারাসতবাসী এঁদের উপর সামাজিক নির্যাতন চালায়, এঁদের একঘরে করে।

এরকম পরিবেশে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হয়ে কলকাতায় এলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। কর্মদক্ষতায় অল্পদিনেই তিনি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হলেন। এই বেথুন এদেশে এসে নারীকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রামগোপাল ঘোষের কাছে। তিনি এ ব্যাপারে মৌখিক সমর্থন জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেননি, নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করলেন। স্কুলের প্রথম ছাত্রী সংগ্রহের কাজও তিনি করলেন। নিজে থেকে এগিয়ে এলেন তাঁরই বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি তাঁর সুকিয়া স্ট্রিটের বৈঠকখানা ঘরটি বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দেন। প্রাথমিক প্রস্তুতির পর বেথুন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়িতেই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর সূত্রপাত করেন। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত এই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর প্রাঙ্গণ থেকে। স্ত্রীশিক্ষারও সূত্রপাত এখান থেকেই।[১] ২১টি মেয়েকে নিয়ে এর যাত্রা শুরু। গড়ে প্রত্যহ জনাদশেক ছাত্রী উপস্থিত থাকত। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে এই ছিল বেথুনের আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুসমাজের বড় বড় কর্ণধারদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও সলাপরামর্শ—করেননি[২] বা তাঁদের সাহায্য চাননি। এমনকি মিশনরিদের সাহায্যও প্রত্যাশা করেননি। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছাড়া নিজে থেকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সর্বাগ্রে তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করে দেন, বিনা বেতনে বেশ কিছুদিন তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ান এবং স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষা সমর্থন করে ১৭৭২ শকে ভাদ্র সংখ্যায় 'সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা'য় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষা দেওয়ার স্বীকৃতি দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর একান্ত অনিচ্ছার বশেই যা স্বীকৃত হয়েছিল, মদনমোহন তা কিরূপ স্বাভাবিকভাবে সে সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন, প্রবন্ধটির অংশবিশেষের উদ্ধৃতিতে তার পরিচয় মেলে :

"বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিকাস্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে।"

মদনমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁদের মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমনাথ রায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দে, দেবনারায়ণ দে,

১. Sitanath Tattabhusan, 'Social Reform in Bengal' (1904), p. 44.

২. 'সম্বাদ ভাস্কর', মে ১৮৪৯

হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও হরকুমার বসু প্রমুখ নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীকে ভর্তি করে দেন।[৩]

'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ রসরাজ', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এবং অধিকাংশ ইংরেজি পত্রিকা বেথুনের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরে। তবে বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে অধিকাংশই এর বিরোধিতা করে। তীব্র বিরোধিতা করল 'সমাচার চন্দ্রিকা'। 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর' সম্পাদক ইংরেজনবিশ কাশীপ্রসাদ ঘোষও বিরুদ্ধে কলম ধরলেন।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের আহ্লাদ বালকোচিত :

"হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন।"[৪]

তবে বেথুনের প্রয়াসকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সমর্থনের ভাষা সবচেয়ে বেশি জোরালো। বেথুনের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে গৌরীশঙ্কর ২৬.৫.১৮৪৯ তারিখে সম্বাদ ভাস্করে লেখেন,

"সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি? এখন আমরা আমাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি, ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন...সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূলে বাক্যই কহিব।"

'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর'-এর সম্পাদক ইংরেজনবিশ কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে সমূহ অনিষ্ট সম্ভাবনা বিবেচনা করে তাঁর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলে ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর গর্জে ওঠেন,

"হে সম্পাদক মহাশয় হিন্দুবালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন। কিন্তু গোলের কথা কিছু নহে, আপনি কি বোধ করিয়াছেন বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে লিখিলেই প্রাচীন মতস্থ মান্য হিন্দুদিগের কোন দলভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা যদি হয় তবে কি বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। প্রিয় ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মনে করিবেন না এই সুযোগে বিনা ব্যয়ে তাঁহার সমন্বয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, হিন্দুবালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দোষগুণ আমারদিগের পত্রপ্রেরকেরা দুই পক্ষ হইয়া ইহার বাদানুবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমরা উভয় পক্ষের বলাবলি সমস্তই বুঝিতেছি কিন্তু পত্রপ্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারি

৩. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', সং ১৯৭৫, পৃ. ১৭৪-৭৫

৪. 'সংবাদ প্রভাকর', ৩৪০ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ ১২৫৬

না, প্রার্থনা করি একজন মান্য সম্পাদক হিন্দুবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষে না দেখেন, অতএব 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর' সম্পাদক মহাশয় যদি এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়েন তবে আমরা আহ্লাদিত হইব।"[৫]

লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে দ্বারকানাথ রায় 'সুলভ পত্রিকা'য়[৬] লেখেন,

"এ প্রশ্নে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে। কিন্তু পত্নী পণ্ডিত হইলে যে পতির প্রাণবিয়োগ হয় এ কথা অতি চমৎকার।"

বেথুনের এ প্রয়াস রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেননি। বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠানোর প্রয়োজন তো এঁরা বোধ করলেনই না, বরং যাঁরা মেয়ে পাঠাতেন ও এ-ব্যাপারে সাহায্য করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতির আন্দোলন গড়ে তুললেন সর্বত্র। সামাজিক নির্যাতন চলত তাঁদের ওপর। এমনকি বিদ্যালয়ে গমনরত ছোট ছোট বালিকাদের উদ্দেশ্যে অভদ্র মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেও এঁদের বিবেকে বাধত না। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বৈঠকী আড্ডা জমে উঠল। লোকে বলতে লাগল, "এইবার কলির যা বাকি ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না। রামনারায়ণ তর্করত্ন রসিকতা করে বাবুদের মজলিসে বলতে লাগলেন, বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে? এক 'আন' শিখাইয়া রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"[৭] মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর মেয়েদের স্কুলে দেওয়ায় ও নিজে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তো খেপেই আগুন। কোথাও পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখা হলেই কথা হয়, 'ওরে মদনা করলে কি?' ৮।৯ বছর তাঁকে সমাজচ্যুত থাকতে হয় ও আজীবন সামাজিক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।[৮] গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত তাঁর মেয়ে আর ভাগ্নীকে স্কুলে পাঠানোয় যাদের সঙ্গে মেয়ে দুটির সম্বন্ধ হয় তারা মেয়ে দু'টিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।[৯] এমনকি ভাস্কর সম্পাদকের কাছে বিদালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'দিন পরে 'কেনাচিৎ প্রাচীন মতস্থ হিন্দুনাং' এই শিরোনামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলেন যে, "এতন্নগরে শ্রীযুক্ত অনারেবল বেথিউন সাহেব কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে অধিকাংশ হিন্দুগণের অপরিমিত আদি ব্যাধির উদয় হইয়াছে।"[১০]

৫. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৩য় খণ্ড), ১৩৬৬, পৃ. ১২৬
৬. 'সুলভ পত্রিকা' (১-২ সংখ্যা), ১২৬১
৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ২য় সং, পৃ. ১৭২-৭৩
৮. 'কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদগ্রন্থ সমালোচনা', সং ১৯২৮, পৃ. ২২
৯. R. C. Majumdar, 'British Paramouncy and Indian Renaissance' Part-II (1965), p. 65.
১০. 'সম্বাদ ভাস্কর', ৯ মে ১৮৪৯

সবদিক দিয়ে বেথুনের চলার পথ মসৃণ ছিল না। এমনকি ছাত্রীর অভাবে একসময় বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ১৯.৩.১৮৫০-এ গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে লেখা বেথুনের পত্রে তা জানা যায়।[১১]

সমস্তরকম প্রতিকূলতার মধ্যেও বেথুন স্কুল চালু রাখেন। মাসিক ব্যয় বাবদ ৮০০ টাকা তিনি নিজের পকেট থেকেই দিতেন। বিদ্যালয়ে আসতেন প্রতিদিন। ছোট ছোট মেয়েদের সমস্ত আবদার হাসিমুখে সহ্য করতেন। বেথুনের উৎসাহ ও আগ্রহে কোনও উপায়ে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল এগিয়ে চলল। এ সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চন্দ্রিকা সম্পাদক) মৃত্যুতে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে হয় ৩১।[১২] বেথুনের তখনও সংশয়, বিদ্যালয়ের কি একটা নিজস্ব ভবন হবে না? এবং কোনওদিনই কি তা নিজের পায়ে দাঁড়াবে না?

বেথুনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিল। দক্ষিণারঞ্জন মির্জাপুরে একখণ্ড জমি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে দান করেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রদত্ত মির্জাপুরের জমির পাশাপাশি একখণ্ড জমি, বেথুন ১০,০০০ টাকায় কিনে নিলেন এবং মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধার কথা চিন্তা করে, বাংলা সরকারের হেদুয়ার কাছের একখণ্ড জমির সঙ্গে ঐ জমি বদল করলেন। মতিলাল শীল হেদুয়ার পশ্চিমদিকে তাঁর ইজারা নেওয়া জমি বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ছেড়ে দিলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্কুলের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। বিদ্যাসাগর হলেন অবৈতনিক সম্পাদক। স্কুল বাড়ি তৈরির ৪০,০০০ টাকার অধিকাংশই বেথুন তাঁর পকেট থেকে দেন। মৃত্যুর পূর্বে ত্রিশ হাজার টাকার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বিদ্যালয়টির জন্য উইল করে যান। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এজন্য ১০,০০০ টাকা দেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের কাজ শেষ হয়। কিন্তু বেথুন আর তা দেখে যেতে পারেননি।

বেথুনের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তবে ডালহৌসী ও তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সাহায্যে কোনও উপায়ে বিদ্যালয়টি টিকে থাকে। ইতিমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সরকারি মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং ১৮৫৪-তে উডের ডেস্‌প্যাচে স্ত্রীশিক্ষা বাবদ ব্যয় মঞ্জুর করার অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হয়। ৬ মার্চ ১৮৫৬ ডালহৌসী ভারত-ত্যাগ করেন। পূর্ব ব্যবস্থা মতো তাঁর ভারত-ত্যাগের পর সরকার বেথুন স্কুলের দায়িত্ব নেওয়ায় এর অনিশ্চিত অবস্থার অবসান হতে থাকে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' নাম পরিবর্তন করে 'বেথুন স্কুল' নামকরণ করা হয়।

বেথুনের দৃষ্টান্তে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও দু-একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনও এ সময় ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।[১৩] তবে অনুকূল কোনও মনোভাব এ সময়ে গড়ে ওঠেনি।

১১. J. A. Richey, 'Selections from Educational Records' Part-II (1965), p. 53

১২. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', সং ১৯৭৫, পৃ. ১৭৬

১৩. J. A. Richey, 'Selections from Educational Records' Part-II, pp. 52-56

এরপর এলেন বিদ্যাসাগর। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কাজ করায় এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তবে সম্পাদকের কর্তব্য পালনের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মপ্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মেয়েদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কথা চিন্তা করে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৫.৪.১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৪ থেকে ১১ বছর বয়সের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৮ জন ছাত্রী নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটলাট। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন। এছাড়া বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে কিছু সরকারি সাহায্যও পেয়েছিলেন। কাজেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভবিষ্যতে সরকারি সাহায্য পাবেন একথা চিন্তা করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে পর্যন্ত বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ চারটি জেলায় পরে আরও ১৫টি অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৫০টি[১৪] বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারি সাহায্যের আবেদন জানান। বিদ্যাসাগরের অপরাধ, ভারত সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়াই তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করার ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন। সরকার এ সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের দুশ্চিন্তায় কাতর। কাজেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অর্থব্যয় করার মতো মানসিকতা ছিল না। বিদ্যাসাগর হাল ছাড়লেন না। নিজের উপার্জিত অর্থ ও বন্ধুবান্ধবদের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোনওরূপে বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার চালিয়ে যান এবং ভারত সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য অনুমোদনের প্রয়াস চালান। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছোটলাটের সমর্থনের কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বিদালয়গুলি প্রতিষ্ঠা বাবদ সমস্ত খরচ মঞ্জুর করেন। তবে এ ব্যাপারে কোনও স্থায়ী সাহায্য মঞ্জুর করা হল না। বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনের জন্য বিদ্যাসাগর একটি নারীশিক্ষা ভাণ্ডার খুললেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সাহায্য ছাড়া অনুরাগী বন্ধুরা এতে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিতেন। বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে, একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়ে চলে। সরকারও শেষপর্যন্ত কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন।[১৫]

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্মদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মরা চিরদিনই সংস্কার আন্দোলন সমর্থন করেছেন। কাজেই এঁরা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনেরও পক্ষপাতিত্ব করেছেন। শিক্ষালাভে এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে এবং ভারতের যে কোনও সম্প্রদায়ের তুলনায় শিক্ষার হারও এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের সর্বাধিক।[১৬] তবে শিক্ষার রীতিপদ্ধতি বিষয়ে এঁরা একমত হতে পারেননি। একদল অত্যুৎসাহী যুবক স্ত্রী ও পুরুষকে একই ধরনের শিক্ষা দিতে আগ্রহী। অপর একদল স্ত্রী

১৪. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', সং ১৩৭৬, পৃ. ১৭১
১৫. 'বামাবোধিনী', বৈশাখ-চৈত্র ১২৭২
১৬. Atul Gupta, ed, 'Studies in Bengal Renaissance', Cal 1958, p. 502.

পুরুষ উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা চিন্তা করে শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু বৈষম্য রাখার পক্ষপাতিত্ব করলেন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত হল। ফল কিন্তু ভালই হল। কতিপয় প্রথম সারির ব্রাহ্ম নেতার এ বিষয়ক কর্মপ্রয়াস আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে।

এই সমাজের অন্যতম প্রবীণ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষা সমর্থন করতেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বেথুন স্কুলে কন্যা সৌদামিনীকে ভর্তি করে দেন এবং রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন, "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"[১৭] মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের কথাও লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী 'পৃথিবী' (১৯৮৫) নামক বৈজ্ঞানিক পুস্তকে। নারীদের সাহিত্যচর্চা পছন্দ করতেন বলেই পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কন্যা স্বর্ণকুমারীর পক্ষে পত্রিকা পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল। হিরণ্ময়ী দেবী, সরলাদেবী ও ইন্দিরাদেবী তাঁর জীবিতকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রায় প্রথম সারিতেই আপনাদের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি অন্তঃপুর শিক্ষারও পক্ষপাতী ছিলেন, কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তার সংস্কার'[১৮] প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর এ বিষয়ক প্রয়াস নিজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের আর এক নেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) তাঁর এ বিষয়ক কর্মপ্রয়াসকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য মহিলা শিক্ষকের আবশ্যকতা চিন্তা করে তিনি সর্বাগ্রে একদল দেশী শিক্ষিকা গড়ে তুলতে চাইলেন এবং (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর) ব্রাহ্মসমাজে এ উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যাসাগরও ছিলেন আর ছিলেন মেরি কার্পেন্টার[১৯] যিনি সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে এদেশে এসেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর নীতিগতভাবে[২০] কোনও আপত্তিও ছিল না। কিন্তু হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির কথা চিন্তা করে তিনি কমিটি থেকে নিজের নাম কেটে দেন, বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হনও।

১৭. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পত্রাবলী', পৃ. ৪০

১৮. 'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৬

১৯. ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মিস্ কার্পেন্টার ভারতবর্ষে আসেন। কলকাতায় এসে প্রথম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে ব্রাহ্মদের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হন। তাঁর প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন স্থানে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য অর্থমঞ্জুর করেন।

ক) কুমুদিনী মিত্র, 'মেরি কার্পেন্টার', সং ১৯০৬, পৃ. ১৮

খ) যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কেশবচন্দ্র সেন', পৃ. ৪১

২০. 'Journal of Asiatic Society of Bengal' Vol. XXIII, (1927), by Brajendranath Bandyopadhyay, Article-31

সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম ঐতিহাসিক চার্লস হিমসাথ তাঁকে রক্ষণশীল বলে অভিহিত করলেন।[২১] একই অভিযোগ করলেন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদক। বেথুন স্কুলের সঙ্গে শেষপর্যন্ত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি জুড়ে দেওয়া হল এবং তিন বছর যেতে না যেতেই বিদ্যালয়টি ছাত্রীর অভাবে উঠে গেল।

১৮৭১-এর ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মির্জাপুর স্ট্রিটে কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত ঝুঁকি ও দায়দায়িত্ব নিয়ে পুনরায় 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুল সংশ্লিষ্ট 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুলটি' এ কারণে উঠে গেল। এমনকি ঢাকা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুলটি'ও ঠিকমতো চলত না। স্বাভাবিক কারণে গভর্নমেণ্টও এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ছিল। গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের এরূপ ঔদাসীন্যের মধ্যেও দ্বিতীয়বার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করায় 'ঢাকাপ্রকাশ'[২২] তাঁর বিদ্যানুরাগ ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের কঠোর সমালোচনা করে।

স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক বিবেচনা করে কেশবচন্দ্র সেন উভয়ের শিক্ষার রীতিপদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য রাখতে চাইলেন। তিনি একাধারে মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষার প্রতি যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করলেন, বিজ্ঞান ও নীতিশিক্ষার প্রতিও সেরূপ গুরুত্ব দিলেন। তাঁর মতে, এতে ঘরে-বাইরে নারী সমতা আনতে সমর্থ হবে, রক্ষণশীলদের আতঙ্ক দূর হবে, প্রগতিশীলদের আগ্রহ ও উৎসাহ অটুট থাকবে, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথও সুগম হবে। তাঁর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতেন সেকালের কৃতবিদ্ ব্যক্তিরা। মেয়েদের পাঠোন্নতির জন্য নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, প্রতিযোগিতামূলক রচনার আয়োজন, পুরস্কার দান ও পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রীদের লেখা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে দেখে কেশবচন্দ্রের অনুরোধে সরকারও শেষপর্যন্ত কিছু অর্থসাহায্য করতে সম্মত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভালভাবে চলেছিল। ইতিমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে সহকর্মিদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। এতে 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুলটি' দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কাজ আশানুরূপ নয়, এই অজুহাতে সরকার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর সাহায্য বন্ধ করে দেন। সরকারি সাহায্য প্রত্যাহার ও ব্যক্তিগত দলাদলি এই উভয় কারণে 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল'টি শেষ পর্যন্ত উঠে যায়।[২৩]

১৮৭৯-এর প্রথমদিকে কেশবচন্দ্র সেন 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল' নামে পুনরায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারীসমাজের অগ্রগতির কথা চিন্তা করে ঐ একই বছরে 'আর্য নারীসমাজ' গঠন করেন এবং মুখপত্র হিসাবে 'পরিচারিকা' নামে একটি

২১. C. H. Heimsath, 'Indian Nationalism and Hindu Social Reform', Princepon N. G. 1964, p. 270

২২. ক) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কেশবচন্দ্র ও স্ত্রীশিক্ষা' , দেশ, ৮ বর্ষ, ৬ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪৮

খ) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কেশবচন্দ্র সেন ও সেকালের সমাজ', পৃ. ৯৬

২৩. 'Report of the Public Instruction, Bengal (1878-1879)', p. 85

পত্রিকা বের করেন।

কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুলে' মেয়েদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে রন্ধন ও সেলাই শিক্ষাও দেওয়া হত। মেয়েদের শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উদ্দেশ্য, গার্হস্থ্য জীবনে এতে মেয়েরা দক্ষতার পরিচয় দেবে। নামকরা অধ্যাপকরা এখানে মেয়েদের পড়াতেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এটি উন্নীত হয়ে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' নামে অভিহিত হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'পরিচারিকা' লেখে,

"নারীশিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, ভূবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা সমুদয়েই নারীরা পারদর্শী হউন কিন্তু তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক পুরুষদের ন্যায় কেন হইবে?....যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এদেশের স্ত্রীশিক্ষার জন্য পুরুষদের তুল্য শিক্ষাবিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন তখন ইহার প্রতিবাদস্বরূপ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন।"[২৪]

কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া এ পর্বে আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখের প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) একটি স্মরণীয় নাম। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনও পার্থক্য থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েদের বসবার অনুমতি দিতে হবে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধের অবসান ঘটাতে হবে, কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে এ নিয়েই তাঁর মতবিরোধ হয় এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহায়তায় তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নারীদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "নারীগণ চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা না করিলে নারীজাতিসুলভ নানাপ্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে না এবং নারীজাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না।" ১৮৭৩-এ বেনিয়াপুকুর লেনে 'হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি তাঁর এ বিষয়ক চিন্তাধারার বাস্তবরূপ দেন।[২৫] দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির তত্ত্বাবধায়িকা হলেন কুমারী অ্যাক্রয়েড নামে এক নবাগতা ইংরেজ মহিলা। কয়েক বছর পর কুমারী অ্যাক্রয়েড পরিণীতা হয়ে বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে 'হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়টি' উঠে যায়। ঐ বছরই ১ জুন তারিখে ওল্ড বালিগঞ্জে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে তিনি পুনরায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টিতে দ্বারকানাথ একাধারে শিক্ষকতার কাজ থেকে শুরু করে কুলির কাজ পর্যন্ত করেছেন। 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'টির শিক্ষাপ্রণালী সরকারি শিক্ষাবিভাগের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। শিক্ষিত ব্রাহ্মগৃহিণীদের অনেকেই হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানের জন্য মেরি কার্পেন্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর অন্যতম

২৪. লীলাবতী নাগ (রায়) এম.এ., 'সাংবাদিক কেশবচন্দ্র' (Pamplet)

২৫. Sir Albiron Raikumar Banerjee, 'An Indian Path Finder'
'The Emancipation of Indian Women', 1971 p. 82

সভ্য হিসাবে দ্বারকানাথ যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছেন। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে দ্বারকানাথ নারীগণের ডেলিগেট হওয়ার দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন এবং এর ফলে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে সে দাবি মেনে নেওয়ায় প্রথম ছয়জন মহিলা ডেলিগেট উপস্থিত হন। দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (পূর্বে কাদম্বিনী বসু) এঁদের অন্যতম। বস্তুত তাঁর আন্দোলনেই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েরা বসবার অনুমতি পায়। ঐ বছরই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটালেন বাঙালি মেয়ে কাদম্বিনী বসু।[২৬] পরে চন্দ্রমুখী। দেশজুড়ে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। ঐ ১৮৭৮-এর আগস্ট মাসে পূর্বোক্ত 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'টি বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়[২৭] এবং নারীগণ পুরুষের ন্যায় প্রবেশিকা ও তদূর্ধ্ব পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। শিক্ষার ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় 'বঙ্গমহিলা' লেখে,

"শিক্ষা বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সমান অধিকার তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ স্বীকার করিয়া......যে কেবল মহিলাদের মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে, ইহা দ্বারা তাঁহারা আমাদের সমাজের ভাবী কল্যাণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। এক্ষণে যাহাতে ঐ বিধানটি কার্যকরী হয়, মহিলাগণ উৎসাহপূর্ণ মনে এবং একাগ্রচিত্তে তাহাতে সচেষ্ট হউন এই আমাদিগের প্রার্থনা।"

এ প্রার্থনা শুধু 'বঙ্গমহিলার' নয়। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীসমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করবে, স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েদের হৃদয়ে দয়া, মায়া, নম্রতা, সরলতা, লজ্জাশীলতা অধিক বৃদ্ধি পাবে। মার্জিত রুচি স্ত্রীকে আরও মার্জিত করবে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করবে। স্ত্রীশিক্ষাই স্ত্রীকে স্বামীর সহায় ও উপযুক্ত ভার্যা করবে। পরস্পরের ভালবাসাকে অধিকতর বিশুদ্ধ ও পরস্পরের সঙ্গকে অধিকতর সুখপ্রদ করবে, শিক্ষিতা মায়ের সুরুচি সন্তানের মনকে আদর্শের সন্ধান দেবে, সর্বোপরি শিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টান্ত দেখে রক্ষণশীল সমাজের আতঙ্ক দূর হবে, এ আশাও অনেকে করেছিলেন।[২৮]

সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে 'সুলভ পত্রিকা', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'বঙ্গমহিলা', 'আর্যদর্শন', 'সাধারণী', 'বান্ধব', 'ভারতী ও বালক', 'সাহিত্য' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকা ; 'ইংলিশম্যান', 'কলিকাতা রিভিয়ু' প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকা এর সমর্থনে কলম ধরে।

স্ত্রীশিক্ষার এই আধুনিক অগ্রগতিতে রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হলেন। 'বেদব্যাস', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান', 'ধর্মপ্রচারক' ইত্যাদি অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। স্ত্রী-পুরুষের একই ধরনের শিক্ষা দিলে নারীসমাজের যে চরম অবনতি ঘটবে, তার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে এবং পত্রিকায় তা প্রকাশ করে প্রগতির নামে নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে নারীসমাজকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে উঠেপড়ে

২৬. 'Hindu Patriot', 23 July 1888

২৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৫৭

২৮. দ্রঃ ক) 'সাহিত্য', আশ্বিন ১২৯৮

খ) 'ভারতী ও বালক', বৈশাখ ১২৯৭

লাগলেন। এঁদের বক্তব্য, স্ত্রী-পুরুষকে একই ধরনের শিক্ষা দিলে নারীসমাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। নারীহৃদয়ের কোমলতা[২৯] দূর হবে, নারীরা সংসারকার্যে অপটু[৩০] হয়ে পড়বে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পাবে অথবা বন্ধ্যা হবে,[৩১], চারিত্রিক অবনতিও[৩২] ঘটবে, কাজেই এতে সমাজের ক্ষতি ছাড়া কোনও লাভ হবে না। সর্বোপরি লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধিও[৩৩] মেয়েদের নেই।

নারীকল্যাণে নিয়োজিত 'তত্ত্ববোধিনী'ও এদের দলে ভিড়ে যায় এবং জোর গলায় বলে,

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতির ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব।......বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"[৩৪]

সকলের গলা ছাড়িয়ে 'বেদব্যাস'[৩৫] স্পষ্ট ভাষায় জানায়, "কিন্তু প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায় এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হয়ে যায়।"

সব দেখেশুনে প্রগতির নামে ধ্বংসের পথ থেকে দেশবাসীকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ৩১.১.১২৯৮ তারিখে রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'অনুসন্ধান' লেখে,

"পাশ্চাত্য সভ্যতার অমোঘ অস্ত্র দুইটী স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। এই দুই আগ্নেয় অস্ত্র যে সমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিতে হইবে। অগ্নিদাহের সময় যেমন সমস্ত দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই স্তূপাকারে ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা যে সমাজে প্রবেশ করিবে, তাহাকে সহসা বিলাস বিশ্রামাদির বাহ্যিক চাকচিক্যে উজ্জ্বল করিবে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবে তার সার পদার্থ ও নীতি প্রভৃতি ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ......পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজের পুরুষজাতি যেরূপ ধর্মভ্রষ্ট বিলাসী স্বার্থপর ও স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইয়া উঠিতেছেন, রমণীগণ যে তদনুরূপ হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?"[৩৬]

২৯. 'পরিচারিকা', আশ্বিন ১২৯৭
৩০. 'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৭
৩১. ক) 'বেদব্যাস', বৈশাখ ১২৯৬
খ) 'অনুসন্ধান', বৈশাখ ১২৯৮
৩২. 'জন্মভূমি', মাঘ ১৩০১
৩৩. জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', সং ১৯৭৪, পৃ. ৮৯৯
৩৪. 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র ১৮০২ শক
৩৫. 'বেদব্যাস', বৈশাখ ১২৯৬
৩৬. 'অনুসন্ধান', ৩১ বৈশাখ ১২৯৮

১২৮৬ সনের ২৬ আশ্বিন 'সুলভ সমাচার' থেকে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসঙ্গে এটা জানা যায়।

"স্বাধীন স্ত্রী।

শ্রীমতী গদাধরী স্বাধীন হইয়াছেন। তিনি আর এখন কট্‌কী পেড়ে সাড়ী পরিধান করেন না, দিন কতক সাড়ী ছাড়িয়া গাউন ধরিয়াছিলেন এবং ধোপানী মেম্ সাহেব বলিয়া না ডাকিলে মনে মনে বড় রাগ করিতেন। তারপর তিনি শ্রবণ করিলেন যে ইংরাজদিগের ভিতর স্ত্রী স্বাধীনতারূপ রিফারম যোল আনা স্ফূর্ত্তি পায় নাই। মেম্‌দিগকে আজও সাহেবদের বশীভূত হইয়া চলিতে হয় ; মেমেরা যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যার নিকট ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন না। গদাধরী এই সকল অসহ্য সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই চটিয়া গেলেন। বলিলেন কি এখনও, ঊনবিংশতি-শতাব্দীতেও স্ত্রী পুরুষের ভেদ বিচার? ইংরাজ হইয়া স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার! ইংরাজ জাতিটা বয়ে গিয়াছে। কেন মেয়ে পুরুষ কি সমান নহে? মেয়েরা কি মানুষ নহে? সাহেবেরা পেণ্টুলান পরিবে, মেমেরা গাউন্ পরিবে ; সাহেবেরা এক রকমের টুপী পরিবে মেমেরা অন্য রকমের টুপী পরিবে ; সাহেবেরা মুখে চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আফিসে যাইবে, আর মেমেরা ঘরে বসিয়া সন্তান পালন করিয়া সোণার জীব.....।"

দেশি বিদেশি ডাক্তাররাও এ আন্দোলনে পিছিয়ে রইলেন না। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করে বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখিয়ে দু-একটি বইও লেখা হল। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম, এ যুক্তি দেখিয়ে উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করার কথা বললেন Dr. Carpenter তাঁর Physiology গ্রন্থে।[৩৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েদের বসবার অনুমতি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, 'ধর্মপ্রচারক' তার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখে,

"এরূপ সভা আজকাল অতি অল্পই বিদ্যমান আছে যেখানে মধ্যে মধ্যে 'স্ত্রীশিক্ষা' কোলাহলে পূর্ণ না হয় ; এরূপ সংবাদপত্রও অতিবিরল সময়ে সময়ে যাহার স্তম্ভাবলি স্ত্রীশিক্ষার কমনীয় কান্তি বিস্তার না করে, এরূপ নীতিগ্রন্থ আপাতত দৃষ্ট হয় না যাহা 'স্ত্রীশিক্ষার' অঙ্গস্পর্শ না করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, এরূপ সদ্বক্তাও দুর্লভ যাহার হৃদয় হইতে স্ত্রীশিক্ষার তরুণ-তরঙ্গ উচ্ছ্বাস উঠিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোপ্রাণ শীতল না করিয়াছে, এরূপ সভ্যদেশও দেখিতে পাওয়া যায় না যেখানে সর্বদা স্ত্রীশিক্ষা লইয়া শিক্ষিতগণের মস্তিষ্ক বিলোড়িত না হয়, এরূপ পরিবারও অল্প নয়নগোচর হয় যেখানে স্ত্রীশিক্ষার সুমধুর বা বিষময় ফল উৎপন্ন না হইয়াছে। এমন কি এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিও বিরল যিনি স্ত্রীশিক্ষাকে কনক কণ্ঠাভরণ করিয়া না রাখিয়াছেন। বাস্তবিক এই গুরুতর বিষয়টি লোক সমাজে সম্পূর্ণ সমালোচনার যোগ্য।"[৩৮]

বিষয়টি যে মোটেই সমালোচনার যোগ্য নয় ৩.৬.১৮৭৭ তারিখে 'সাধারণী' তা স্পষ্ট ভাষায় জানায়।

৩৭. জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', সং ১৯৭৪, পৃ. ৮৯৯

৩৮. 'ধর্মপ্রচারক', জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক

"এখনকার অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর লক্ষণ এই যে তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই উপহাস করা আছে...বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে তাঁহারা এবার তাঁহাদের প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেহই আপন আপন কন্যা ভগ্নীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করেন নাই। তবে চারুমুখী বি.এল. দিয়া শামলা মাথায় কিরূপে বক্তৃতা করিবে, জজ সাহেব তাহাতে কি মনে করিবেন, এই সকল অতি আবশ্যক বিষয়ের জন্য সকলেই ব্যস্ত ; কেবল ব্যস্ত নয়, অনেকে উন্মত্ত ; কেননা যখন তাঁহারা নারীজাতি বিষয় সরস আন্দোলন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহ কখন যে রমণী জঠরে বাস করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না।"

মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করলেও অনেকে আবার প্রচলিত রীতিপদ্ধতির পরিবর্তন চাইলেন, অর্থাৎ এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। বলা বাহুল্য, এঁরাই দলে ভারী।[৩৯] পূর্বে বেথুনের প্রয়াসকে স্বাগত জানালেও 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত মেয়েরা যাতে বিবিয়ানা না শেখে, অভিভাবকদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিতে ভোলেননি।

স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের আটের দশকে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির কথাবার্তাকে 'জনরব' ও 'ভৌতিক কাণ্ড'[৪০] বলে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনি।

স্ত্রীশিক্ষার রীতিপদ্ধতি নিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশে বিরোধীদের আক্রমণ থেকে স্ত্রী-শিক্ষাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী'র মধ্যপন্থাবলম্বন বিশেষ চাতুর্যের পরিচায়ক ('স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা', 'বামাবোধিনী' ১২৯১) :

"অনেকের মতে বঙ্গদেশে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতেছে তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হইতেছে না। লাভের মধ্যে এই যে মহিলাগণ দিন দিন কাজের বাহির হইয়া পড়িতেছেন। একথা কতদূর সত্য তা পাঠিকারা নিজেরাই ভাবিয়া দেখিতে পারেন। তবে আমাদের মতে যে শিক্ষার দ্বারা আমরা সংসারকার্যে অপটু হইয়া পড়ি, তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। তাহা সমাজের মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং নানাবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করে।"

স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি তাই বিনা বাধায় সম্ভব হয়েছিল একথা ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। তবে বিরূপ সমালোচনা এর অগ্রগতির প্রবাহকে প্রতিহত করেনি বরং প্রবল করেছিল। ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর আই.এ পড়ার জন্য ১৮৭৯-এ বেথুন স্কুলেই কলেজ বিভাগ খোলা হল। পরে একই কারণে বি.এ. ও এম.এ ক্লাস খোলা হয়। কিন্তু তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের পড়বার অনুমতি দেওয়া হত না। শেষপর্যন্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের চেষ্টায় ও Thompson-এর আইনানুগ মধ্যস্থতায় ১৮৮৩-তে কলকাতা

৩৯. ক) 'বঙ্গমহিলা', চৈত্র ১২৮৩ ; খ) 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮৫ ; গ) 'পরিচারিকা', চৈত্র ১২৮৬ ; ঘ) 'পরিচারিকা', আশ্বিন ১২৯৭ ; ঙ) 'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৭ ; চ) 'মহিলা', পৌষ ১৩০৫

৪০. 'সোমপ্রকাশ', পৌষ ১২৮৭

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ভর্তির বাধা দূর হয়।[৪১] প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী বসু মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান এবং পরে দেশে ফিরে চিকিৎসা ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

১৮৭৯-এ বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হলেও স্বতন্ত্র কলেজের মর্যাদা এর ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবার জন্য ছাত্রীদের বিশেষ অনুমতি নিতে হত। ক্রমে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ায় ১৮৮৮-তে কলেজ বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কলেজের মর্যাদা দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য প্রথম কলেজ ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র ব্রিটিশ সমাজের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিপূর্বে ১৮৮২-তে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'হাণ্টার কমিশন'-এর রিপোর্টে স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করাও হয় এবং এ বিষয়ে অনুমতি ও সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা উদারনীতি গ্রহণ করার কথাও ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৯-এ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সোসাল কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ভদ্র হিন্দু পরিবারের চরিত্রবান মেয়েদের শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ, শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রেনিংস্কুল স্থাপন, স্কুলে আসতে অসমর্থা বয়স্কা মহিলাদের যাতে শিক্ষিকারা বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসেন তার ব্যবস্থা এবং রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সবটা মিলে ফল দাঁড়ালো, প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের পর আটের দশকে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে বাইরের দিক থেকে কোনও বাধা রইল না। তবে সমাজমন তখনও এর অনুকূলে গড়ে ওঠেনি। সমকালীন মনীষীদের সমর্থন ও ব্যক্তিগত প্রয়াস স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজমনে অনুকূল চিন্তাভাবনার উদ্রেকে অনেকাংশে সহায়ক হয় এবং নয়ের দশক থেকে ভদ্রহিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বাড়তে থাকে। স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রগতির পেছনে তাই এঁদের ভূমিকা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে মেরি কার্পেণ্টার প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' কলকাতা শাখায় মনোমোহন ঘোষ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে তিনিও যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'প্রবীণা ও নবীনা'র কথোপকথনে আমরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই। স্ত্রীশিক্ষা বলতে তিনি মেয়েদের গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, অতিথিসেবা, পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি ছাড়া সদাচার শিক্ষার কথাও বলেছেন, যদিও পুঁথিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। এমনকি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ছেলেদের পক্ষে শুভ নয় এ অজুহাতে যাঁরা মেয়েদের নিকট পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ রাখার পক্ষপাতী তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই বলে যে, বঙ্গীয় শিক্ষিতা স্ত্রীরা শিক্ষিত যুবকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীগণকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার উৎকর্ষ সাধনের

৪১. C. E. Buckland, 'Bengal under the Lieutanant Governors' Vol. I (1902), p. 795

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তিনি এ ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্ত্রী-লোকদের পক্ষ সমর্থন করে কোনও সাময়িকপত্র না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে বরানগরের অধিবাসী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদেশীয় মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিজের সামান্য আর্থিক সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে পত্নীর সাহায্যে (যাঁকে তিনি নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বরানগরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্বে বেথুনকেও তিনি এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন।[৪২] কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশবাসীর কোনওরূপ আগ্রহ না থাকায় তাঁকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিবেশীরা মেয়েদের তো বিদ্যালয়ে পাঠালেন না, এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়কে সমাজচ্যুত করার[৪৩] ভয় দেখিয়ে তাঁকে বিদ্যালয়ের সংসর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করান, বিদ্যালয়ের জন্য ভাড়া নেওয়া বাড়িটাও প্রতিবেশীদের বিরোধিতায় তাঁর হাতছাড়া হয়। অবশ্য তিনি এখানেই থেমে যাননি। এক বছরের শর্তে পুনরায় একটি বাড়ি ভাড়া নেন এবং অবিলম্বে কলকাতা থেকে একজন শিক্ষক নিয়ে এসে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। ছাত্রী একমাত্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা, সেলাই, রন্ধন ইত্যাদি যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হত। শারীরশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। তবে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি রন্ধনশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী।[৪৪]

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়া তিনি মহিলাদের জন্য 'নর্ম্যাল স্কুল' বা শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য, ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্দার বাধা অতিক্রম করে এ সব বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। এ ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' ১২৯৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখে,

"....আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাগণের ও বালিকাগণের শিক্ষাভার অনেক পরিমাণে খৃষ্টান মিশনরিগণের হস্তে রহিয়াছে। কখন কখন দেখা যায় যে এরূপ শিক্ষার সুফল না হইয়া কুফল উৎপন্ন হয়।... এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষয়িত্রীরূপে শিক্ষিতা হইলে উক্ত অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে ইহার একটি বয়স্কা ছাত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পদ গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।"

স্ত্রী নর্ম্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি একমাত্র মেরি কার্পেন্টারের সাহায্য পেয়েছিলেন। নীতিগতভাবে সমর্থন করলেও সামাজিক পরিবেশ অন্তত স্ত্রী নর্ম্যাল

৪২. 'বামাবোধিনী', ২১ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৭২

৪৩. কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', ২য় সং, পৃ. ৭৩-৭৪

৪৪. 'Report of the Indian National Social Conference' Held in Calcutta, 1897, p. 99

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয় মনে করে উদারপন্থী বিদ্যাসাগরও তাঁকে সাহায্য করেন নি। এমনকি প্রগতিপন্থী কেশবচন্দ্র সেনও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি।

শশিপদ অন্তঃপুর শিক্ষারও প্রবর্তক।[৪৫] তিনি যে সময়ে এ কাজে হাত দেন (১৮৬১ খ্রিঃ) সে সময়ে খ্রিস্টান সমাজও অন্তঃপুর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেক ভদ্র পরিবারেই অন্তঃপুর শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং সরকারও শেষপর্যন্ত এর আর্থিক ভার গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার এক বড় অংশ জুড়ে ছিল শিক্ষা। বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তাঁর এ বিষয়ক পরিকল্পনার দায় যে দু'জন গ্রহণ করবেন বলে মনে করতেন, সেই নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের কাছেই তিনি এ সম্বন্ধে আত্ম-উন্মোচন করতেন। দিনের পর দিন ধরেই তিনি হয়তো হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত করে দিতেন এ বিষয়ক চিন্তা। এক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন, গৃহনির্মাণ, অর্থসংস্থান বা রীতিপদ্ধতি গৌণস্থান অধিকার করত, কেননা তিনি তখন ভবিষ্যতের নারীকে দর্শন করেছেন, যারা হবে ভারতের ভবিষ্যৎ।

স্বামীজী মনেপ্রাণে বুঝতেন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নয়। একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে 'অনেক আকাশ কুসুম কল্পনা' করতেন এবং সে বিষয়ে তিনি নানা খুঁটিনাটি কথা বলতেন। মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। এমনকি পুরাণ, ইতিহাস, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ-চরিত্র গঠনের নীতিগুলি তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাই পাবে অগ্রাধিকার। এছাড়া সংস্কৃত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, হাতের কাজ, সূচিশিল্প, বুনন, বয়ন ইত্যাদি বিষয়ও। উদ্দেশ্য, এতে মেয়েরা একাধারে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করবে, ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবানও হয়ে উঠবে। "গণিতকে এমনভাবে শেখাতে হবে তা যেন মনের শৃঙ্খলার শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। নিখুঁত নির্ভুলভাবে সত্যানুসন্ধানের প্রবণতা আনে। ইতিহাস এমনভাবে শেখাতে হবে যাতে কার্যের সঙ্গে কারণের জ্ঞান আসে এবং তা অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণীর মত হয়ে দাঁড়ায়।"[৪৬]

স্বামীজীর কালে ভারতবর্ষে শতকরা ১০-১২ জন মাত্র শিক্ষিত। বোধহয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও (শিক্ষিত) হবে না। অথচ সাধারণের মধ্যে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হওয়ার জো নেই। সুতরাং স্বামীজী কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী এবং কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন, যেখানে গিয়ে ব্রহ্মচারীরা ছেলেদের এবং ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের শিক্ষা দেবে, তাদের ত্যাগধর্মে দীক্ষিত করবে। এসব ব্রহ্মচারিণীদের দেখে সমস্ত দেশের চিন্তাভাবনা বদলে যাবে এবং তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টে যাবে।

স্বামীজীর স্ত্রীশিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে এগিয়ে এলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ভারতে সেই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা "ভারতের

৪৫. কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', ২য় সং, পৃ. ২৮৪-৮৫

৪৬. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮২

কন্যাগণের মোহাচ্ছন্নতা কেটে যাবে, আবার তারা নিজের স্বাভাবিক মহিমায় প্রকাশ পাবে ভারতবর্ষে আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর আবির্ভাব হবে।" পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য কু-প্রবৃত্তিগুলি যা আমাদের জাতীয় স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকে রোগগ্রস্ত করেছে সেই কু-প্রভাবের মোহ বর্জন করে ভারতরমণীর শিক্ষাকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কোনওরূপ সরকারি সাহায্য না নিয়ে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের এক পুরাতন বাড়িতে বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। বিদ্যালয়টি হল সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

বিদ্যালয় তো প্রতিষ্ঠা হল, এখন ছাত্রী পাবেন কোথায়? বিষয়টি তাই নিবেদিতাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বামীজী বললেন, "ছাত্রী সংগ্রহ সে তোমাকেই করতে হবে, অর্থ সংগ্রহ? সেও তোমারই কর্তব্য।" কাজেই নিবেদিতাকে এবার বাঙালির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হল। সেখানকার পথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। একে তো বালিকা বিদ্যালয়, তার ওপর আবার বিজাতীয়া মহিলার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া ভদ্র-হিন্দু পরিবারের পর্দাপ্রথা তখনও একেবারে উঠে যায়নি। স্বাভাবিক কারণে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে পরিবারের কর্তারা রাজি হলেন না। নিবেদিতা বোঝালেন, হিন্দু মহিলারা যে মন নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে গঙ্গাস্নান ও দেবমন্দিরে যান, বিদ্যালয়েও সেই মন নিয়েই আসবেন। একাধিক যুক্তির পর দু-একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি তাঁদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠালেন। যাতায়াতের সুবিধায় কথা ভেবে জগদীশচন্দ্র বসু একটা ঘোড়ার গাড়ি কিনে দেন। অর্থসাহায্য আসতে লাগল মিসেস ওলি বুল ও আমেরিকার বান্ধবীদের কাছ থেকে। কলকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তিও অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। নিবেদিতা ঠিক করলেন বাইরের লোকের দান তিনি নেবেন না। নিজের দায় নিজেই বহন করবেন। ক্রমাগত লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে যা উপার্জিত হতে লাগল তাতেই ব্যয়ভার চালাতে লাগলেন।[৪৭] ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। নিবেদিতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। স্ত্রীশিক্ষার পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পেছনে এসব ব্যক্তিগত প্রয়াস ছাড়া ষাটের দশক থেকে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কলকাতা ও এর আশপাশে একাধিক সভাসমিতি গড়ে ওঠে, স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারে যাদের ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান, যা জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির তরফ থেকে চন্দননগর, মজিলপুর, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে মোট ছয়টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রীদের পাঠানুরাগী করে তোলার জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছর বঙ্গসমাজে এর প্রভাব ছিল।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় যশোর ইউনিয়ন, বাখরগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট ইউনিয়ন, বিক্রমপুর ইউনিয়ন, ফরিদপুর সুহৃদ সভা প্রভৃতি নাম দিয়ে

৪৭. সরলা দেবী, 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও তার আদর্শ', নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৭৭

কতকগুলি সভা স্থাপিত হয়। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারই এসব সভার উদ্দেশ্য।[৪৮] ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হবহাউসের সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর মিটিং-এ, মনোমোহন ঘোষ বলেন যে, বর্তমান প্রতিটি গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কলকাতায় হিন্দু মহিলাদের জন্য সরকারি সাহায্যে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষায় বসবার উপযোগী পাঠগ্রহণ করতে পারে।

গত শতাব্দী ধরে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে বাঙালি সমাজ চিন্তাভাবনা করেছে, বাদপ্রতিবাদে মুখর হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে অজস্র লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, স্ত্রীশিক্ষা কতখানি এবং কতদূর পর্যন্ত বাঙালি সমাজে গৃহীত হয়েছিল। এককথায় সমাজ একে সমর্থন করেনি। বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করা নয়ের দশকের শেষেও নিবেদিতার পক্ষে সহজ হয়নি। ১৯০০-০১ খ্রিস্টাব্দে সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় শতকরা মাত্র ২টি মেয়ে শিক্ষালাভ করছে।[৪৯] ১৯০২ সালে সরকারি রিপোর্টে তাই শিক্ষাজগতে ও নৈতিক জগতে আরও বেশি উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয় এবং মেয়েদের মধ্যে দ্রুত উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েদের বসবার ব্যাপারে অধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩, এইচ. ই. স্কুলে ৬৮০, এম.ই. স্কুলে ১৭৭৬, এবং এম. ডি. স্কুলে ৬৫৩। কোটি কোটি মেয়ের তুলনায় এ সংখ্যা নিতান্তই হাস্যকর। এ সংখ্যাও আবার শহরের কতিপয় শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে গ্রামবাংলার জনসাধারণের সঙ্গে এর কোনও যোগ ছিল না। সমকালীন সমাজে স্ত্রীশিক্ষার কোনও প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। এ প্রয়োজন দেখা দেয় আরও অনেক পরে দেশবিভাগের পর থেকে। দেশবিভাগের পর জীবিকার তাড়নায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভদ্রহিন্দুঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন অনুভব করে। স্ত্রীশিক্ষার আধুনিক অগ্রগতির এটাই একমাত্র কারণ। শুধু তাই বা কেন? দ্বিতীয়ার্ধের নারীকেন্দ্রিক প্রধান প্রধান সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে একমাত্র সফল আন্দোলনও।

৪৮. 'Report of the Tenth National Social Conference' Held in Calcutta, 1897

৪৯. N. Natarajan, 'Hundred Years of Indian Social Reform', p. 102-03. Asia Publishing House.

বিধবাবিবাহ আন্দোলন
(১৮৫০-১৯০০)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজের সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হল বিধবাবিবাহ আন্দোলন। এ শতকের প্রথমার্ধে আইন করে সতীদাহ বন্ধ করার পর বিধবার পুনর্বিবাহের প্রশ্নটি বড় করে দেখা দেয়। তবে এ প্রয়াস শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে।

আধুনিক বাংলার সচেতন ব্যক্তি রামমোহন নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে দেখা দিলেন। তবে রামমোহন বিধবাবিবাহের চেষ্টা করেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কারণ রামমোহন তাঁর পুস্তকে এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। আত্মীয়সভার অধিবেশনেও যুবতী স্ত্রীর স্বামীর মরণোত্তর ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়েছিল। অথচ রামমোহন বিধবাবিবাহের চেষ্টা করেছিলেন, এ ধরনের একাধিক কথাবার্তা শোনা যায়।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে বিধবাবিবাহ নিয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় আলোচনা শুরু হয়ে। এ দশকের শেষের দিকে 'Indian Law Commission' এক সভায় বিধবাবিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবও করে। তবে তা কার্যকরী হয়নি।

চল্লিশের দশকে আন্দোলন আরও জমে ওঠে। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বাদপ্রতিবাদ চরমে ওঠে। ১৮৪৫-এ 'The Bengal British Indian Society' ধর্মসভাকে এ নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু ধর্মসভার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় ১৮৪৬-এ এ সোসাইটির তরফ থেকে ('The Bengal British Indian Society') পুনরায় ধর্মসভাকে এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করার অনুরোধ করা হয়। ধর্মসভা ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ আবার গর্বের সঙ্গে বললেন, বিধবার বিয়ে না দিয়ে বরং পুড়িয়ে মারার একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে পাঠাবেন।

১৮৪৯-এ 'Friend of India'-তে জনৈক বাঙালি ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন যে, তিনি শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে দেখেছেন, শাস্ত্রে বিধবাদের বিয়ের বিধি আছে এবং আইনসভার

নতুন সদস্য G.E.D. বেথুনকে বিষয়টি হাতে নিতে অনুরোধ করেন।[১] ব্রাহ্মণটি যে বেথুন অনুরাগী বিদ্যাসাগর, তা অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপে বিধবাবিবাহ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ চরমে পৌঁছয়। অবশ্য এ শতকের শুরু থেকে একদিকে যেমন তরুণ বাঙালিরা বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, অপরদিকে তেমনি কতিপয় বিষয়ী লোক ব্যক্তিগত কারণে অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়ে শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের নিয়ে বিচার বিবেচনা শুরু করলেন। ১৮৫০-এর শেষের দিকে অথবা ১৮৫১-এর প্রথমে কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সাহায্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হন এবং অনেকাংশে সাফল্যলাভও করেন। তবে পারিপার্শ্বিক গোলযোগে তা পণ্ড হয়ে যায়।

'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'কার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন, "ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কলেজগৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতিনীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নব মতাবলম্বীরা কলেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদূরবর্তী নানাস্থানে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ....রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল।"[২]

শ্রীশচন্দ্রের ব্যর্থতার অব্যবহিত পরে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ পরিচালিত কৃষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনও 'ধর্মসভা'র উৎসাহী সদস্য উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় 'মন্দীভূত' হয়। ১৮৫৩-এ কলকাতার নিকটবর্তী পটলডাঙ্গার অধিবাসী শ্যামাচরণ দাস নিজের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহে উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে ভট্টাচার্য মহাশয়দের কাছে বিধান চান। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ কলকাতার সেরা পণ্ডিতরা বিধবাবিবাহের বিধান দেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা শ্যামাচরণকে এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ দিতেও ভুল করেননি। বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পূর্বে কলকাতার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হিন্দু শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত বিচার বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত পর পর দুটি সভায় পূর্বোক্ত পণ্ডিতেরা মিলিত হয়ে বিধবাবিবাহের পক্ষেই মত দেন। তবে কার্যকালে তাঁরা এর বিরোধিতা করতেও[৩] দ্বিধা করেননি। ২১ আগস্ট ১৮৫৪, 'ইংলিশম্যান' পত্রে পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, কৃষ্ণনগর নিবাসী রাজীবলোচন

১. C. E. Buckland (I & II) 'Bengal under the Lieutanant Governors' (1901), p. 822

২. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (২য় সং), পৃ. ১৬৭

৩. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৮.৬.১২৬০

সরকার তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। কন্যার বয়স পঞ্চদশ বৎসর।[৪] বিধবাবিবাহের খবর যতদূর জানি এটিই প্রথম।

এ ধরনের দু-একটি ছোটখাট ঘটনা ঘটে থাকলেও বিদ্যাসাগরই প্রথম একে আন্দোলনের রূপ দেন। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, বিদ্যাসাগরের সামনে ছিল দেশজোড়া অশিক্ষা ও জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট, এছাড়া ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, যা রদ করলে বিধবা সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। বিদ্যাসাগর যে সে-কথা ভাবেননি তা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি কেন বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে আগ্রহী হলেন?

এ সম্পর্কে দু-একটি প্রচলিত গল্প কাহিনী[৫] ছাড়া প্রকৃত কারণ জানা যায় না। তবে বিদ্যাসাগর 'করুণার সাগর'। চোখের সামনে বাঙালিসমাজে বাল্যবিধবার দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনে সর্বস্বান্ত হতে, এমনকি প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ হননি।

ইতিপূর্বে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের চোখে পড়তে পারে। তবে পণ্ডিতদের স্ববিরোধী মনোভাব প্রত্যক্ষ করে এবং শাস্ত্রানুশীলন থেকে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, তবে রক্ষণশীল সমাজে কোনও পরিবর্তন আনতে হলে জনমানসে এর বিরোধীভাব দূর করার জন্য এ বিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তাই তিনি শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। বহুশাস্ত্রদর্শী বিদ্যাসাগর শাস্ত্রসাগর মন্থন করে 'তত্ত্ববোধিনী'র ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যায়, বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির নাম 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর একাধিক শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, বিধবাবিবাহ শুধুমাত্র শাস্ত্রসম্মত নয়, 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ সর্বপ্রকারেই কর্তব্য কর্ম'। তিনি একথাও বললেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রকাররা কোনকালেই বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ করেননি। এছাড়া সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় যে অনিষ্ট ঘটছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে, পক্ষপাতিত্ব বিসর্জন দিয়ে সকলকে বিধবাবিবাহ প্রচলনে উদোগী হতে ও বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে আবেদন করলেন। অর্থাৎ শাস্ত্রবচন দিয়ে বিচার শুরু করলেও বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত মানবিক আবেদনকেই বড় করে দেখালেন।

বিদ্যাসাগরের ভাষায়,

"দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন।"

৪. 'সম্বাদ ভাস্কর', ৩১.৮. ১৮৫৪

৫. "কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহ গ্রামে একবার একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী শাস্ত্রমতে বিধবাবিবাহ হতে পারে কি, পুত্রকে এ প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকেন।"
—বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং), পৃ. ৩২৭

বিদ্যাসাগরের সমর্থনে এগিয়ে এলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 'তত্ত্ববোধিনী'র পরবর্তী সংখ্যায়[৬] বিধবাবিবাহের সমর্থনে ইনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের পথই অনুসরণ করেন। অর্থাৎ শাস্ত্রবচন দিয়ে শুরু করলেও মানবিক আবেদনকেই বড় করে দেখালেন। অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়,

"যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন্‌কালে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? যিনি কোন নবযৌবনা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যোমৃত, প্রিয় পতির শোকে মোহে মুহ্যমান, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? যিনি দেখিয়াছেন যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্বে স্বামী সমাদরে মানিনী ও গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়হীনা হইয়া দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাশ্রুনয়নে দিনপাত করিতেছে এবং স্বামী সম্পর্কীয় রমণীগণ কর্তৃক নানা প্রকার নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাসদাসিগণ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? ....সেই ব্যক্তিকে যিনি বালবিধবা অনাথা দুহিতার ম্রিয়মাণ চন্দ্রমুখ সহসা স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অবসন্ন হইতে এবং চিরপ্রদীপ্ত সুদারুণ শোকশিখা সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ উচিত কিনা? .....কোন পতিবিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথি বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না। জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া দুইচক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয় বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?"

বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সমর্থনে এ ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে রক্ষণশীল সমাজের ভিতও কম-বেশি নড়ে উঠেছিল। শোনা যায় অক্ষয় দত্তের প্রবন্ধটি পাঠ করে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারিণীচরণ ঘোষ বলেন, "এ বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচার আমার তাদৃশ মনঃপূত হয় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ আবৃত্তি করিতে করিতে বিধবা স্ত্রীলোকের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে।"[৭] কেবল তারিণীবাবুই কেন? বিধবাবিবাহ প্রচলনের সমর্থনে এই মানবিক আবেদনে অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তিও এর পক্ষপাতিত্ব করতে থাকেন।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এই মানবিক আবেদন সামাজিক ইতিহাসের এক নতুন বস্তু। নবজাগরণের ফলে এই মানবমুখীন চিন্তা সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হল, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য চাই প্রাচীন শাস্ত্রের সমর্থন। বিশুদ্ধ

৬. 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র, ১৭৭৬ শক

৭. 'নব্যভারত' ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯২

যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষ তখনও মানবমুখী চিন্তায় অভ্যস্ত হয়নি। তখনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষকে যুক্তি বুদ্ধি নির্ভর করে তোলা আবশ্যক ছিল। বিদ্যাসাগর তাই প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিচার আরম্ভ করলেও মানবিক আবেদনকেই বড় করে দেখিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী উদ্যোক্তাগণ এখানেই ভুল করেছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে একমাত্র শাস্ত্রবচনকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

যাই হোক বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনারায়ণ. বসু তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ উচিত কিনা নামে একটা চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণহ্রদ স্থির ছিল ; এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে।"

বিদ্যাসাগর সহোদর শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী পুস্তকের চাহিদাও আশাতীতভাবে বেড়ে চলে।[৮] 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮৫৫-এর মার্চ মাসে মন্তব্য করে, বিধবার বিয়ে হচ্ছে তৎকালীন সময়ে ভারতীয়দের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। 'তত্ত্ববোধিনী' লেখে,

"কয়েক বছরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃসংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারম্বার উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত কারণ। কি ইংরেজি, কি বাঙলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়ের কল্পনায় ঐ বিষয়ের আলোচনায় ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।"[৯]

বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পুস্তকের তীব্র প্রর্তিবাদ করলেন কতিপয় পণ্ডিত। এঁরা বললেন, "না, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি নেই।" এবং স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠা করে অন্ততপক্ষে ৩০ খানি প্রতিবাদ পুস্তকে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরলেন। প্রতিবাদকারীদের অন্যতম পূর্বোল্লিখিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, যিনি দেড় বছর আগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলে বিধান দিয়েছিলেন। আর যাঁরা প্রতিবাদ পুস্তক লিখেছিলেন তাঁরা হলেন উমাকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, শশিজীবন তর্করত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, পার্বতীনাথ রায়চৌধুরী, কালিদাস মিত্র, সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, রামচন্দ্র মৈত্রেয়, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, পীতাম্বর কবিরত্ন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।[১০] বিদ্যাসাগরের বক্তব্য অনুযায়ী উত্তরদান কালে পণ্ডিতরা অনেকেই ক্রোধে অধৈর্য হয়ে উপহাস ও কটূক্তি বর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে এর কারণ সাধারণ

৮. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' (সং ১২৯৮), পৃ. ১১০
৯. 'তত্ত্ববোধিনী' ফাল্গুন ১৭৭৬ শক (প্রবন্ধটি অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা বলে মনে হয়)
১০. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', ৪র্থ সং, পৃ. ২৮৩-৮৪

লোক শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা। সুতরাং পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত হোক, বা না হোক সাধারণ মানুষের চিত্ত-বিভ্রম ঘটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

১৮৫৫-এ শেষের দিকে বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করে প্রতিবাদকারীদের যে সকল কথা 'প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী' বোধ করেন, সেই সকল কথার 'যথাশক্তি প্রত্যুত্তর' দেন বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে।[১১] এ পুস্তকেও বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ছাড়া মানবিক আবেদন করতে ভোলেননি। বৃহদায়তন এই পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। পুস্তক দু'টি তিনি ১৮৫৬-এ আনন্দমোহন বসু ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজনবিশ বন্ধুর সাহায্যে ইংরেজিতে 'Marriage of Hindu widows' নামে প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৫ সালে বিষ্ণু শাস্ত্রী মারাঠীতে অনুবাদ করেন।[১২]

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। বাদানুবাদ চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং সামাজিক আবহাওয়াও আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকাগুলি আন্দোলনের পক্ষে জোর প্রচার চালায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'ইংলিশম্যান' ইত্যাদি ইংরেজি পত্রিকাগুলিও একেবারে গা বাঁচিয়ে চলেনি। নিন্দা প্রশংসা, অনাদর, পুরস্কার, সম্মান এ সবই তাঁর ভাগ্যে জোটে। প্রথমে শিক্ষিত-মণ্ডলী ও পরে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব ও বিদ্যাসাগরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। মাঠে, ঘাটে, অফিসে, আদালতে ও বৈঠকে বিধবাবিবাহই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। নারীসমাজও যে এতে কত বেশি আশান্বিত হয়েছিল, সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পত্রাকারে লেখা হয়,[১৩]

"হে জগদীশ্বর। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শতহস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতা দান করুন। তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্রগ্রন্থ অবলোকন করিয়া সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন প্রতিদিনই কপালে করাঘাতচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি। ওহে ঈশ্বর। আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই মনন করিয়া থাকি ; কিন্তু বোন পা-ফাটা, মাথা চাঁচা, পোড়া কপালে ভট্টাচার্য ও গোঁসাঞি আটকুরোরা যা পেছু ডাকিতেছে, বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না ভট্টাচার্য ও গোঁসাঞি সর্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহাদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয়। পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা-ফাটা, মাথা চাঁচা, গায়ে কতকগুলো গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, গোঁসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রুর দত্তের রাসের সং।"

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন বিধবাবিবাহকে শুধুমাত্র শাস্ত্রসম্মত

১১. 'তত্ত্ববোধিনী', অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক

১২. Dr. K. K. Datta, 'Dawn of Renascent India' (2nd. Ed, 1964), p. 133

১৩. 'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬

প্রমাণ করলেই সমাজে তা কোনওদিনই প্রচলিত হবে না, আইনের সমর্থনও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। বর্তমানের রীতি অনুযায়ী তিনি গণ স্বাক্ষর নেওয়া শুরু করলেন। ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর, ১৮৫৫ তারিখে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনকারীদের বক্তব্য, বিধবাবিবাহ দেশাচারসম্মত না হলেও নীতিবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। তাই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করছেন, যাতে বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দূর হয় এবং বিবাহ-জাত সন্তানেরা সমাজে বৈধসন্তান বলে গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে আবেদনপত্রটিতে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁরা হলেন বর্ধমানের রাজা মহাতবচন্দ্র, কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রভাবশালী হলেন বর্ধমানের মহারাজ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজ। বাঙালি সমাজে এঁদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। কাজেই এঁরা স্বাক্ষর করায় বিদ্যাসাগরের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৭ নভেম্বর, ১৮৫৫-তে, ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্রটি পেশ করার জন্য ঐ সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রাণ্ট বিধবাবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপির এক খসড়া করেন। স্যার জেম্‌স কলভিল ও পি. ডাবলিউ. লিগেট তা সমর্থন করেন।

এরপর এ আন্দোলন বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মহারাষ্ট্রের এক প্রভাবশালী অংশ বিদ্যাসাগরের সমর্থনে এগিয়ে এল। ভিক্সুরের মারাঠা নায়ক এবং সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা স্পষ্ট ভাষায় বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দিলেন। দক্ষিণ ভারতেও সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা সমানে সমানে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেমন পুণা, সেকেন্দারাবাদ, সাতার, ধারওয়ার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি স্থান থেকে পক্ষে বিপক্ষে একাধিক আবেদনপত্র ছাড়া ব্যক্তিগত পত্রও[১৪] ভারত সরকারের কাছে আসে। এইসব অঞ্চলের আবেদনপত্রের মধ্যে দেখা যায়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনের সংখ্যাই অধিক।

৯ জানুয়ারি, ১৮৫৫-এ আইনের প্রস্তাবটি দ্বিতীয়বার পাঠ করে ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৬-তে আইনের পাণ্ডুলিপিটি সিলেক্ট কমিটির কাছে অর্পণ করা হয়। (সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন জেম্‌স কলভিল, এলিয়ট, পি. ডাবলিউ লিগেট, জে. পি. গ্রাণ্ট)।

বাংলাদেশেও এই প্রস্তাবিত আইনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিলটির বিরোধিতা করে একাধিক আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত পত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রতিবাদপত্র দু'টি। প্রথমটিতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৩৩,০০০, দ্বিতীয়টিতে ৬১৭। এছাড়া নদীয়া, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে বহু প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার লিখেছেন, "এই আইনের বিরুদ্ধে

১৪. প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী আবেদনকারীর সংখ্যা ৩৫,৭৬৪। ইন্দ্র মিত্র ভারতের রাষ্ট্রীয় অখিলাগারে রক্ষিত মূল আবেদনপত্রটিই পরীক্ষা করে স্বাক্ষরদাতার সংখ্যা প্রায় ৩৩,০০০ বলে অনুমান করেছেন। —ইন্দ্র মিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' (১৯৬৯), পৃ. ২৯৭, পাদটীকা।

৫০-৬০ সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরিত ৪০ খানিরও উপর আবেদনপত্র পেশ করা হইয়াছিল, ইহার পক্ষে হইয়াছিল ৫ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত ২৫খানি আবেদনপত্র।"[১৫]

বিদ্যাসাগরের সমর্থনে বাংলাদেশের আবেদনপত্রগুলির মধ্যে প্রথম ইয়ং বেঙ্গলদের আবেদনপত্রটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৭৫ জন। (ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের আবেদনে প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ('by a Special Marriage Law')—তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলেন। অবশ্য তাঁদের আগে ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬-এ কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ৪৪ জনের স্বাক্ষরসহ এক আবেদনে বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের দাবি তোলেন।) এছাড়া কৃষ্ণনগর, কলকাতা, বারাসত, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে আবেদনপত্র পাঠানো হয়।

নির্বাচক সমিতি প্রস্তাবিত আইনটি সমর্থন করে ৩১.৫.১৮৫৬-এ তাঁদের বক্তব্য পাঠান। ১৯.৬.১৮৫৬-তে আইনের পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয়বার পঠিত হওয়ার পর গৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত ২৬ জুলাই, ১৮৫৬-তে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।

বিদ্যাসাগরের অখণ্ডনীয় যুক্তি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন, রাজশক্তির সহায়তা, বিধবাবিবাহ আইন পাসের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। এর যে কোনও একটির অভাব হলে কোনও দিনই আইন পাস হত না। তবে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী যাঁরা বিবাহে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত একটি ধারা যোগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের আশা পূর্ণ হয়নি।

আইন তো পাস হল। এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি তাহলে বিধবার বিয়ে হবে? এবং এ প্রশ্নই 'বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ' সমগ্র বঙ্গভূমিকে বিচলিত করে তুলেছিল। "হিন্দুর গৃহে সত্যই একটা বিস্ময় বিভীষিকার সৃষ্টি হল।"[১৬]

বিদ্যাসাগর তা বলে নিরাশ হননি। তাঁর প্রচেষ্টায় সাড়ে চার মাস পরে কলকাতার বুকের ওপর প্রথম ঘটা করে বিধবার বিয়ে হল। পাত্র রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন,[১৭] পাত্রী বর্ধমানের পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এগারো বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতী দেবী। বিয়ের ঘটক মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে একঘরে করা হল, সামাজিক নির্যাতনও চলল তাঁর ওপর।[১৮] তবে তিনি একা নন, আইন পাসের দীর্ঘদিন পরও যাঁরা বিধবার বিয়ে দিতেন ও এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন তাঁরা কেউ এর থেকে বাদ পড়েননি।[১৯] এমনকি দীর্ঘদিন পরও অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দশকেও বিধবাবিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি।[২০]

১৫. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং), পৃ. ২৯৫
১৬. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং), পৃ. ২৯৬
১৭. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পৃ. ১৪৮
১৮. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তৎগ্রন্থ সমালোচনা' (কলকাতা ১৯২৮), পৃ. ২
১৯. রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (সং ১৯৬১), পৃ. ১৩০
খ) শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত' (সং ১৩২৫), পৃ. ১১৪-১৫
২০. 'বামাবোধিনী', ১৫ আষাঢ়, ১২৯৫

প্রথম বিধবাবিবাহের সংবাদে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখে,[২১] "হিন্দুবিধবার এ প্রথম বিবাহ কোনক্রমেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে পরিবার বা জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই এবং কন্যার খুড়া কিংবা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই।"

এর বিরোধিতা করে পত্রপত্রিকায় একাধিক পত্র লেখা হয়। প্রতিবাদের ভাষা মোটামুটি একই ধরনের। জনৈক পত্রলেখক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন, "সভায় দুইসহস্র লোক উপস্থিত ছিল বটে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশলোকই রঙ্গদর্শক।" 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'অরুণোদয়' বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দপ্রকাশ করে উদযোগীদের উৎসাহ বর্ধন করে।

দ্বিতীয় বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় মাত্র দু'দিন পর পানিহাটি গ্রামে। পর পর দু'টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখে 'তত্ত্ববোধিনী' ১৮৭৮ শকের ১৬ সংখ্যায়, চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হচ্ছে বলে আনন্দ প্রকাশ করে এবং "এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে একান্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে" এবং উদ্যোগকর্তা ও উৎসাহদাতাদের ওপর নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটূক্তি বর্ষণ হচ্ছে, সেকথাও লেখে।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ দু'টি অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুরে। ঘটক রাজনারায়ণ বসু। পাত্র তাঁরই দুই জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা রাজনারায়ণ বসুকে প্রহার করার সঙ্কল্প করেন। মেদিনীপুরের লোক তাঁকে ইট মারবে ভয় দেখায়। এমনকি মেদিনীপুরের তৎকালীন উকিল ইংরেজি জানা হারান দণ্ড-ও তাঁকে ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।[২২]

১৮৫৬ ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন চলতে থাকে। ইতিমধ্যে সিপাহী যুদ্ধ হওয়ায় বিধবাবিবাহের সমর্থকরা সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের দিকে সামাজিক অবস্থা কিছুটা শান্ত হওয়ায় পুনরায় কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা দেখান ব্রাহ্মসম্প্রদায়। এঁরা আইন পাসে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনেও এঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে এ সমাজের প্রবীণ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বিধবাবিবাহ বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে তাঁর পরিবারের কোনও বিধবার বিয়ে দেননি বা এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাননি। যদিও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা প্রবন্ধগুলি ছাপানো হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুর দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহের সংবাদে তিনি তাঁকে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটিতেও তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় রয়েছে,

"এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর গ্রন্থে

২১. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং), পৃ. ৩২১

২২. দ্রঃ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (সং ১৩৬৮), পৃ. ৬৫

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ রক্ষণশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৩]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ব্রজসুন্দর মিত্রের (১৮২০-৭৫, ঢাকা)। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৬-তে কলকাতায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু হলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক সকল নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে পূর্ববঙ্গে বিতরণ করেন। ঢাকার যুবকগণ এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিধবাবিবাহের দল তৈরি হয়। এঁরা নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করে এ সংস্কার কাজের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং পরবর্তী সময়ে এ দলের যিনি যেখানেই গিয়েছেন প্রতিজ্ঞাপত্রের শর্তানুযায়ী সকলেই এ সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। ১৮৬২-তে ব্রজসুন্দর মিত্র নিজ বিধবা-কন্যা মাতঙ্গীর বিবাহ দিতে উদ্যত হন কিন্তু জননীর ঘোর বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সফল হননি। এমনকি পুনরায় মাতঙ্গীর বিবাহে উদ্যোগী হবেন না, জননীকে তা কথা দিতে বাধ্য হন। 'ঢাকাপ্রকাশে' ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও আরও অনেকে এ নিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাঁকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। তিনি প্রায়ই তাঁর জামাতা কেদারনাথ রায় ও গুরুচরণ মহলানবিশকে বলতেন মাতঙ্গীর বিবাহ দিব না এ ব্যাপারে "আমি ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তোমরা মাতঙ্গীর বিবাহ দাও।" বিধবারা যাতে সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার পায় সেজন্য তিনি সারাজীবন চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা একটি পত্রে লেখেন,

"তখন কেহ বিধবার বিষয় কিনিত না কিন্তু বাবা কিনিতেন। তৎপরে মোকদ্দমা করিয়া তাহা দখল করিতেন ; আপোষে অতি অল্পস্থলেই কার্য্য হইত। এজন্য ঠাকুরমা বলিতেন, 'বিরজু তুমি কি অন্য সম্পত্তি চোখে দেখিতে পাও না, বিধবার ছটাক পটাক সম্পত্তি কিনিয়া কেন এত কষ্ট পাও?' বাবা বলিতেন, 'কেহ যে বিধবার সম্পত্তি কিনিতে চায় না। ইহাদের সম্পত্তি পরহস্তে থাকে এবং নিজেরা কপর্দ্দকহীন হইয়া বাস করে। আমি তো ইহা সহ্য করিতে পারি না।' অনেক বিধবা বহুদূর থেকে এসে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সাহায্যে নিজেদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছেন।"[২৪]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ আন্দোলনকে উভয় বাংলায় ছড়িয়ে দেন। এবং তাঁর উৎসাহে ও সংগঠনে কলকাতার বুকের ওপর একটা বিধবাবিবাহ দল গড়ে ওঠে। এ দলের কাজ বিধবাবিবাহে ইচ্ছুক অভিভাবকদের সাহায্য করা। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহটি ঘটে তাঁরই উদ্যোগে। এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১৩টি ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যেও ৫টি ছিল বিধবাবিবাহ। বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দলের যুবকদের নিয়ে ১৮৫৯-এ কলকাতার নিকটবর্তী সিন্দুরিয়া পটীর গোপাল মল্লিকের বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'বিধবাবিবাহ নাটক'টি (১৮৫৬) অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। এ নাটকের অভিনয় তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল।

বিধবাসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখালেন বরানগরের অধিবাসী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫)। বিধবাবিবাহ ছাড়া বিধবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিধবাদের স্বয়ংনির্ভরশীল করতে চেয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে এরা

---

২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ১৮১

২৪. হেমলতা সরকার, 'ব্রজসুন্দর মিত্র', সং ১৯১৫, পৃ. ৪২৯

নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ভদ্র পরিবারের অসহায় বিধবাদের জন্য তিনি এ উদ্দেশ্যে তাঁর বরানগরের বাড়িতে একটি আশ্রম খোলেন। বিধবারা এখানে সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি মেনে চলতেন। রন্ধন, সেলাই, ধর্মীয় ও নৈতিকশিক্ষার সঙ্গে যুগোপযোগী পাঠ শিক্ষাও দেওয়া হত। সংস্কারক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁর গ্রন্থে শশিপদবাবুর কাজের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে আশ্রমে পালিতা বিধবাদের অন্তত ৪০জনের বিয়ে দেন। আত্মীয়স্বজনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিধবা ভাইঝিকে লেখাপড়া শেখান এবং পরে বিবাহ দেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি নিজে এক বিধবা বিয়ে করেন। যিনি তাঁর বেঙ্গল বোর্ডিং হাউসের ছাত্রী ছিলেন। অথচ আশ্রমটিকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ঘাঁটি করে তোলার ইচ্ছা তাঁর কোনওদিনই ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সংস্কারকদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুবর্তীরা বা কেন, সাধারণ সমাজীরাও শশিপদবাবুর এ ধরনের অতিরিক্ত উদারতার শরিক হতে স্বীকৃত ছিলেন না।[২৫] অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর[২৬], স্যার স্টুয়ার্ট বেলী প্রমুখ বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি শশিপদর আত্মত্যাগমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধবা আশ্রম সম্বন্ধে W. S Caine মন্তব্য করেছেন যে, "বিধবা আশ্রমের মাধ্যমে মিঃ ব্যানার্জী ভারতের অন্যতম সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ দেখালেন।"[২৭] লণ্ডনের 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' শশিপদর বিধবা আশ্রম ও শিক্ষাসদনের জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রয়াস চালায়। দুঃখের বিষয়, কলকাতার বুকের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি নিয়ে কলকাতাবাসীরা কিন্তু মাথা ঘামাননি, এমনকি দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ও গবেষকরাও নীরব। লণ্ডনে ভারতীয়দের বন্ধুস্থানীয় কতিপয় ইংরেজ তা জানতে পারেন এবং 'National Indian Association'-এর তরফ থেকে 'Indian Magazine and Review'-তে শশিপদর কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়। ১৮৯৪-এর ৩১ মার্চ 'হিন্দু' কাগজে 'বরানগর ফিমেল বোর্ডিং স্কুল অ্যাণ্ড হিন্দু উইডোজ হোম' নামে এক সম্পাদকীয় লেখা বের হয়। এর সূচনাতে ছিল, "শ্রীযুক্ত শশিপদ ব্যানার্জী ও তাঁর পত্নীর নাম ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরিচিত। যে কার্যে তাঁরা এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করেছেন তার গুরুত্ব বলে বোঝানো যাবে না।"

শশিপদর কার্যাবলীর পরিচয় দেওয়ার বিশেষ কারণ 'হিন্দু' অতঃপর জানিয়েছিল। শশিপদর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থায় তিনি তাঁর বিধবা আশ্রমটিকে আর্থিক দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করতে চান। যার জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেছেন। একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক। শশিপদর উৎকণ্ঠিত আবেদনের কয়েক লাইন 'হিন্দু' উদ্ধৃত করেছিল। সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়। একথা সত্য, কিন্তু এমন বহু পরিবার আছে যেখানে অর্থাভাবের জন্য, সেইসঙ্গে অপ্রশংসাযোগ্য অন্য কারণের জন্যও বটে,

২৫. কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', ২য় সং, পৃ. ৮১

২৬. Prof. Maxmuller wrote a private letter to Sasipada on February, 1893. Sir Albiron Rajkumar Banerjee 'An Indian Path founder, memories of Seva Brata Sasipada Banerjee' (1971) p. 69.

২৭. Sitanath Tattabhusan, 'Social Reform in Bengal', Cal 1904, p. 15

হতভাগ্য বিধবাদের সংস্থান হয় না। এদের সংখ্যা বাড়ছে, সমাজের কাছেও এদের জীবন দুর্বহ এবং যেন উপরিভাগে ভাসছে। জীবন সম্বন্ধে আশা আকাঙ্ক্ষা এদের নষ্ট হয়ে গেছে। এদের অনেকেই বয়ে যেতে পারে ; ফলে আত্মীয়স্বজনদের জীবনে কলঙ্ক টেনে আনবে ; 'হিন্দু' শেষে লিখেছিল, একজন মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, শশিপদ তা করেছেন। এখন যদি হিন্দু ভদ্রলোকেরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না আসেন, তাহলে তাঁরা প্রমাণ করে দেবেন, হিন্দুদের সামাজিক পুনর্জাগরণের কোনও সম্ভাবনা নেই।[২৮] Mr. James Wilson, 'Indian Daily News' (19th. March 1888) পত্রিকাতেও শশিপদর কাজের প্রশংসা করেন।

শশিপদ সেবাব্রতের যে মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, হিন্দু সমাজ তা অনুসরণ করেনি, তবে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বিধবা আশ্রমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বোম্বাই পণ্ডিতা রমাবাঈ বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পুণা, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানেও হিন্দুবিধবাদের জন্য আশ্রয়বাটিকা নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকলে বলা যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ও তাঁর আদর্শে কম-বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা শশিপদবাবুর আদর্শে অসহায় বিধবাদের জন্য এ ধরনের একটি বোর্ডিং চালু করার চিন্তা করেছিলেন এবং কলকাতার বুকের ওপর এ ধরনের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠারও তৎপরতা চালান।[২৯] কতিপয় মহিলার পরিচালনায় কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড-এর সহায়তায় এ ধরনের একটি বিধবা আশ্রম খোলার কথাও চিন্তা করা হয়। খ্রিস্টান জেনানা মিশনও এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এগুলি সবই মিঃ ব্যানার্জীর কাজের পরোক্ষ ফল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশালের (পূর্ববঙ্গ) দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-৯৭) একটি স্মরণীয় নাম। তিনি পূর্বোক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রের দৃষ্টান্তে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্রে পূর্ববঙ্গের বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের শর্তানুসারে প্রত্যেক সভ্যই নিজেদের এলাকায় বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেন। প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য সভ্যরা কাজে কতটা দেখিয়েছিলেন বলতে পারি না, তবে তাঁর যে কথা সেই কাজ। ১২৭১-এ বরিশালে তাঁর প্রচেষ্টায় দু'টি কায়স্থ বালবিধবার পুনর্বিবাহ হয়। এ অঞ্চলে এটাই প্রথম বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত। এতে তাঁকে যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আর্থিক নির্যাতনও কম হয়নি। তাঁর চেষ্টায় বরিশালে আরও কয়েকটি বিধবার বিয়ে হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বালবিধবা বিমাতার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। আত্মীয়স্বজন তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে উক্ত বিমাতাকে কৌশলে কাশীতে পাঠিয়ে দেন। বিমাতা হাতছাড়া হওয়ায় বিশেষ মুশকিলে পড়লেন। পরে অবশ্য উক্ত বিমাতার বিশেষ আগ্রহে কৌশলে পুনরায় কাশী থেকে তাঁকে কলকাতায় এনে বিদ্যাসাগরের সহায়তায় পূর্বনির্দিষ্ট পাত্রে বিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। এতে শুধু বরিশাল নয়, সমস্ত বাংলাদেশ তোলপাড় হতে লাগল। আত্মীয়স্বজনের নির্যাতন ও কটূক্তিও মুখ বুজে সহ্য করতেন। আদালতে যাওয়ার জন্য পথে বের হলে রাস্তার লোক

২৮. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত' (৩য় খণ্ড), (সং ১৩৮৫), পৃ. ২৪২

২৯. 'তত্ত্বকৌমুদী', ১৬ চৈত্র, ১৮১০ শক

পর্যন্ত তাঁকে বাপান্ত করত এবং প্রায় ছয়মাস যাবৎ সরকারি মোকদ্দমা ছাড়া বাইরের কোনও মোকদ্দমাও তিনি পাননি। যখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন (১৮৭০-৭১ খ্রিঃ) সে সময় পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বিধবা আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে কলকাতায় এলে দুর্গামোহন দাস তাঁদের আশ্রয় দেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর শেষ বয়সে তিনি এক বিধবাকে বিয়ে করেন এবং পুনরায় সামাজিক নির্যাতন ভোগ করেন। একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য তাঁর মতো কেউ এত অর্থব্যয় করেননি।[৩০]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেকে শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবাবিবাহের পক্ষ বলেছেন।[৩১] তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একটি বিধবাবিবাহ ঘটে। এছাড়া এ সংস্কারকার্যে হাত দিয়ে সমস্ত রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ইচ্ছুক অভিভাবকদের সবসময়ই সাহায্য করেছেন।

বিধবাবিবাহ তৎকালীন হিন্দু সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেনি। কতিপয় উদারপন্থী হিন্দু ছাড়া সাধারণভাবে হিন্দুরা প্রথম থেকেই এ সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি সমকালীন হিন্দু মনীষীরাও এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪) নাম উল্লেখযোগ্য। বিধবাবিবাহ আইন যখন লিপিবদ্ধ হয় (১৮৫৬ খ্রিঃ) ভূদেব তখন হাওড়া স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বিদ্যাসাগরের কাজেরও তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু হিন্দুগৃহে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন তিনি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন, বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে শাস্ত্রীয় যুক্তি অপেক্ষা আবেগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চরিতকার কুমারদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন, "ভূদেববাবু প্রায়ই বলতেন বাংলার গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল কার্যটী (ভাষার উন্নতি) স্থায়ী হইয়া স্বজাতির উপকার সাধন করিতে থাকিবে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবে ; কিন্তু তাঁহার ভদ্রঘরে[৩২]

৩০. 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', 'দুর্গামোহন দাস', (১ম সং), পৃ. ২১০

৩১. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত' 'পঃ বঃ নিঃ দুঃ সমিতি শিবনাথ রচনাখণ্ড' (১ম সং), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫

৩২. ১) ভদ্রঘরে বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে উচ্চশ্রেণীর বিধবারাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী।
২) সম্রাট শাজাহানের সময়ে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তাঁহার মাতা বিদ্রূপে তাঁহাকে নিরস্ত্র করেন। বলেন, ...জগন্নাথ! এটা যদি ভাল কাজ হয়, তবে আগে তোমার মাকে তাহা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছ না কেন? ও কচি মেয়ে, কিছু জানে না। উহার ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ থাক। এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে পাউক। মহাপণ্ডিত শূলপানির বালবিধবা কন্যা, তাহার পুনরায় বিবাহের বন্দোবস্ত হইতেছে বলিয়া পিতাকে শুনাইয়া ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, "অমুক পণ্ডিত মরিয়া গিয়াছেন, পিতা তাঁহাকে যে গাভীটা দান করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আন।" পিতা বলেন, "সে কি মা! দত্ত জিনিস ফিরিবে কিরূপে?" কন্যা সাশ্রুনয়নে বলেন, "পণ্ডিতেরা না বলিয়াছেন যে গ্রহীতার মৃত্যুতে সর্বাপেক্ষা বড় দান (ন দান কন্যাসম) ফিরিতে পারে।" লজ্জাবনত পিতা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। সর্বোচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাদিগের মনের ভাব ঠিক এইরূপই।
মুখোপাধ্যায়, 'ভূদেব চরিত', সং ১৩২৪, পৃ. ১৭৭-৭৮

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন চেষ্টা এবং স্কুলপাঠ্যগ্রন্থে এদেশীয় বালকদিগের নিকট বিদেশীয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শভাবে দেখান, স্ব সমাজের ক্ষতিকর এই দুইটি কার্য স্থায়ী হইবে না, অল্পকাল মধ্যেই ঐরূপ বিধবাবিবাহ ও ঐরূপ কয়েকখানি স্কুলপুস্তক অপ্রচলিতপ্রায় হইয়া লোকের স্মরণপথের অতীত হইয়া যাইবে।"

বিধবাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভূদেব 'বৈধব্যব্রত' প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তা থেকে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরছি। প্রবন্ধটিতে ভূদেব স্ত্রীলোকের 'বৈধব্যব্রত' ও পুরুষের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করা এ দু'টিকেই শ্রেষ্ঠ বিধানরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে বিধবাদের বিয়ে না দিয়ে সদাচার ও সংযম শিক্ষা দিলে ফল আরও ভাল হবে। সৎ শিক্ষাগুণেই বিধবারা বৈধব্য জীবনকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারবেন এবং ভোগ সুখ পরিত্যাগ করে গৃহকার্যে নিপুণা হয়ে উঠবেন। অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব ও গুরুজনদের সেবা, পরিবারের শিশুদের প্রতিপালন, দেবপূজা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে উঠবে। এছাড়া বিধবাদের আহার, বাসস্থান, ব্যবহার্য সামগ্রীর পৃথক ব্যবস্থা, বয়স্কা বিধবাদের সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের সমস্যাও তখন আর তেমন তীব্র বলে মনে হবে না। "যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান সে বাটীতে এক একটী জীবন্ত দেবীমূর্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবারের মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রীপুরুষেরা নিরন্তর ঋষি চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহারা 'পরার্থজীবন' ব্যাপারটা কি, তাহা শুধু মুখে বলে না, পুস্তকে পড়ে না, উহার জাজ্বল্যমান মূর্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

"যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়দিগের কন্যাগণও ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে চিরকৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে আর্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।"[৩৩]

অসার মানুষের আন্তরিকতাহীন প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিধবাদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মন্তব্য অনেক সময় রূঢ় বলে মনে হলেও স্বামীজী বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বিধবা সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত অধিকাংশই তৎকালীন ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরকে 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারী মহাবীর' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যাটির উৎসকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা তাঁর মতে উচিত বিবেচিত হয়নি। এর কারণ, এ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা। তিনি মনে করতেন, কিছু সংখ্যক মানুষের সমস্যা নিয়ে দেশের নেতারা যদি ব্যস্ত হন, তাহলে মূল সমস্যাগুলির সমাধানে উৎসাহ থাকবে না। তিনি বলেছেন, দেশের ভবিষ্যৎ বিধবাদের নবলব্ধ স্বামীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, তা করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর। স্বামীজী দেখেছেন, বিধবাবিবাহ সমস্যা জনসাধারণের অধিকাংশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূরের কথা, সামাজিক সমস্যার সঙ্গেও জড়িত নয়। গত শতাব্দীতে যেসব সংস্কারের জন্য আন্দোলন হয়েছে তার অধিকাংশই পোশাকি ধরনের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে,

৩৩. দ্রঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বৈধব্য ব্রত, 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (একাদশ সং), পৃ. ১৬১

অন্য বর্ণদের নয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শতকরা ৭০ জন ভারতীয় নারীর কোনও স্বার্থ নেই।[৩৪]

স্বার্থ নেই, কারণ নিম্নতমবর্ণে বিধবাবিবাহ বর্তমান। আর স্বামীজী পরিষ্কার দেখলেন বিধবাবিবাহ নিয়ে এই হইচই করার কোনও প্রয়োজনই থাকবে না, যদি আর দু'টি সংস্কার করে নেওয়া যায় যেগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, সমগ্র জাতির জীবনের সঙ্গে যার যোগ তা হল, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ, না থাকলে বিবাহযোগ্যা বিধবার সংখ্যা যৎ সামান্য হয়ে পড়বে।

বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবার বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬। সংস্কার-বাদীদের প্রয়াসে প্রথম ঝোঁকে অনেকগুলি বিধবার বিয়েও হয়। এমনকি বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী রাধাকান্ত দেবের বাড়িতেও বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাই।[৩৫] এখনও প্রতিবছর কম-বেশি বিধবাবিবাহ হচ্ছে। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৪টি[৩৬] বিধবাবিবাহ হয়েছে। প্রতিটি বিবাহ হয়েছে বিধবাবিবাহ আইন অনুযায়ী। ধর্মীয় মতেও কিছু সংখ্যক বিধবার বিয়ে হয়ে থাকবে, যার কোনও রেকর্ড নেই।

যদিও মোট বিবাহিতের সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা নিতান্তই কম। বিধবাবিবাহকারীকে এখন আর সমাজের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয় না। তবুও ব্যাপকভাবে আজও সমাজে এ প্রথা প্রচলনের কোনও আশা নেই। মেয়েদের জীবনের এই অগ্রগতি হিন্দুসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। তাই আইন শুধু একটা পোশাকি আইন রয়ে গেল। রাতারাতি সংস্কারক হওয়ার মোহে, আর্থিক সুযোগ সুবিধালাভ ও রমণী ভোগের প্রলোভনেও কেউ কেউ বিধবাবিবাহ করেছিল। প্রস্তাবিত অর্থ না পেয়ে ভাস্কর সম্পাদকের কাছে দুঃখ করলেন হরিহর চক্রবর্তী নামে বিধবাবিবাহকারী এক ব্রাহ্মণ[৩৭]। বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থকরাও মুখে যাই বলুন, যুগসঞ্চিত সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেননি।[৩৮]

৩৪. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২
৩৫. 'আর্যদর্শন', বৈশাখ, ১২৯১
৩৬. 'যুগান্তর', মে, ১৯৭৮
৩৭. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭
৩৮. ক) "প্রথম বিধবাবিবাহ-কারী শ্রীশচন্দ্র, বিবাহের কয়েক বছর পর দ্বিতীয়া পত্নী কালীমতী দেবীরও মৃত্যু হয়। এই স্ত্রীর কোনো সন্তান হয়নি। আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারের আর সকলের চেষ্টায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই সময়ের হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের পর পুনরায় স্বশ্রেণীভুক্ত হন।"
—হাসিরাশি দেবী, 'কুশদহের ইতিহাস', সং ১৯৬৮, পৃ. ৯৭
খ) ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রও বিধবাবিবাহের উদ্যোগী সমর্থক। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ও 'মাসিক পত্রিকা'য় বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদক, ৭.১২.১৮৫৬-তে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহ সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, তিনিই ১৮৭১-এ 'অভেদী' লিখলেন, "যে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা সে কি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে? যে কালেতে পতিকে ভুলে যায় সে কি পতিপরায়ণা? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইন্দ্রিয়দমন ও আত্মার শক্তিবর্ধন।"
—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', (কলকাতা, ১৯৭১) পৃ. ৪৪২

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে হাত দিয়ে বিদ্যাসাগর 'সর্বস্বান্ত'[৩৯] হয়েছিলেন। তিনি নিজে নাকি এক জায়গায় লিখে গেছেন, ৬০টি বিধবাবিবাহের জন্য তাঁর ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তিক্তভাষায় টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সংস্কার প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এ কাজ নৈতিকভাবে দুর্বল এবং বিদ্যাসাগরের ব্যর্থতার মূলে এই নীতিদুষ্ট কর্ম, যা তাঁর দেহান্তের বহুপূর্বেই আন্দোলনটির প্রাণশক্তি বাংলাদেশে নষ্ট করে দিয়েছিল।[৪০] সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম ঐতিহাসিক অধ্যাপক চার্লস্ হিমসাথ্ বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রথম সর্বভারতীয় সংস্কার আন্দোলনরূপে অভিহিত করেন এবং আইনগত সাফল্য ছাড়া বাস্তবে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন। বিদ্যাসাগর জীবনসায়াহ্নে এসে তাঁর ব্যর্থতা অনুধাবন করতে পেরে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"

৩৯. হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'ভিক্টোরীয় যুগে বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২১৩

৪০. ক) S. Tattabhusan, 'Social Reform in Bengal', Cal. 1904, p. 77
খ) C. H. Heimsath, 'Indian Nationalism and Hindu Social Reform', 1964, pp. 85-87

বহুবিবাহ আন্দোলন
(১৮৫০-১৯০০)

১২৭৭ সালের শ্রাবণ মাসের 'বামাবোধিনী'তে একটি চিঠি বেরোয়,

"এদেশের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ প্রথা এইবার বোধ হয় উঠিবে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোরপোষের দাবিতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ ্ টাকা ডিক্রী পান। জজ নর্ম্মান সাহেবের নিকট এ বিষয়ে আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয় না। আমার ছয় স্ত্রী আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব।' জজ সাহেব বলিলেন, 'তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে, তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ ১০ আনা করিয়া খোরাকী পাইবে।' বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণকে শেষ পর্যন্ত জেলে যেতে হয়।"

তবে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের দিকে তাকালে আমরা 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে'—ঈশ্বর গুপ্তের এই কাব্য পঙ্‌ক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। সেই কারণে ১৮৩৯-এও 'সমাচার দর্পণে' এই রকম ঘটনার উল্লেখ দেখি, "বালি সম্বাদ পত্র লেখে, কিয়দ্দিবস হইল বালিগ্রাম নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তর গত হইয়াছেন।"[১]

বালি নিবাসী গোবিন্দচন্দ্রের মতো সহায় সম্বলহীন পৈতাসর্বস্ব ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র কৌলীন্যের জোরে উনিশ শতকের শেষ দশকেও বিবাহের নামে অবাধে বাঙালি মেয়েদের সর্বনাশ করত।

কোন্ সময়ে কিভাবে এবং কখন বহুবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে, বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা, রাজা বল্লালসেন কর্তৃক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দান। যা প্রবর্তনের সঠিক সন তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে এ প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা একমত।[২] বল্লালসেন ও তাঁর পরবর্তী রাজা

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড), (সং ১৩৫৬), পৃ. ২৫৪
২. ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', (সং ১৯৭১), পৃ. ২৯

লক্ষ্মণসেনের সময় কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানের কোনও বাধা ছিল না, যাকে 'সর্বদ্বারী' বিবাহ বলা হত। তাই এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিয়ে করার দরকার হত না। বহুবিবাহ প্রচলনের প্রত্যক্ষ কারণ, পরবর্তী সময়ে দেবীবর ঘটক কর্তৃক দোষানুসারে কুলীনদের 'মেল বন্ধন' ; যাতে কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদানের স্বাভাবিক ও স্বাধীন পথ রুদ্ধ করে মাত্র কয়েকটি ঘরের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং কুলীন পাত্রে কন্যা আদানপ্রদানের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে বলা হয়, উদ্দেশ্য কুলবিশুদ্ধি বজায় রাখা।

ফল কিন্তু বিপরীত হল। নারীসমাজের ওপর নেমে এল চরম অভিশাপ। যাঁরা কুলমর্যাদা পেলেন না, তাঁরা কুলমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বহু ব্যয় করে তথাকথিত কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের জন্য লালায়িত হলেন। বিবাহ ব্যবসা হল অপদার্থ কুলীনদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ। একই সঙ্গে একই পুরুষের গলায় দশ-বারোটি কন্যা গেঁথে দেওয়া হত। কখনও বা পাত্রের অভাবে গৃহকর্তা বিভিন্ন বয়সী অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের একই কুলীনে সমর্পণ করতেন। ধর্মশাস্ত্রে বয়স্থা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও মেলী কুলীন শ্রীনাথ আচার্য প্রমুখ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করে ইঙ্গিতে তার সমর্থন করলেন। বাল্যবিবাহেও কোনও বাধা ছিল না। কাজেই কৌলীন্যের প্রতাপে পরিবারের কর্তারা চার মাস থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত সমবয়সী সব মেলের আইবুড়ো মেয়েকে একপাত্রে যেমন সমর্পণ করতেন, তেমনি ৭ বছরের ছেলের ঘাড়েও[৩] ৩০ বছর থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী আট-ন'টি বউ চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। কুলীন পাত্রের অভাবে গৃহকর্তা কন্যাদের আজীবন অবিবাহিত রেখে পাপের পথে সহায়তা করতেন, তথাপি অকুলীনে কন্যা সম্প্রদান করে কুল ক্ষয় করতেন না। এর ফলে কুলীনদের ঘরে 'ঠেকা'[৪] মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল। কৌলীন্যের কল্যাণে একদিকে যেমন মুমূর্ষু বৃদ্ধা বালকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে দেহশুদ্ধিপূর্বক চিতারোহণ করত, অপরদিকে তেমনি কুলরক্ষার পরমুহূর্তেই কন্যাকে শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে ফেলতে হত। মাত্র ৬০টি বিবাহকারী রামলোচন বৃদ্ধ বয়সে যে রাতে কাঞ্চনী গ্রামের রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি মেয়েকে বিয়ে করেন, তার পরদিন ভোরে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৫] বিবাহরাতে স্ত্রীর কাছে আলাদা অর্থ উপহার না পেলে অনেক কুলীন স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শুতে অস্বীকার করত, সমকালীন পত্রপত্রিকায় এ ধরনের ঘটনার অভাব নেই। নারীভোগের বাসনা ছাড়া, জীবিকানির্বাহ, পারিবারিক দেনাশোধ, এমনকি চাঁদার অর্থ সংগ্রহের জন্যও ও 'লোকলজ্জা' বিসর্জন দিয়ে ভঙ্গ কুলীনরা স্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন। সময় অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হয়নি, বিয়ে করে সুখেই দিন কেটেছে, নির্লজ্জের মতো একথা জানালেন এক ভঙ্গ কুলীন। এঁদের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেন, "তাঁহাদের

৩. 'বামাবোধিনী', জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, 'কৌলীন্য কণ্টক'— "বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহেও এইরূপ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে হয়।"

৪. নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), কলকাতা, সং ১৯১২, পৃ. ২৭৮ —ঘর থাকলেও স্বজনাদোষের ভয়ে চিরকুমারী ব্রাহ্মণ কন্যাকে 'ঠেকা মেয়ে' বলা হত।

৫. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' (সং ১৯৭৫), পৃ. ২৫৪

চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই।"[৬]

বহুপত্নীক কুলীনরাও ব্যভিচারী হত। এসবের ফলে সমাজদেহ যে কলুষিত হচ্ছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পিতামাতার মৃত্যুর পর নিরুপায় হয়ে অনেক কুলীনের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের হিসাব অনুযায়ী ১৮৫৩-এ কলকাতার ১২,৪১৯ জন দেহোপজীবিনীর মধ্যে অনেকেই কুলীন কন্যা।[৭]

কৌলীন্যের প্রতাপে কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহ করে কন্যা নষ্ট করতেন, এর ফলে অকুলীন ব্রাহ্মণদের বিয়ের পাত্রী জোগাড় করতে অসুবিধা হত। অর্থব্যয় করে তাঁদের স্ত্রী জোগাড় করতে হত। নিম্নবর্ণের মেয়ে এমনকি মুসলমান রমণীকেও ব্রাহ্মণী বলে চালিয়ে দেওয়া হত। একদিকে শতদার কুলীন, অপরদিকে অকৃতদার অকুলীন, এই পরস্পর বিরোধী অবস্থা সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে। উনিশ শতকের প্রথম দশকেই তাই অকুলীন ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তাঁরা রাজদ্বারে আবেদন করে আইন করে এ প্রথার উচ্ছেদ চাইলেন। তিরিশের দশকে 'সমাচার দর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'রিফর্মার', 'ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজারভার', 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা এর বিরুদ্ধে কলম ধরে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' বহুবিবাহের পক্ষ নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে মসিযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

চল্লিশের দশকে বিধবা বিয়ে নিয়ে সংস্কারকরা মেতে থাকায় বহুবিবাহ সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয়নি।

আমাদের আলোচ্য পর্বে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে একাধারে সাময়িকপত্র ও ব্যক্তিগত প্রয়াসে আন্দোলন বেশ জমে ওঠে। সব সামাজিক ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থন না করলেও ১৮৫১-এ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এদেশের দুরবস্থার অন্যতম কারণ অশাস্ত্রীয় ও ঘৃণ্য বহুবিবাহকে অল্পায়াসে আইন করে রহিত করতে পারেন বলে মন্তব্য করেন। এর পরের বছর জনৈক দেশহিতৈষী 'সমাচার দর্পণে' 'কৌলীন্যের দোষ' শীর্ষক এক পত্রে মন্তব্য করেন, "হিন্দুজাতি সম্বন্ধে ব্লাক আক্ট স্বরূপ কুলীনদের বহুবিবাহের কাল নির্ণয় শ্বেত পরিচ্ছেদধারী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হো-আইট আক্ট ব্যতীত কদাচ নিবারণ হইতে পারে না।"[৮] এসব ব্যক্তিগত প্রয়াস ছাড়া এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রথম কৃতিত্ব বোধ হয় 'বন্ধুবর্গ সমবায় সভা'র উদ্যোক্তা বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রর। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এই সমিতির তরফ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র আইন করে বহুবিবাহ রদ করার জন্য 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে' আবেদন করেন।[৯] সমিতির অন্যতম সদস্য অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৭৭ শকের চৈত্র সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন,

"ইহা পরমাহ্লাদের বিষয় যে এক্ষণে এদেশীয় অনেক প্রধান মনুষ্য স্বদেশের কুরীতি

৬. 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (২য় খণ্ড, সমাজ), সং ১৩৪৫, পৃ. ২৬৬

৭. Kulin Polygamy, 'The Calcutta Review', Vol. XLVII, 1868, p. 142

৮. 'সমাচার দর্পণ', ৫২ সংখ্যা, ২৪.৪.১৮৫২, পৃ. ৪১৫

৯. মন্মথনাথ ঘোষ, 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' (কলকাতা ১৯২৬), পৃ. ১০৭

প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার উৎসেদ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন।”

পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৮ শকের বৈশাখ সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী' সামাজিক বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ বিধেয় নয়, চিন্তা করে অন্তত বহুবিবাহের মতো জঘন্য প্রথা দূর করার ব্যাপারে সরকারি সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, সেকথাও জানায়। এই প্রথার ঘোর বিরোধী প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য ১৮৫৫-এর মার্চ মাসে 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে' আবেদন করেন। যদিও বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে প্রসন্নকুমারের এই আবেদনের কথা উল্লেখ করেননি।

রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ও এইপর্বে আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করার কথা বলেন। সাহায্য করলেন বিদ্যাসাগর। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। বর্ধমানের মহারাজা, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এতে স্বাক্ষর করেন। এঁদের দৃষ্টান্তে কলকাতা, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, যশোর, ঢাকা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে একের পর এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্র ছাড়া জুলাই ১৮৫৬-র মধ্যে ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে যে সমস্ত আবেদনপত্র আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১) বর্ধমানের মহারাজার আবেদন, ২) নদীয়ার রাজার আবেদন, ৩) কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন, ৪) কলকাতা টাকশালের হিন্দু কর্মচারীদের আবেদন, ৫) হুগলির কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্য অধিবাসীদের আবেদন, ৬) হুগলীর অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী ও অন্যান্যদের আবেদন, ৭) হুগলির শিবনারায়ণ রায় ও অন্যান্যদের ২টি আবেদন, ৮) কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন, ৯) জয়কৃষ্ণ মুখার্জী ও অন্যান্যদের আবেদন, ১০) আঁটপুরের অধিবাসীদের আবেদন, ১১) বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন, ১২) বর্ধমানের সারদাপ্রসাদ রায় ও অন্যান্যদের আবেদন, ১৩) বর্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জী ও অন্যান্যদের আবেদন, ১৪) নদীয়ার রামলোচন ঘোষ ও অন্যান্যদের আবেদন, ১৫) শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ও অন্যান্যদের আবেদন, ১৬) নদীয়ার সারদাপ্রসাদ মুখার্জী ও অন্যান্যদের আবেদন। এছাড়া ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর ইত্যাদি স্থান থেকেও আবেদনপত্র পেশ করা হয়। মোট সংখ্যা ৩০।[১০] বহুবিবাহ বিরোধী এই আবেদন পত্রগুলিতে মোট হাজার দশেক লোকের সই ছিল। এ প্রথায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে রাজদরবারে একটিমাত্র আবেদনপত্র জমা পড়ে। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা ছিল রাধাকান্ত দেবের।

১৮৫৬-র গোড়ার দিকে ঘৃণ্য বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ৩-৪ জন কুলীন পত্নী গভর্নর জেনারেলের 'এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে', এক আবেদন করেন। এসব দেখেশুনে ২৫.১১.১৮৫৬-য় 'ভাস্কর' সম্পাদক উল্লসিত হয়ে লেখেন,

“বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই।”

১৮৫৬-৫৭-র মধ্যে একাধিক আবেদনপত্রে বহুবিবাহকে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। আইন পাস করে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য রমাপ্রসাদ রায়, ১৮৫৬-এ জে.পি.

১০. 'Anty Polygamy Tracts', No. I, 1856, pp. 12-14.

গ্রান্টের (ভারত সরকারের সদস্য) সহযোগিতায় এ ধরনের একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের জন্য শেষরক্ষা হয়নি। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে রমাপ্রসাদের এ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন।

কয়েক বছর চুপচাপ থাকার পর ষাটের দশকে সংস্কারকরা এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৮৬৩-তে অক্টোবর মাসে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ নন্দী এবং আরও প্রায় ১৬০০ স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশ থেকে ভারত সরকারের কাছে এ বিষয়ে আইন পাস করার জন্য আবেদন পেশ করেন। এতেও কোনও ফল হয়নি। এরপর বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ উদ্যোগী হয়ে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য বড়লাট এলগিনের কাছে কৌন্সিলে উপস্থিত করার জন্য একটি খসড়া বিল পেশ করেন। এই খসড়া বিলটি (ইংরেজি) বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ পুস্তকের 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত করেছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য ছিলেন, এজন্য সময় ও সুযোগ পেলে হয়তো এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতেন। কিন্তু তাঁর সদস্যের কার্যকাল ফুরিয়ে যাওয়ায় বিলটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

প্রথম আবেদনপত্রটি পেশ করার এগারো বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে আইন করে বহুবিবাহ উঠিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিদ্যাসাগর পুনরায় একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এ পর্বে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস কিংবদন্তির মতো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুলীনদের বিবাহের তালিকা প্রস্তুত করা, বই লিখে জনমত গঠনের চেষ্টা, আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে চব্বিশ জন ব্যক্তির একটি ডেপুটেশন এবং বর্ধমানের মহারাজার পক্ষ থেকেও স্বতন্ত্র একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। সরকারি পক্ষকে যে বিদ্যাসাগর তাঁর মতের পক্ষে আনতে পেরেছিলেন তা তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নরের পত্র থেকে জানতে পারি : "I have taken a deep interest in the question since it was first seriously agitated by our late lamented friend, Vidyasagar for enactment there upon saw the Maharaj of Patitions on the subject had been presented to the Legislative Council. Sir John Grant promised very shortly to introduce a Bill for the abolition of Hindu Polygamy."[১১]

ভারত সরকার বেশ মুশকিলে পড়লেন এবং বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার জন্য ১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট বাংলা সরকারকে এক পত্র দেন। ভারত সরকারের পত্র অনুসারে বাংলা সরকার ১৮৬৭ সালে ৭ জন সদস্যের একটি কমিটির ওপর বিষয়টি বিচার-বিবেচনার ভার দেন। সদস্যরা হলেন—১) প্রিন্সেফ, ২) হবহাউস, ৩) সত্যশরণ ঘোষাল, ৪) বিদ্যাসাগর, ৫) রমানাথ ঠাকুর, ৬) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৭) দিগম্বর মিত্র। একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর সকলেই আইন পাস করে বহুবিবাহ বন্ধ করার বিপক্ষেই মত দেন।[১২] এমনকি অন্যতম সদস্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে পূর্বে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনিও সুযোগ বুঝে এর বিরোধিতা করেন।

১১. ইন্দ্র মিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' (সং ১৯৬৯), পৃ. ৩৪০
১২. ইন্দ্র মিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' (সং ১৯৬৯), পৃ. ৩৪৫

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রমানাথ ঠাকুর এঁদের স্বতন্ত্র বিবরণীতে জানান যে, কুলীনের মধ্যে বহুবিবাহ অনেক কমে গেছে এবং ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও কমে যেতে বাধ্য।[১৩] শুধু এঁরাই বা কেন? প্রথম যুগে ইংরেজি জানা ছেলেদের এদেশীয় রীতিনীতির প্রতি অনাস্থা দেখে অনেকেই এরূপ ভেবেছিলেন। বিদ্যাসাগর যে তা চিন্তা করেননি তা নয়। তবে তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা অবিলম্বে সমূলে উৎপাটন করতে, কোনওরূপ আপস করতে নয়। বিধবাবিবাহ আইন পাসের ব্যর্থতা স্বচক্ষে দেখেও ১৮৬৬-তে তিনি দু'বার আবেদনপত্র পাঠান এবং ১৮৬৭ সালে বহুবিবাহ বিষয়ক নির্বাচিত কমিটির সদস্য হিসাবে স্বতন্ত্র বিবরণীতে বলেন, "বহুবিবাহ এত কমে যায়নি যে তার সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়।"

বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। পরে এ প্রসঙ্গে আসছি।

আইন পাসে ব্যর্থ হয়ে এর কদর্যরূপ তুলে ধরে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য বিদ্যাসাগর যুক্তি ও তথ্য দিয়ে একখানি পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে ১৮৭০ সালে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যগণ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। সভ্যগণ হিন্দুসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হওয়ায় আচারভ্রষ্ট কুলীনরাও সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছেন, অথচ আচারনিষ্ঠ অকুলীনরাও সামাজিক সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব দেখেশুনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যগণ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই সভার মুখপত্র 'সনাতন ধর্মোপদেশিনী পত্রিকা' (কার্তিক, মাঘ ১২৭৭) বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কলম ধরল।

আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করলে শাস্ত্রের অমর্যাদা হবে কিনা—এ বিষয়ে সভ্যগণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পরামর্শ চাইলেন। বিদ্যাসাগরের কাজের সুবিধা হল। তিনি তাঁর অসমাপ্ত পুস্তকে একাধিক শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে দেখালেন যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়। এর নিরোধে শাস্ত্রীয় মর্যাদার কিছুমাত্র হানি হবে না। ১৮৭১-এর ১০ আগস্ট 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকাটি বের হল। এতে বিদাসাগর বহুবিবাহকে 'অশাস্ত্রীয়' ও 'অমানবিক' বলেই কর্তব্য শেষ করেননি। এই কুপ্রথা যাতে সমাজ থেকে দূর হয়, এজন্য কুলীনদের মধ্যে 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলনের কথা বললেন ; যদিও আইন পাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি।

শাস্ত্র ও ধর্মবিরোধী এ প্রথা আইন করে বন্ধ করার জন্য 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যগণ সরকারের কাছে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐতিহ্যবাহী হিন্দুরা এতে বিক্ষুব্ধ হলেন। এঁদের বক্তব্য, 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যরা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁরা এগিয়ে এসে অকুলীনে কন্যা সম্প্রদান করলে অন্যেও তা অনুসরণ করবে। অথচ তাঁরা তা না করে রাজদ্বারে আবেদন করার প্রস্তাব করেছেন। সমাজের কু-প্রথা নিবারণ করাই যদি এঁদের মূল উদ্দেশ্যে হয় তাহলে রাজপুরুষের সাহায্য না নিয়ে দেশের মধ্যে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে সমাজের ইষ্ট সাধন সম্ভব। ২০.৩.১২৭৮ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ঐতিহ্যবাহী হিন্দুদের তরফ থেকে

১৩. ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি' (সং ১৯৭৮), পৃ. ৪৯

সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যদের অলস, কর্মবিমুখ ও শ্রমশক্তিহীন বলা হয় এবং সভ্যদের পরের স্কন্ধে 'কষ্ট ও আপদ নিক্ষেপ করে' ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা ও নিজেদের বাহাদুর জ্ঞান করার প্রচেষ্টারও তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'এডুকেশন গেজেট' স্পষ্টই জানাল, "বহুবিবাহে যতই দোষ থাক, যদি হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা ভ্রমবশত রাজসন্নিধানে আবেদন করেন, আমরা ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিব ও পাঠকদের ইহার প্রতিকূলে মত প্রদান করিতে অনুরোধ করিব।"

যাই হোক 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যগণের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনায় পত্রপত্রিকাগুলি মুখর হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত বইটির প্রতিবাদেও পাঁচজন পণ্ডিত পাঁচখানি বই লিখে ফেললেন। এঁরা হলেন মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশালের রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, বারাণসীর যুবক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রয়ী ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮৭৩-এর এপ্রিলে প্রকাশিত বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে তর্কবাচস্পতি প্রকরণ, ন্যায়রত্ন প্রকরণ, স্মৃতিরত্ন প্রকরণ, সামশ্রমিক প্রকরণ, কবিরত্ন প্রকরণ রচনা করে প্রত্যেকের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন। তীব্র সমালোচনা করলেন পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে, যিনি পাঁচ বছর পূর্বে বহুবিবাহ নিবারণ উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য, "বাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই, নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রের প্রবেশ নাই, বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে কিন্তু মীমাংসা করবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই।"[১৪]

এই পর্বের বাঙালি মানস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশই এই প্রথার বিপক্ষে। কিন্তু বিপক্ষে হলেও আইন করে বহুবিবাহ রদ করার প্রয়াসকে অনেকে উচিত বলে মনে করেননি। এক্ষত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মনোভাব স্মরণযোগ্য।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বহুবিবাহের বিরোধী হলেও আইন করে এ প্রথা রদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রস্তাব করেন, শাস্ত্রজ্ঞ কারণ ছাড়া যাঁরা বহুবিবাহ করবেন তাঁদের ৫০০ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হবে।

দ্বারকানাথের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর একটি পত্রে তাঁকে প্রশ্ন করেন, "বহুবিবাহ বিষয়ে গুরুতর কর ধার্য্য করিলে রাজার কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না?"[১৫]

বিদ্যাসাগরের পত্রের উত্তরে দ্বারকানাথ লেখেন, "জন্মাবধি সোমপ্রকাশ গুরুতর কর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে ইহা অপ্রসিদ্ধ নয়। তবে বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্ধারণ প্রস্তাবটা অগত্যাকৃত কন্টক দ্বারা কণ্টক শোধন সদৃশ। রাজা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি বহুবিবাহকারীকে গুরু দণ্ড বিধানে আইন করেন, সেটা শরীর প্রবিষ্ট দূষিত কণ্টকের ন্যায় বহু অনর্থের হেতু হইয়া উঠিবে। এই আশঙ্কা করিয়াই আমরা তাহার নিষ্কাশন কণ্টকের ন্যায় বহুবিবাহের উপর গুরুতর কর নির্ধারণ প্রস্তাব করিয়া

১৪. 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', (সমাজ, ২য় খণ্ড), (সং ১৩৪৫), পৃ. ২৮৭-৮৮
১৫. 'সোমপ্রকাশ', ৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮

ছিলাম।" এরপর পত্রিকা সম্পাদক এ বিষয়ে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যদের প্রচেষ্টার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাতে 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলিত হয় সে ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে প্রচেষ্টা চালাতে পরামর্শ দেন। আরও অনেক উদারপন্থীর মতো দ্বারকানাথের বিশ্বাস ছিল যে, আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে, সামাজিক কু-প্রথাগুলি আপনা থেকে ধীরে ধীরে লোপ পাবে। তার জন্য আর সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। দ্বারকানাথের এ বিশ্বাস কতখানি বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রসূত এবং কতখানি জনমতকে আঘাত করার ভয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ, তা ভেবে দেখা দরকার। শুধু দ্বারকানাথ কেন, সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যাঁরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাঁরা জনমতকে আলোড়িত করতে চাননি এবং খানিকটা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। এখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পার্থক্য। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সামাজিক ব্যাধির অবিলম্বে উপশম, তা সে যে করেই হোক। এজন্য উদারপন্থী বন্ধু দ্বারকানাথের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল 'এডুকেশন গেজেট' তার পরিচয় দিয়ে লেখে,

"বহুবিবাহের বিচার ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ পত্রিকা সম্পাদক ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই তিনজন সশস্ত্র রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইল সোমপ্রকাশ সম্পাদক বহুবিবাহ নিবারণের উপায় স্বরূপ বহুবিবাহের উপর ৫০০ টাকা কর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর ভাবিলেন সম্পাদক গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। ভাবিয়া তাহার প্রতিবাদার্থে সোমপ্রকাশে পত্র লিখিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিত মানুষ, বিশেষত কলেজের অধ্যাপক, বলিতে পারেন না আমি সে প্রস্তাব রহস্যভাবে করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র পাইয়া তাঁহাকে কাজে কাজেই তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। খণ্ডন করিতে গিয়া সম্পাদক যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের সদৃশ ব্যক্তির হস্তে তিল তিল খণ্ডিত হইতে পারিবে। তবে এতে শঙ্কা হইতেছে বাদানুবাদ পাছে এই পর্যন্ত হইয়াই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।"[১৬]

বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি এখানেই হয়নি। আসরে নামলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই যে, বহুবিবাহ কু-প্রথা, তবে এ প্রথা কেবলমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বিনা আয়াসেই তা কমে আসছে। এর কারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলে যা সামান্য অবশিষ্ট আছে তা কমে যেতে বাধ্য। কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সমস্যাটি যতটা প্রবল মনে করেছেন, আসলে তা তত প্রবল নয়। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েও কোনও লাভ হবে না। কারণ শাস্ত্রে যে যে ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের সমর্থন আছে তা অনুসরণ করলে, "এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ পরায়ণ সেখানে সহস্র সহস্র অকুলীন ব্রাহ্মণ, শুদ্র বহুপত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসার ধর্ম করিতে পারিবেন।" বিদ্যাসাগর প্রদত্ত বহুবিবাহকারীর তালিকার সত্যতা সম্বন্ধেও তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তালিকাটি যথার্থ হলেও বহুবিবাহকারীর সংখ্যা সমগ্র জনসাধারণের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। বিনা আয়াসে একদিন যা উঠে যাবে

১৬. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭৪

জোর জবরদস্তি করে তা তুলবার চেষ্টা করলে বিধবাবিবাহ আইন পাসে যে ফল হয়েছিল এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।[১৭]

বঙ্কিমের বক্তব্যকে সমর্থন জানাল 'হালিশহর পত্রিকা'।[১৮] ঐ একই সংখ্যায় 'বিদ্যাসাগরের প্রতি উপদেশ দেওয়া বঙ্গদর্শন লেখকের ধৃষ্টতামাত্র' বলে মন্তব্য করে বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতায় এর কড়া জবাব দেয়। সংশয়ে পড়ল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ৬.৭.১৮৭১ তারিখে পত্রিকাটি পূর্বোক্ত 'সোমপ্রকাশ পত্রিকা'-য় ৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮-এর সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদক মহাশয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে, সমাজের স্বার্থে দেশের স্বার্থে বহুবিবাহকে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে। অথচ ২৪ জুন, ১৮৭৩-এর সংখ্যায় লেখে,

"বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের মতামতকে আমরা সমর্থন করি...বহুবিবাহ দিন দিন সমাজকে কলুষিত করলেও তাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা রাজ ব্যবস্থার প্রার্থী হতাম না। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে রাজা বিশেষতঃ বিদেশী রাজার হস্তক্ষেপ রাজনীতি বিরুদ্ধ।"

ঐ একই সংখ্যায় পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরের প্রতি উপদেশ দেওয়া 'বঙ্গদর্শন' লেখকের পক্ষে উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেনি।

'বামাবোধিনী'-র পৌষ, ১২৭৮ সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমের বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করা হয়।

বহুবিবাহ সমর্থন না করলেও আইন করে এ প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে অনেকেই মত দেননি।

আদমসুমারির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে ভূদেব বলেন,

"আদমসুমারীর রিপোর্টে বহুবিবাহের অতি সামান্য রূপ উল্লেখ আছে। কারণ এখন আর ভারতবর্ষে বহুবিবাহের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। বিবাহিত পুরুষের যে সংখ্যা তাহাদের পত্নীসংখ্যা তাহা অপেক্ষা লক্ষমাত্র অধিক অর্থাৎ শতকরা .৫৪, তন্মধ্যে হিন্দুপত্নীর আধিক্য শতকরা .৩, বাস্তবিক বহুবিবাহ ব্যাপারটা কখনও কোন দেশে সমধিক পরিমাণে প্রবল হইতে পারে না।"[১৯]

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করেননি। 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিবাহ যেহেতু সামাজিক ব্যাপার তাই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টিও পরিবর্তিত হচ্ছে, এমনকি মনুর নিয়মও সমস্ত বর্তমান ঠিক ঠিক ভাবে মানা হচ্ছে না। যদিও হিন্দু সমাজে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অতএব বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে 'হিন্দুবিবাহ' সমালোচনা করবার অধিকার হিন্দুমাত্রেরই আছে। এতে শাস্ত্রের অবমাননা হবে না বরং তার সম্মান দেখানো হবে। তবে আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ সংস্কার তিনি সমর্থন করেননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "জীবনের সকল কাজই যে লাল পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য

১৭. দ্রঃ 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১২৮০
১৮. 'হালিশহর পত্রিকা', আশ্বিন ১২৭৮, ৬ সংখ্যা
১৯. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'সামাজিক প্রবন্ধ', ভবিষ্যবিচার, পৃ. ২১৭

সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে। আপনার মঙ্গল অমঙ্গল কোন কালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না। জুজুর হাতে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে না।"[২০]

বহুবিবাহকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রীতির চোখে দেখবেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই বলে, বিদ্যাসাগর নৈতিক শক্তিতে বহুবিবাহকে হেয় প্রমাণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবন তাঁর সামনে ছিল একপত্নীক নৈতিকতা ; যদিও স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন, বিদ্যাসাগর সাংসারিক জীবনে সুখী নন। সহজবোধ্য কারণে এ ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের নাম করেন নি।

"বহুবিবাহ সম্বন্ধে কিন্তু স্বামীজীর অধিক বক্তব্য পাই না। তার সহজ কারণ তাঁর সময়ে কৌলীন্যের প্রতাপ কমেছে এবং বহুবিবাহ মারাত্মক কোন সমস্যা নয়। তাঁর মতো সমাজবিজ্ঞানীর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ প্রয়োজন হতে পারে, যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা দেশে নেই। কিন্তু সেই সুযোগ যেহেতু নারীর ক্ষেত্রেও নেই, তাই নারীর মতো পুরুষের ত্যাগও দাবি করেছেন। রামচন্দ্র সীতার বিকল্প স্বর্ণসীতা বসিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হননি, একথা তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকায় একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই, তবে নিঃসন্তানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে স্বামী পুনর্বিবাহ করতে পারে।"[২১]

পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিক্রমপুরের তারাপাশ গ্রামের অধিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামে এক ভঙ্গ কুলীন, যাঁর নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কৌলীন্যের জোরে প্রথম জীবনে তিনি একাধিক বিয়ে করেন এবং ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র স্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়েই বাপ-পিতামহের মতো তিনিও সুখে জীবিকানির্বাহ করতে পারতেন। সে পথে না গিয়ে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রচারে নামেন, যাতে এই জঘন্য প্রথা সম্বন্ধে সকলের ঘৃণা জন্মে। সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানের কথা চিন্তা করে তিনি কুলীনদের মধ্যে 'সর্বদ্বারী' বিবাহ প্রচলিত করতে তৎপর হন, যা এক সময় সমাজে প্রচলিত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দান, বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ,[২২] উদ্যোগী হয়ে ভিন্ন মেলে পুত্র-কন্যার বিবাহ,[২৩] রাজদ্বারে আবেদন ইত্যাদি কোনওটিরই

২০. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিন্দুবিবাহ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (সমাজ, পরিশিষ্ট) ১২ খণ্ড, সং ১৩৪৯, পৃ. ৪২১-২৪

২১. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত' (১৩৮৫), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩

২২. প্রতিজ্ঞাপত্র :

"ভঙ্গকুলীনদিগের মেল ও পর্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা বংশধরগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভঙ্গ কুলীন মহাশয়েরা মেল পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্বরূপ সর্বদ্বারিকতা নিয়মে আদানপ্রদান করিলে আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানিজ্ঞান করিব না ; এবং আমরা পরমানন্দের সহিত কর্ম্মকর্তাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিব।"

—'সাধারণী' ফাল্গুন, ১২৮২

২৩. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', পৃ. ২২৭

ত্রুটি করেননি। বস্তুত তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ব্রজসুন্দর মিত্র, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পূর্ববঙ্গের কুলীন বংশীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কলকাতায় 'ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভ্যরাও তাঁকে সমর্থন করলেন। বিদ্যাসাগরের সাহায্য তিনি প্রথম থেকেই পেয়েছেন। 'ঢাকাপ্রকাশ', 'সনাতন ধর্মোপদেশিনী পত্রিকা', 'সাধারণী', 'ভারত সংস্কারক', 'অমৃতবাজার' 'সঞ্জীবনী', 'সারস্বতপত্র', 'The East Dacca' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর সমর্থনে কলম ধরে। তাঁর এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। নামমাত্র কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করতে গোঁড়া কুলীনরাও ইতস্তত করতেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত 'জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখেছেন,

"আমার চেষ্টার পূর্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী পাত্রে কন্যা দান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করতেন। এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেই কন্যাদান করিতে লাগিলেন।"

এই সামাজিক ফলটুকু লাভের জন্য তিনি যে কিরূপ কষ্ট সহ্য ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন তার পরিচয় প্রসঙ্গে 'ঢাকাপ্রকাশ' লেখে, "বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহুদোষকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই, তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহু বিবাহের বহুদোষদ্যোতক পুস্তক গান রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতেছেন। অসহনীয় শীতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সর্বশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্রতা, পারিবারিক অনাচ্ছাদন-ঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেছেন না।"[২৪]

৩০.১০.১২৮২-তে 'সাধারণী', ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'ভারত সংস্কারক' ১২ সংখ্যা, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২০ সংখ্যায়, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'সঞ্জীবনী' ৪৪ সংখ্যায়, 'এডুকেশন গেজেট' ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ৪৩ সংখ্যায় ও 'সারস্বত পত্র' ১২৯২ বঙ্গাব্দের ৪৭ সংখ্যায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে।[২৫]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লোকের নিন্দা গ্লানি কিছু গ্রাহ্য করতেন না। সকলকে বিনীতভাবে বলতেন, "আপনারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা ('কৌলীন্য সংশোধনী') একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক পড়িয়া দেখুন। তারপর আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিতে হয় বলুন।" যদি তাঁহাকে কেহ বলিতেন, "মহাশয় আপনি নিজে বহুবিবাহ করিয়া আবার বহুবিবাহের নিন্দা

২৪. মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, 'সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সংগ্রহ' (ঢাকা ১২৯৪), পৃ. ১-২

২৫. দ্রঃ ঐ, পৃ. ২-৩

করিতেছেন কেন?" তদুত্তরে রাসবিহারী বলিতেন, "ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত প্রকৃত মর্ম কে বুঝিতে পারে?"[২৬]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রয়োজনমতো যে কোনও সময় সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। একদা কোনও শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাসবিহারী আনীত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করার প্রস্তাব কটুভাষায় প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করে সর্বসমক্ষে গেয়ে কুলীন চূড়ামণিকে নাকাল করেছিলেন। গানটি উদ্ধৃত করছি,

"সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়।
বল্লালের জমিদারীর তহশীলদারী দেয় আমায়।
(দেখ) চারি কুড়িঘর সতিন প্রজা আছে আমার পরগণায়
(ভোলা মন মন রে) তাতে মাঠে ঘাটে বাজে লোকে কত
বাজে জমা করে যায়।" (ইত্যাদি)

দীর্ঘদিন পরে শ্বশুরবাড়িতে এসে এক কুলীন ব্রাহ্মণ অপরিচিত মহিলার কাছে শ্বশুর বাড়ির পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানে যে, যাকে জিজ্ঞেস করছে সে তারই বিবাহিতা পত্নী। এ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাসবিহারী একটি গান লেখেন, "বহুদিন পরে এসেছি, চিনি না শ্বশুর বাড়ী....নারি।" তাঁর শিশুবরের প্রতি উক্তি, বৃদ্ধবরের প্রতি বালিকাগণের উক্তি, অনূঢ়া কন্যার উক্তি, কুলীন তনয়াগণের উক্তি, মহারানীর প্রতি কুলীন কন্যার উক্তি ইত্যাদি সঙ্গীত বহুবিবাহকে সাধারণ মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে।[২৭] 'ঢাকাপ্রকাশে' এসব সঙ্গীত বের হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে সঙ্গীতগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, হাটে মাঠে ঘাটে দিনরাত লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে, এমনকী বিবাহের বাসরে মেয়েরা স্থূলরসাত্মক ছড়াগান ও কবিতা আবৃত্তির পরিবর্তে সঙ্গীতগুলি গেয়ে কুলীন ব্রাহ্মণদের রীতিমত লজ্জায় ফেলত। সঙ্গীতগুলির অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গোক্তি ও জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণরা তাঁদের কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তাঁকে সাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর ঢাকার প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করে পত্র দেন। বিদ্যাসাগরের আর্থিক সাহায্যে তাঁর 'সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' নামক বইটি ছাপিয়ে বের করা সম্ভব হয়,[২৮] যা বহুবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল। এতসব করার পরও তিনি রাজদ্বারে আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। তৎকালীন ঢাকার সুবিখ্যাত কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে তিনি সরকারের কাছে আইন পাসের জন্য আবেদনপত্র পাঠান। আবেদনপত্রটির সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের লেখা 'কৌলীন্য সংশোধনী' পুস্তক ছাড়া 'বল্লালী সংশোধনী' (১২৭৫), বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ভারতবর্ষের 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা, ফরিদপুর

২৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', পৃ. ১৩১
২৭. দ্রঃ 'প্রদীপ', শ্রাবণ ১৩০৭
২৮. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন' (সং ১৮৮১) পৃ. ৪৩

'কৌলীন্য সংশোধনী সভা'র পুস্তক, অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের 'কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা' ইত্যাদি যুক্ত করে গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে কোনও আইন পাস সে সময়ে হয়নি। এর কারণ, ১৮৫৭ সালের পর সরকার ভারতবাসীদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং বহুবিবাহকারী কুলীনরাও সমাজে হেয় হয়ে পড়েন।

সত্তরের দশকের শেষেই এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশিষ্ট দুই দশক ধরে পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি হয় এবং সভাসমিতিতেও বিচ্ছিন্নভাবে আলাপ-আলোচনা চলে।

১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত 'Indian National Social Conference'-এর ষষ্ঠ অধিবেশনে কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রথারও পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এ নিয়ে আর আইন পাসের প্রয়োজন নেই। এছাড়া 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলন করে সমস্যাটির বাস্তব সমাধানের ওপর জোর দেওয়া এবং এ ব্যাপারে কুলীনদেরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধ করার প্রস্তাবন গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৫ সালে সে যুগের নামকরা শিক্ষিত ব্যক্তি উমাচরণ মুখার্জীর সভাপতিত্বে কুলীন ও শ্রোত্রিয়দের এক করার জন্য কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, আদিত্যচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ ১৪ জন কুলীন এক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন।[২৯]

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, গোটা শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে যে এত মুখর হয়ে উঠল, বাদ-প্রতিবাদে সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা জমে উঠল, তা সবই কি বৃথা? আমাদের মনে হয়, না! কোনও আন্দোলনের সাফল্য শুধুমাত্র তার আইনগত দিকের ওপর নির্ভর করে না। আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। আইন প্রণীত না হলেও শুধুমাত্র জনমতের চাপে এবং কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙালি সমাজে বহুবিবাহ হ্রাস পেতে থাকে। আমাদের কথার সমর্থনে আমরা O' Malley সাহেবের বক্তব্যটি উদ্ধার করতে পারি,

"বহুবিবাহ প্রথা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এখন তা উঠে গেছে, এর আংশিক কারণ হল অর্থনৈতিক, কিন্তু আসল কারণ হল এর বিরুদ্ধে জনমতের চাপ।"[৩০]

উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কারকরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমতকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, এটাই এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

২৯. 'Report of the Tenth National Social Conference', Held in Calcutta on the 1st January, 1897, p. 58

৩০. Pradip Sinha, 'Nineteenth Century Bengal' (1965), pp. 77-78

বাল্যবিবাহ আন্দোলন
(১৮৫০-১৯০০)

বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদের সমাজে বহুপ্রচলিত প্রাচীন প্রথা। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির আগেই অনেক সময় অভিভাবকরা পুত্রকন্যার বিবাহ দিতেন। ভুল বললাম, বুদ্ধিমান পিতামাতারা ষষ্ঠীপূজার আগেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেন, কুলপঞ্জীতে[১] এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই প্রথার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় এদেশে দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে। এই শ্রেণীর প্রায় 'পেটে পেটে' সম্বন্ধ। অর্থাৎ কন্যা জন্মানো মাত্রই সমশ্রেণীর কোনও বালকের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে রাখা হত। বালকের বয়স ২-১ দিন বেশি হলেই চলত। পরে কন্যা ৮-৯ বছরে পা দিলে পূর্বনির্দিষ্ট বালকের সঙ্গে 'উদ্বাহ ক্রিয়া' সম্পন্ন করা হত। বিবাহের পূর্বে বাক্‌দত্ত বরের মৃত্যু হলে কন্যা 'অন্যপূর্বা' নামে অভিহিত হত এবং তখন আর কুলীন বরে বিবাহ সম্ভব হত না।[২]

বালক বয়সে দার পরিগ্রহ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হলে কত অনিষ্ট হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া সাঙ্গ হয় এবং অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব পড়ায় বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্যেরা যে সময় দার পরিগ্রহ করে সংসারে প্রবেশ করে, বৈদিকরা তখন পৌত্র-প্রপৌত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হয়ে বিষম বিব্রত হয়ে পড়েন। এর ফলে সেই বহু পরিবারের যথাবিধ লালনপালন, বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি ভার বহন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এছাড়া পাত্রপাত্রীর গুণ বিচার না করে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে রাখায় অনেক সময় অযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা হত। এতে বিবাহের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক, উপার্জনক্ষমতা অর্জনের আগেই পুত্রকন্যার জন্মদাতা হওয়ায় অভাবগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয়ে অনেকেই অকালে প্রাণ হারাত। 'সোমপ্রকাশ'[৩] পত্রিকা সম্পাদক এর করুণ চিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন,

"যিনি বাটীর কর্ত্তা, তাঁহাকে একটী দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তু বলিলে হয়। তাঁহার না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে চিত্তের ঔদার্য্য, না আছে বহুদর্শন, না আছে অর্জন ক্ষমতা ; অল্পবয়সে

১. বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', সং ১৩৬৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫
২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, 'শিবনাথ রচনা সংগ্রহ' ২য় খণ্ড (পঃ বঃ নিঃ দূঃ সঃ), পৃ. ৪
৩. 'সোমপ্রকাশ', ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫

সমুদয় হরণ করিয়া লয়। তাদৃশ কর্তার অধীনে পরিবারেরা যে কীদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হয় তাহা অনুভবশালীদিগের দুর্বোধ নহে।...যতদিন এই শ্রেণীর এ প্রথা প্রচলিত থাকিবে ততদিন যে ইঁহারা শুধরিয়া উঠিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।"

কালক্রমে এ প্রথা যে কীরূপ হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ দিয়ে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

"হরিনাভিতে আন্দোলন প্রচেষ্টা চালাবার সময় দেখা গেল সবই বৈদিক। যারা অবিবাহিত তারা ছিল শিশু, প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্ম বোঝাবার উপযুক্ত উপায় তাদের ছিল না। যারা অবশ্য বুঝতে শিখেছিল তারা সবাই বিবাহিত, যদিও তারা স্কুলের ছাত্র।"[৪]

বাল্যবিবাহ যাঁরা সমর্থন করেছেন তাঁরা এর পেছনে শাস্ত্রের সমর্থন দাবি করেন। অন্তত কন্যার ঋতুকালকে নিষ্ফল রাখার ঘোর বিরোধিতা করেছেন শাস্ত্রকাররা—"অষ্টম বর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্য হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয় ; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়.....।"[৫] রঘুনন্দন কল্পিত স্মৃতিশাস্ত্রে এই অভিনব ব্যাখ্যার ফলেই এক সময় আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, বা ঐ ধরনের কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এর সমর্থন নেই। বরং বিপরীত দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। মহাভারতে মহানির্বাণতন্ত্রে পতিসেবার উপযুক্ত ও ধর্মের শাসন বুঝবার ক্ষমতা জন্মাবার আগে বালিকা কন্যার বিবাহ স্পষ্টই নিষেধ করা হয়েছে। "মনু বলিয়াছেন, বরং মরণকাল পর্যন্ত কন্যাকে গৃহে অদত্তা রাখিবে তথাপি গুণহীন পাত্রে কন্যা প্রদান করিবে না।" বাল্যবিবাহের পক্ষে মনুর সমর্থনের কথা তুললে, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, "সে তোমাদের দেশের পুঁথিতে আছে, আমাদের দেশের পুঁথিতে নাই।"[৬] রঘুনন্দন কল্পিত স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষ করে 'আর্যদর্শন'[৭] মন্তব্য করে,

"রঘুনন্দন ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। আমরা পুরাণে, তন্ত্রে, কাব্যে কুত্রাপি বালিকা বিবাহের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছি না। কোন কোন শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে সত্য, কিন্তু বোধহয়, রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' প্রচারের পূর্বে কখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। তার কোন প্রমাণও পাই নাই।" এছাড়া পূর্বে চতুরাশ্রম,[৮] স্বয়ংবর প্রথা, গান্ধর্ববিবাহ ইত্যাদি প্রচলিত থাকায় বাল্যবিবাহের কোনও অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই এ প্রথা প্রবর্তনের শাস্ত্রীয় কারণ যাই থাক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণকে অস্বীকার করা যাবে না বলে অনেকে মনে করেন।

বাল্যবিবাহ প্রচলনের পেছনে রাজনৈতিক কারণের কথা উল্লেখ করে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'আচার' গ্রন্থে মুসলমানদের হিন্দুরমণীর ওপর অত্যাচারের কথা বলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজে তথাকথিত মধ্যযুগের রাজনৈতিক কারণ না

৪. চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য, 'বহুবিবাহ', (১৮৮৮), পৃ. ৩০

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (সমাজ), পৃ. ১০১

৬. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বাল্যবিবাহ', পৃ. ১৮

৭. 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা' 'আর্যদর্শন', কার্তিক-চৈত্র ১২৮৯

৮. 'নবজীবন', শ্রাবণ ১২৯৪

থাকলেও অর্থনৈতিক কারণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তখনও বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল।

"একদিকে আমোদ পুত্রকে দৃঢ়রূপে সংসারে বদ্ধ করা সেই সঙ্গে কিছু লাভ। অন্যদিকে যত শীঘ্র কন্যাদায় হইতে মুক্তি হয় ততই লাভ।"

যাঁরা বলেন সামাজিক কারণে এ প্রথার প্রচলন হয়েছিল, তাঁদের মতে,

"আর্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিবার পর তাঁহাদের বালকবালিকাগণের তরুণ বয়সেই বিবাহের আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা এড়াতেই বাল্যবিবাহের প্রচলন হয়।"

যে কারণেই হোক, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় মেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত না। উপরন্তু বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহকে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির[৯] কারণ বলেছেন। হার্ডি সাহেবের সেন্সাস রিপোর্টে[১০] ও দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মন্তব্যে এর সমর্থন পাই।[১১] বিধবাবিবাহ আইন পাস করে বিদ্যাসাগর এ সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন, আইনও পাস হল। ঘটা করে ২-১টি বিধবার বিয়েও হল। কিন্তু হলে কী হবে? সমাজ তাকে সমর্থন করল না। সমাজে বহু বিতর্কিত বিধবার বিয়ে নিয়ে তাই সংস্কারকরা ও সহৃদয় ব্যক্তিরা রীতিমত চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা অনেকেই বাল্যবিবাহ রদ[১২] করে বিধবা সমস্যা সমাধানের কথা ভাবলেন এবং এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনোভাব জানতে উদ্যোগী হলেন। কলকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?' বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করেন। টাকি শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারীর প্রেরিত প্রবন্ধটির[১৩] কথা উল্লেখ করছি। প্রবন্ধটিতে লেখিকা বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বিধবাসমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য শ্রীমতী ৮ বছরে বিধবা হন। প্রেরিত প্রবন্ধসমূহে শ্রীমতীর মতেরই সমর্থন পাই।

"চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত কন্যা রাখিলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইত না, অথচ এতগুলি দুর্ভাগিনী বৈধব্যদশা হইতে অব্যাহতি পাইত।" বললেন, সংস্কারক কৃষ্ণবিহারী সেন।[১৪]

"আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করি। করিলে বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে।" এ আবেদন শুধু একা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নয়, বালবিধবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হৃদয়ের ভাষা।

সমাজে কৌলীন্য প্রথা সগৌরবে চলায় ও বাল্যবিবাহে বাধা না থাকায় কুল রাখতে

৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (সমাজ), পৃ. ৯

১০. 'Census Report of the Govt. of India', 1881, p. 171

১১. Dr. H. Anbery Husband, 'The student of Hand Book of Forensic medicine medical Policy', (4th. Ed.), p. 380

১২. 'সোমপ্রকাশ', ৮.৯.১২৯১

১৩. 'নবজীবন', জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

১৪. 'সাধনা', অগ্রহায়ণ ১৩০০-০১

একাধিক বয়সের একাধিক পাত্রীকে বৃদ্ধ অথবা শিশু বরে[১৫] সম্প্রদান করা হত। এর ফলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া অসমবিবাহ প্রচলিত হল, যা একান্তই ঘৃণ্য। স্ত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহ, অসমবিবাহ ইত্যাদি যা কিছু নারীপ্রগতির অন্তরায় হয়েছিল, সংস্কারকরা সবকিছুর মূলে বাল্যবিবাহকেই দায়ী করলেন।[১৬]

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অল্পস্বল্প কথা উঠতে থাকে। তবে রামমোহন এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইয়ং বেঙ্গলরা চিরদিনই এর বিরোধিতা করেছে। 'রিফর্মার' সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৮৩৯-এ মহেশচন্দ্র দে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মধুসূদন এ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটি পত্রে[১৭] গ্রাম্য একটি অপরিণত বয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যবিবাহ সমর্থন করতেন না, তা তাঁর কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তার সংস্কার'[১৮] প্রবন্ধে উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর পরিবারের মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ঠিক করে দেন এবং তদনুসারে ১৩ বছর বয়সে কন্যা স্বর্ণকুমারীর বিয়ে হয়। তবে তাঁর এ প্রয়াস তাঁর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা কোনও সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। এমনকি ১৮৫০-এর পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী'তে এর বিরুদ্ধে একটি লাইনও ব্যয়িত হয়নি।

আমাদের আলোচ্য পর্বের অব্যবহিত পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' ৭.৪.১২৫৪ ও ১১.৪.১২৫৪ তারিখে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দু'টি লেখা বের হয়। 'ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড'-এর খসড়া প্রস্তুত করার সময় আইনবিভাগীয় বিশেষজ্ঞরা প্রথম ১৮৪৬-এ বয়সের ভিত্তিতে সহবাস সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারি করার কথা ভেবেছিলেন।[১৯] তবে বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের পূর্বে বিষয়টি নিয়ে সমাজে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি, যদিও বিদ্যাসাগর এর পথিকৃৎ নন।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এ। ঐ ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর পত্রিকাটিতে 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও পরে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে এ কুপ্রথার প্রতি সকলের দৃষ্টি

১৫. "আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥"
—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'ভারতচন্দ্র' (সং ১৯৭৪), পৃ. ১৯৫

১৬. Kalikinkar Datta, 'Renaissance, Nationalism and Social changes in modern India', p. 115

১৭. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'কবি মধুসূদন দত্ত ও তাঁর পত্রাবলী', পত্রসংখ্যা - ২১

১৮. 'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৬

১৯. N. Natarajan, 'Hundred years of Indian Social Reform', p. 72

আকর্ষণ করলেন। প্রবন্ধ রচয়িতার নাম না থাকলেও এটি যে বিদ্যাসাগরের লেখা তা তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

বাল্যবিবাহের যে সমস্ত দোষের কথা বিদ্যাসাগর বলেছিলেন তার মধ্যে পাঁচটি[২০] বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ক) বাল্যবিবাহ আমাদের দৈহিক দুর্বলতার কারণ ; অপক্ক বীর্য নিষেকাদি বিভিন্ন কারণে দুর্বলতা। খ) বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত না হলে স্ত্রীশিক্ষা হবে না, ফলে জনশিক্ষাও হবে না। গ) পুরুষপক্ষে উপার্জন ক্ষমতার আগেই বিবাহ ঘটায় অর্থসঙ্কট এবং পরমুখাপেক্ষা বাড়ে। ঘ) দুষ্প্রবণতা, যা বিদ্যারত হলে জাগা সম্ভব নয়। ঙ) মানুষের মৃত্যু সম্ভাবনা ১ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বেশি। এর মধ্যে পুরুষেরা বিবাহ করলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি ছাড়া স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে বিবাহ ব্যবস্থা স্থাপনের কথাও বলেছিলেন।

বাল্যবিবাহের এসব ত্রুটির কথা চিন্তা করেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের আশপাশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও প্রচার চালাতে থাকেন। এ ব্যাপারে তখন তিনি আইন পাসই যথেষ্ট বিবেচনা করেননি, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তিবিধান এবং যদি এর জন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে কেউ অনর্থক চিৎকার করে, তাহলে শাস্ত্র থেকে এর সমর্থন জোগাড় করে আইন পাস করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

বিদ্যাসাগরের তাগিদে শেষপর্যন্ত ১৮৬০-এ আইনের মাধ্যমে মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করে 'ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে' 'এজ অব কনসেন্ট অ্যাক্ট' প্রবিষ্ট করানো হয়। তবে সে সময়ে এ নিয়ে কোনও আপত্তি ওঠেনি। যেহেতু বিবাহের এ বয়স-সীমা 'ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত'। আইনটি তাই শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ না করে বরং শাস্ত্রীয় বিধি কতকটা সুরক্ষিত করেছে—শতাব্দীর শেষে যখন বিষয়টি নিয়ে ওলটপালট কাণ্ড ঘটেছে তখন সকলে একবাক্যে তা স্বীকার করেছেন।[২১]

বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের পর এ ব্যাপারে সংস্কারকরা দীর্ঘদিন আর কোনওরূপ আগ্রহ দেখাননি। সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, এ সময় সংস্কারকরা বিধবাবিবাহ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বাল্যবিবাহ নিয়ে চিন্তা করার মতো সময়, সুযোগ ও ইচ্ছা কোনওটিই তাঁদের ছিল না।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৭০-এর শেষের দিকে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন এবং সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৭১-এ কলকাতায় 'দি ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসংস্কার সভা' গঠন করেন। এ সভার অন্যতম কর্মসূচি স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন। 'ভারতসংস্কার সভা' বা 'দি ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোশিয়েশন'-এর সভাপতি হিসাবে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১-এর এপ্রিলে মেয়েদের বিবাহের উচিত বয়স নির্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ চেয়ে ডাঃ স্মিথ এম-ডি.,

২০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', সমাজ, পৃ. ৩-১০

২১. "এই আইনের সহিত আমাদের শাস্ত্রের বিরোধ নাই বরং এই আইন থাকায় আমাদের শাস্ত্রীয়-বিধি সুরক্ষিত হইতেছে।"—শশধর তর্কচূড়ামণি, 'বেদব্যাস', মাঘ ১২৯৭

ডাঃ জে. ইযারট্ এম-ডি., ডাঃ ফেরার এম-ডি., ডাঃ চার্লস এম-ডি., ডাঃ এম. এল. শর্মা এম-ডি., ডাঃ নবীনকৃষ্ণ বসু, ডাঃ সূর্যকান্ত গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের কাছে আবেদনপত্র পাঠান।[২২] তাঁরা বলেন, ন্যূনতম উচিত বয়স ১৬। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য ১৮৭২-এ সরকার 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাস করেন। যাকে 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' বা 'তিন আইন' বলা হয়। এ আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় ১৪, ছেলেদের ১৮। আইনটিতে বাল্যবিবাহ ছাড়া বহুবিবাহ শাস্তিমূলক, বিধবাবিবাহ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অর্থাৎ 'সর্বদ্বারী বিবাহ' অনুমোদন করা হয়। আইনটি নিঃসন্দেহে ডেমোক্রেসির একটি পদক্ষেপ, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রথম স্বীকৃতি। বিশেষ করে 'অসমবিবাহ' অনুমোদন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয়। যে বয়স নির্ধারণে এতদিন শাস্ত্রের অনুশাসনই যথেষ্ট ছিল, এখন সেখানে যুক্তিতর্কের সমাবেশ হল। তবে ব্রাহ্মরাই মাত্র এ আইনের আওতায় পড়েন, ব্রাহ্মসমাজের বাইরে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ এ আইনের বাইরে পড়ে রইল।

যাই হোক 'তিন আইনে' বিবাহ বিল পাসের পর থেকে ব্রাহ্মদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। আইনটিতে স্পষ্টই বলা হল, "যারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, এবং খৃষ্টানও নয় শুধুমাত্র তাদের উপরই আইনটি প্রযোজ্য।" এতে স্পষ্টই বলা হল, ব্রাহ্মরা হিন্দু নন। বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেন বললেন, ব্রাহ্মরা হিন্দু পদবাচ্য নন। 'তিন আইন' অনুসারে বর্তমান রেজিস্ট্রি বিবাহের অনুরূপ পাত্রপাত্রীকে এক বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁরা এ আইনের আশ্রয় নিতে রাজি হলেন না, তাঁরা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হলেন, তখন থেকে কেশবপন্থীরা 'প্রগতিশীল ব্রাহ্ম' বলে পরিচিত হলেন এবং এঁদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম হল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'।

আইনটি দ্বারা হিন্দুসমাজের বাইরে যেতে পেরেছেন মনে করে কেশবপন্থীরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সহানুভূতিহীন ব্যঙ্গমুখর হিন্দুসমাজের সঙ্গে অসন্তুষ্ট অংশরূপে জুড়ে থাকার 'প্রকাশ্য অসচ্চরিত্রতা' থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা বেঁচেছেন। কেশবচন্দ্রের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছেদনাস্ত্র এই ব্রাহ্মবিবাহ আইনকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল, "আমরা সত্যই বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের সর্বগ্রাসী ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে বেঁচে গেল। এ হিন্দুধর্ম তার বিশ্বাসঘাতক সহিষ্ণুতায় ইতিমধ্যেই এদেশের অধিকাংশ আন্দোলনকে গ্রাস করে ফেলেছে।" শিবনাথ শাস্ত্রীও প্রথমে উল্লসিত হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য দুঃখ করে বলেছিলেন, "এইটিই ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের সহানুভূতি নাশের অন্যতম কারণ।"[২৩]

আদি ব্রাহ্মসমাজের সমর্থকদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে এঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ পদ্ধতি শাস্ত্রানুমোদিত নয়, তা প্রমাণ করার জন্য কাশীস্থ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের কাছে বিধান চান। বিধানও পাওয়া গেল কিন্তু কোনও লাভ হল না। বাপদেব শাস্ত্রী প্রমুখ

২২. দ্রঃ 'নব্যভারত', আষাঢ় ১২৯৩

২৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫

কাশীর ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ,[২৪] বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ বঙ্গদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ও নামকরা অধ্যাপকরা যে বিধান দেন, তাতে উভয় সমাজ সমর্থিত বিবাহ পদ্ধতিই শাস্ত্রসম্মত নয় বিবেচিত হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজও চুপ করে ছিল না। এ সমাজের অন্যতম সভ্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা?' (১৮৭৩) নামে একটি বই লেখেন এবং ভূমিকায় এঁদের সমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিই একমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত বলে কাশীর পণ্ডিতরা বিধান দিয়েছেন দাবি করেন।

কেশবপন্থীরা এরপর বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স আরও বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ১৮৭৭-এ কলকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সমাজ সংস্কার ব্যাপারে কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করেন। এতে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমপক্ষে ১৬ এবং ছেলেদের ২০ বছর করার চেষ্টা চালানো হবে বলে শপথ নেন। বিয়ের বয়স উত্তরোত্তর বাড়ানোর প্রস্তাবও সভাতে গ্রহণ করা হয়।

কলকাতাবাসী ব্রাহ্মদের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন শ্রীশচন্দ্র বসু, কৃষ্ণদয়াল রায়, অনাথবন্ধু রায় প্রমুখ মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম। এঁরা বললেন, এতে মফঃস্বলবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মরা মেয়ের বিয়ে দিতে অসুবিধায় পড়বেন। সুতরাং সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স বাড়ানোর চেষ্টা না করে বরং মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মদের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করলে সব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে।[২৫]

এর পরের ঘটনা সুপরিচিত কুচবিহার বিবাহ। পাত্রপাত্রী উভয়েই নাবালক। পাত্রী ১৮৭২-এ 'তিন আইন'-এর প্রধান উদ্যোক্তা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী, বয়স ১৩। পাত্র কোচবিহারের রাজা, বয়স ১৫। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর বক্তব্য অনুযায়ী বিবাহটি হয় সম্পূর্ণ হিন্দুমতে, কুচবিহারের রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে। কেশবপন্থীরা এ ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না। এর কারণ, পূর্বের 'তিন আইন' লঙ্ঘন করা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে অন্যান্য বিবাহে কঠোরভাবে পালন করা হয়েছে। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, রমাপ্রসাদ রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন স্থান থেকে স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে পত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের মতামত জানার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। আমরা এখানে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ ধরনের একটি পত্র উদ্ধৃত করছি।[২৬]

২৪. পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "আমি উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলাম। এই দুইয়ের যে কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমার মতে সিদ্ধ ও বৈধ নহে।"
--'তত্ত্বকৌমুদী', ১ শ্রাবণ, ১৮০১ শক

২৫. 'তত্ত্বকৌমুদী', ১ শ্রাবণ, ১৮০১ শক

২৬. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'কুচবিহারের রাজার সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদ', পৃ. ৪৩

"সবিনয় নিবেদনমিদং

আপনার কন্যার বিবাহ যেরূপ সুস্থিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আমরা কতিপয় পূর্ববাঙ্গলাস্থ ব্রাহ্ম যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কারণ এই যে, ইহা বাল্যবিবাহ এবং ইহাতে পৌত্তলিকতার সংস্রব থাকার নিতান্ত আশঙ্কা আছে। এইরূপ বিবাহ ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শানুসারে কখনই হইতে পারে না। আমরা কোন প্রকারে এই বিবাহ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। আমাদের অন্তরে এতন্নিবন্ধন যে কি ভয়ানক আঘাত পড়িয়াছে তাহা পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করা সাধ্যাতীত।

ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে আপনি এই কার্য্য করিতে বিরত থাকেন, এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

যাই হোক যদি আপনি ইহাকে ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত মনে করেন তবে যে যে কারণে ঐরূপ মনে করেন তাহা একখানি পত্র দ্বারা আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়
কালীনারায়ণ গুপ্ত
রমাপ্রসাদ সেন
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ
ঢাকার ১২জন প্রকাশ্য ব্রাহ্মদ্বারা স্বাক্ষরিত পত্র।"

কেশব-বিরোধীদের বক্তব্য, কেশবচন্দ্র এসব কথায় কর্ণপাত না করে গোপনে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে ফেলেন। অথচ ইনি পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সমাজ সংস্কার করার প্রস্তাব করলে 'সত্য প্রতিপালন করিতেই হইবে' দৃঢ়তার সঙ্গে তা জানান এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সেই কেশবচন্দ্রই সামান্য সাংসারিক সুখ, সম্মান ও সমৃদ্ধির জন্য 'মহাপাপকর বাল্যবিবাহ' ও 'ব্রাহ্মবিবাহের উচ্চতর আদর্শ' বিস্মৃত হচ্ছেন। তাই 'তিন আইন' লঙ্ঘন করার প্রতিবাদে কেশব-বিরোধীরা প্রতিবাদে মুখর। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় প্রমুখ যাঁরা কেশবচন্দ্র সেনকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য পরে আলোচনা করছি।

প্রতিবাদকারীরা ১২.২.১৮৭৮ তারিখে 'সমালোচক' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ও ২৩.৩.১৮৭৮ তারিখে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করলেন। একাধিক পুস্তিকাতে ক্ষোভপ্রকাশও করা হল। 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?' (১৮৭৮) নামে এ ধরনের একটি পুস্তিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী বিবাহটি সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের দু'টি ক্ষোভের কথা বললেন : ১) বাল্যবিবাহ দোষ, ২) পৌত্তলিকতা দোষ।

কেশবচন্দ্র সেনের সমর্থক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়) এ দু'টি অস্বীকার করেন এবং বিবাহটি নির্দোষ হয়েছে দাবি করেন। এতে রসিকতা করে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লিখিত পুস্তিকায় লেখেন,

"বিবাহটি নির্দোষ হইয়াছে তবে কিনা, বরের বয়স ১৫, কন্যার ১৩। তবে কিনা কেশববাবু জাতিভ্রষ্ট বলিয়া সম্প্রদান করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্ম পুরোহিত পৌরোহিত্য করিতে পান নাই। তবে কিনা বিবাহের পূর্বে কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল এবং

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নান্দীমুখ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রীতিতে হইয়াছিল......।" পরিশেষে লেখক বলেন, "যদি কাহারও ইচ্ছা হয় ইহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলুন। আমি বলিতে পারি না।"[২৭]

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে 'কুচবিহারের রাজার সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদ' নামে অনুরূপ একটি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির প্রথমে 'ব্রাহ্ম রাজলক্ষ্মীর রোদন' শিরোনামে কবিতায় লেখেন,

"অগ্নিবৃষ্টি করি মুখে যে কেশব মহাসুখে
রাজবিধি করিল প্রচার ;
* * *
আনি সবে আশা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র তেয়াগিয়ে
সেনাপতি নিজে পালাইল।"

কেশবচন্দ্র সেন প্রচারিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এই বিবাহকে সর্বপ্রকারে প্রশংসা করেও "পাত্র পাত্রীর আর একটু বয়স হইয়া বিবাহ হইলে খুব ভাল হইত" যেন নিতান্ত ঠেকে স্বীকার করেছেন। 'সুলভ' প্রতিবাদে পিছিয়ে রইল না। এ দুটি পত্রিকাই পূর্বোক্ত 'ভারতসংস্কার সভার' মুখপত্রস্বরূপ। উভয় পত্রিকাই পূর্বে একযোগে নবগোপাল মিত্রের কন্যার বাল্যবিবাহ এবং সারদাচরণ কাস্তগিরির কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কটূক্তি, নিন্দা ও উপহাস করতে ত্রুটি করেনি। যদিও কাস্তগিরির কন্যার বিবাহে 'বাল্যবিবাহ দোষ' মোটেই ছিল না। এখানে এ দোষটি বর্তমান থাকায় 'ব্রাহ্মবিবাহ' তো নয়ই, এমনকী 'বিবাহ' শব্দেও অভিহিত হতে পারে না।

কেশবচন্দ্র সেনের এরূপ কাজে অনুগামী ব্রাহ্মদের মনে কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা 'সমালোচকের'[২৮] মুখে শোনা যাক,

"কেশব সেনের এরূপ ব্যবহারে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মুখ মলিন। এমন কি কুলের কামিনী, স্কুলের ছাত্র, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আদালতের উকিল, বাজারের বণিক, সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মই শোক, ক্ষোভ, বিরাগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ইহার কারণ কি? কেশববাবু রাজার শ্বশুর হন দেখিয়া কি ব্রাহ্মগণ হিংসান্বিত হইয়াছেন। অথবা তাঁহার পদবৃদ্ধি দেখিয়া আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেছেন? যদি কেহ এরূপ বলিতে চান বলুন, কিন্তু আমরা বলিতেছি এ কার্য্যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের প্রাণে বড় লাগিয়াছে।"

এতে ব্রাহ্মদের মধ্যে আর এক পর্যায়ের ভাঙন শুরু হয়। তখন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ সেন প্রমুখ কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করেন এবং স্থায়ীভাবে সংস্কার আন্দোলন চালানোর জন্য 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

কেশবচন্দ্র সেনকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য, কেশবচন্দ্র সেন বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সমাজ প্রগতির স্বার্থেই বাল্যবিবাহ সমর্থন করেছেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। এছাড়া বিবাহে 'পৌত্তলিকতা দোষ' ও 'ব্রাহ্মবিবাহের নিয়ম' লঙ্ঘনে

২৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?' (১৮৭৮), পৃ. ৫-২২
২৮. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'কুচবিহারের রাজার সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তা অস্বীকার করেন এবং বলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় দুর্গামোহন দাস, কোচবিহারের দেওয়ান প্রমুখ ষড়যন্ত্র করেই এত সব প্রচার করেছেন। এমনকি অনুগামী ব্রাহ্মদের পত্রের উত্তরদানেও কেশবচন্দ্র পরাঙ্মুখ ছিলেন একথাও এঁরা অস্বীকার করেন।[২৯] কেশবচন্দ্রের সমর্থকরা তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ ২৫ বছর পরও তাঁর সমকালীন কার্যকলাপের সমর্থনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরেন। 'ধর্মতত্ত্বে'[৩০] প্রকাশিত একটি লেখাতে জানা যায়,

"....রাজা পরে বহুবিবাহ করতে পারেন এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করে এক পত্রে লেখেন, 'আপনি ধর্ম্মসংস্কারক আমরা কুচবিহারের রাজাকে যথাসাধ্য সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার পারিবারিক সামাজিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি আপনার কন্যার বিবাহ দেন তাহা হইলে রাজ্যের কল্যাণ হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের অভিভাবক হিসাবে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী (যিনি বিবাহের ঘটক) কেশবচন্দ্র সেনের কাছে এ প্রস্তাব করলে তিনি দু'বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এতে বাল্যবিবাহ দোষ ও পৌত্তলিকতা দোষ ঘটিবে অর্থাৎ 'তিন আইন' লঙ্ঘন করা হবে। গভর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষ যা বক্তব্য রাখেন তা হল এই যে, 'তিন আইন' কেবল ব্রিটিশ রাজ্যেই প্রযোজ্য, কুচবিহার রাজ্যে নয়। এছাড়া বিবাহটি সমর্থন করলে একাধারে জাতিভেদ প্রথা, কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথা পদদলিত হবে, অনগ্রসর কোচজাতির মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং রাজ্যে নবজাগরণ ও উন্নতির সম্ভাবনা। সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন শেষপর্যন্ত সমাজ প্রগতির স্বার্থেই বিবাহে পৌত্তলিকতা বর্জন ও সম্পূর্ণ ব্রাহ্মমতে বাগ্‌দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার শর্তে সম্মত হন এবং দেওয়ানের সমস্ত চক্রান্ত (যার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল) ব্যর্থ করে সম্পূর্ণ অপৌত্তলিকভাবে ব্রাহ্ম পুরোহিত দিয়ে ১৮৭৮-এর ৬ মার্চ বাগ্‌দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পরের দিন সকালেই মহারাজ বিলাত যান, কেশবচন্দ্রও কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন এবং দু'বছর পর ১৮৮০ সালের ২০ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।"

প্রত্যক্ষদর্শী মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন (যিনি প্রথম রামকৃষ্ণের জীবনী লেখেন এবং কোরানের অপূর্ব অনুবাদের জন্য যাঁকে মুসলিম ভাইরা মৌলানা আখ্যা দেন) বলেন, "কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর বাগ্‌দান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণ ব্রাহ্মমতে

২৯. প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর 'স্মৃতিলিপি'তে লিখেছেন, "কোচবিহার বিবাহ প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মরা প্রতিবাদ জানিয়ে যে সমস্ত পত্র দিয়েছিলেন—সেগুলি পাঠ করা ও পত্রোত্তরে এর কারণ জানিয়ে দেওয়ার ভার ছিল তাঁর উপর, অবশ্য যদি কেহ জানতে চান। আর যাঁরা জানতে না চেয়ে এ বিষয়ে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের উত্তরদানও নিষেধ ছিল। একমাত্র বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথমত প্রতিবাদ না করে জিজ্ঞাসু হয়ে পত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু সে পত্র তাঁর হাতে আসেনি।"
—দ্রঃ গিরিশচন্দ্র সেন, 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (স্মৃতিলিপি)

৩০. 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১ পৌষ ১৩৪৬

ও অপৌত্তলিক ভাবে। তৎকালীন সরকারি রিপোর্ট[৩১] ও পরিণত বয়সে সুনীতি দেবীর এ বিষয়ে লেখাতে[৩২] এর সমর্থন রয়েছে। সুনীতি দেবীর বক্তব্য অনুযায়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তিগত কারণে এবং কুচবিহারের দেওয়ান (যিনি ব্যক্তিগত কারণে কেশবচন্দ্র সেনের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন) কর্তৃক পরিবেশিত ভুল সংবাদের ভিত্তিতেই কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসা রটিয়েছেন। বর্ধমানের ভূতপূর্ব সরকারি ইনস্পেক্টর মতিলাল দাস মহাশয় বলেন, "মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিংসা দ্বেষের বশবর্তী হইয়া যে না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই, কুচবিহার বিবাহ নিবন্ধন আন্দোলন তাহার সাক্ষী।"

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ প্রশান্তকুমার সেনও কেশবচন্দ্র সেনের কাজকে বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন।[৩৩]

দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বলেন, "কেশবচন্দ্র এ বিবাহে যে কেবল পিতৃধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু কুচবিহারের ন্যায় রক্ষণশীল দেশে সত্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়া মঙ্গলসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।"[৩৪]

শুধু প্রাচ্য কেন, রানি ভিক্টোরিয়া, লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্য জগতের বহু খ্যাতমানা ব্যক্তি, এমনকি লণ্ডনের সুপরিচিত একেশ্বরবাদী ভয়েসী সাহেব, যিনি সাধারণত কেশবচন্দ্র সেনের সব কথাতে সায় দিতেন না এবং প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না, তিনিও বহুবিতর্কিত এই বাগ্‌দান অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন, "পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি তাঁহার বর্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দুরভিসন্ধি দোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্যের বিষয়।" তাঁর বক্তব্য, "আচার্য মহাশয় এই বিবাহ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল যে মহৎ এবং ধর্ম্মসম্মত তাহা নহে, কিন্তু উহা অনিবার্য্য এবং অবশ্য কর্তব্য।"[৩৫] (ইংরেজির অনুবাদ)

সভ্যজগতে সুপরিচিত পাশ্চাত্য জগতের চিহ্নিত প্রতিনিধি মিস্ কবও কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর ২৫ বছর পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'East and West' পত্রিকায় কুচবিহার বিবাহের সমর্থনে একটি পত্র লেখেন, পরে পত্রটি বোম্বাই নগরীর 'সুবোধ' পত্রিকায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়।[৩৬]

৩১. "The ordinary Hindu ceremony was modified so as to meet the wishes of Babu Keshab Chandra Sen, but the fact that Brahmin consented to perform it shows that the marriage was recognized by the Hindoo as orthodox."

–'Administration Report of Bengal' (1877-78)

৩২. Prosanta Kr. Sen, 'Biography of a new Faith', Vol. II, 1954, p. 186

৩৩. Ibid., p. 182

৩৪. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'সাহিত্যস্রোত', ১ম ভাগ (১৯৩২), পৃ. ২৭০

৩৫. মতিলাল দাস, 'কেশবকাহিনী', পৃ. ১৩৩
(বর্ধমান বিভাগের ভূতপূর্ব সরকারি ইনস্পেক্টর)

৩৬. 'Subodh Patrika', Bombay, September 1903

বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় গোষ্ঠী কম-বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। তবে ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ এই দীর্ঘ ১০ বৎসর বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য লেখা আমাদের চোখে পড়ে না। এর কারণ সম্ভবত এ সময়ে সংস্কারকরা বহুবিবাহ নিয়ে মেতে ওঠেন, কাজেই বাল্যবিবাহ নিয়ে কোনও মাথা ঘামাতে পারেননি। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে পত্রপত্রিকাগুলি বাল্যবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকে, যেহেতু এ সময়ে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা বাল্যবিবাহ বন্ধ না হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে পত্রপত্রিকায় একাধিক লেখা বের হল। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেননি, বাল্যবিবাহকে টিকিয়ে রাখতে নীতিগতভাবে তাঁদের কোনও বাধা ছিল না। কাজেই মতামত প্রকাশের জন্য বাল্যবিবাহের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদী উভয় গোষ্ঠীই পত্রিকার আশ্রয় নিলেন। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সে সময়ে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল সেগুলি হল, 'সোমপ্রকাশ', 'আর্যদর্শন', 'নবজীবন', 'নব্যভারত', 'মিত্রপ্রকাশ', 'ভারতী', 'ভারত সংস্কারক', 'বঙ্গমহিলা', 'সুবোধিনী', 'ভারতী ও বালক', 'ধর্মতত্ত্ব', 'অনুসন্ধান', 'বঙ্গবাসী', 'জন্মভূমি', 'বেদব্যাস' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকা ছাড়া একাধিক ইংরেজি পত্রিকা।

বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে সত্তরের দশকে 'মিত্রপ্রকাশ'[৩৭] দীর্ঘ বক্তব্য রাখে, যা বিদ্যাসাগরেরই অনুরূপ। শুধু 'মিত্রপ্রকাশ' কেন, বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে যাঁরা সে সময় পত্রপত্রিকায় বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁরা কেউ এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাই এঁদের বক্তব্য পৃথকভাবে আলোচনা না করে যাঁরা সে সময় বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য শোনা যাক। বাল্যবিবাহের সমর্থনে 'ভারতী' ফাল্গুন, ১২৯১-এ প্রকাশিত রসিকলাল সেনের প্রবন্ধটি প্রথম আলোচনা করা যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে লেখক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচলিত যুক্তিগুলির যে উত্তর দিয়েছেন সংক্ষেপে তা হল এই যে,

১) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, পতি-পত্নী নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকে না। এর উত্তরে লেখক বলেন, বৃদ্ধ বয়সেই এই বোধ জন্মে ; তার পূর্বে নয়।

২) দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, কর্তব্য বুঝতে পারে না। লেখক মনে করেন, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে থাকায় উভয়ে উভয়ের চরিত্র সম্যকভাবে বুঝতে পারে, অতএব কর্তব্যবোধ সহজ হয়।

৩) তৃতীয় অভিযোগ হল, বাল্যবিবাহে শরীর ও মন দুর্বল হয়ে পড়ে। লেখক বলেন, দোষটা বাল্যবিবাহের নয়, অভিভাবকের। বাল্যবিবাহ উঠিয়ে দিলেও রুগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং এ ব্যাপারে আমাদের দেশের ফল ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ অপেক্ষা ভালই।

৪) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ, জ্ঞানার্জনে ব্যাঘাত হয়। লেখক বলেন, এটা সব সময় ঠিক নয়। অনেক সময়ে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য লেখাপড়া শেখা সম্ভব না হলেও, বিয়ের পর শ্বশুরের টাকায় অনেকে লেখাপড়া শেখে। যাঁরা একে স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় বলেছেন তাঁদের অভিযোগের বিরুদ্ধে লেখক বলেন, "মেয়েদের শিক্ষা যে

৩৭. 'মিত্রপ্রকাশ', ২৩ শ্রাবণ ১২৮১

একেবারে হয় না তা নয়, তবে আধুনিক প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা না হওয়াই ভাল।”

৫) পঞ্চম অভিযোগ হল, স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বিয়ে করায় ছোটবেলা থেকে গলগ্রহ ও পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে অক্ষম। উভয় অভিযোগের বিরুদ্ধে লেখকের বক্তব্য, অভিভাবকরা টাকাকড়ি রেখে গেলে কোনও অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ বলে যাঁরা একে দায়ী করেন তাঁদের লেখক বিধবাবিবাহ প্রচলন করে তা সমাধান করার পরামর্শ দেন।

বাল্যবিবাহ সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য লেখক মেয়েদের শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার পক্ষপাতিত্ব করেছেন, অথচ প্রয়োজনবোধে বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন। লেখকের এ উদারতার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য ছিল।

বাল্যবিবাহের সমর্থনে ৩০.৯.১২৯৪ তারিখে ‘অনুসন্ধান’ পত্রিকা লেখে,

“অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতি সভ্যতার রসা স্বাদনে উন্মত্ত হইয়া বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে অন্তত দুই একটি কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। বাল্যবিবাহ উচিত কিনা, আমরা এ প্রসঙ্গে সে কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব না। তবে উচিত হউক বা অনুচিত হউক, ইহা যে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ইহা উঠিয়া যাইলে যে হিন্দু সমাজকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহা হিন্দুসমাজের উচ্ছেদাভিলাষী পরম শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ অন্যান্য জাতির ন্যায় সুদ্ধ বর-কন্যার বিবাহ নহে। একটি অপরিচিত পরিবারের সহিত আর একটি পরিবারের মিলনই হিন্দুর বিবাহ।

যদি বিলাতি স্বয়ম্বর হিন্দুসমাজে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে জগতে সতীত্বের আদর্শ পবিত্র হিন্দু সমাজের কি অবস্থা হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন।”

বাল্যবিবাহের সমর্থনে লেখা পূর্বোক্ত রসিকলাল সেনের প্রবন্ধের বিরোধিতা করে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩-এ ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় ‘পঠদ্দশায় বিবাহ’ প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রসিকলালের ‘বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের যে শিক্ষা একেবারে হয় না তা নয়’ মন্তব্যের উত্তরে ব্যঙ্গ করে লেখক বলেন, “বাল্যবিবাহে যে কিছুই শিক্ষা হয় না, একথা বলিতে পারি না, মানুষ কত রকম যন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হয়, বাল্যবিবাহ হইতে সেই শিক্ষাটি বেশ ভালরকম পাওয়া যায়।”

এইভাবে বাল্যবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে মতবাদ ক্রমে পুষ্ট হয়ে শতাব্দীর শেষে পার্সী সংস্কারক মালাবারির হস্তক্ষেপে তা ব্যাপকতা লাভ করে।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনে পার্সী সংস্কারক মালাবারির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর হস্তক্ষেপে এই আন্দোলন বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেনের ‘তিন আইন’ মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে বিশাল হিন্দুসমাজ ছিল, তা নারীর ক্ষেত্রে সহবাসের ন্যূনতম বয়স ১০ বছরের পেনাল কোডে আটকে ছিল। ১৮৮৪-তে মালাবারি বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহের ওপর ‘নোট’ প্রকাশ করে চতুর্দিকে একেবারে হইচই ফেললেন, ঝড় উঠল সারা ভারতে। মালাবারির লেখায় কিছুটা অতিরঞ্জন ছিল একথা উল্লেখ করার পর ড. হিমসাথ বলেছেন, তাহলেও এ রচনা যে ঝড় তুলেছিল তাতে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সর্বভারতীয় সচেতনতা দেখা গেল এবং এই প্রথম সংস্কার আন্দোলন যথার্থ সর্বভারতীয়

আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠল। তবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মালাবারি যে বক্তব্য রেখেছিলেন[৩৮] তা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের অনুরূপ। চল্লিশ বছর পরও সংস্কারকরা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যগুলিই অনুসরণ করেছেন, মালাবারির বক্তব্য তার প্রমাণ।

মালাবারি ভারতের নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কাজে ইংরেজ শাসকদের নড়াতে না পেরে ইংল্যাণ্ডে যান সেখানকার জনগণের সমর্থন আদায় করতে, সেইসঙ্গে মূল শাসকদের প্রভাবিত করতে। এদিকে তাঁর জীবনীকার ও সহকর্মী দয়ারাম গিদ্‌মল একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে মেয়েদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স ১২ বছর প্রস্তাব করে 'এজ অব কনসেন্ট অ্যাক্ট' পাশ করার আবেদন করেন। হরি মাইতির অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী ফুলমণির সহবাসজনিত দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদও এ সময়ে সরকারের কর্ণগোচর হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সরকার তাই যখন সমাজের স্বার্থে গিদ্‌মলের প্রস্তাব বিবেচনা করে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১২ বছর নির্দিষ্ট করে আইন পাস করার মনোভাব দেখালেন, তখন দেশের বৃহৎ অংশে গেল-গেল রব পড়ে গেল।

১৮৯০-এর শেষের দিকে এ ব্যাপারে ওলটপালট আন্দোলন। কল্পনাতীত চেঁচামেচি সর্বত্র। সবচেয়ে বেশি আর্তনাদ বাংলাদেশে।[৩৯] শাস্ত্রমতে শরীর দর্শন রচনা করতে লাগলেন বাঙালি পণ্ডিতরা। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন নারীর ঋতুকালের আগে বিয়ে না দিলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে, বিয়ের আগে যদি ঋতুকাল এসে পড়ে তাহলে তা গর্ভপাত ঘটানোর মতোই দুষ্কার্য হবে ; যার পাপ কোনও না কোনও নরহত্যা পাপের চেয়ে বেশি, এবং বাল্যবিবাহে শরীর দুর্বল হয় হোক গে, হিন্দু ইহকাল নিয়ে নয়, পরকাল নিয়েই ব্যস্ত ; এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিল 'বঙ্গবাসী', রাজদ্রোহের অভিযোগে শাস্তি পেলও।[৪০] 'অমৃতবাজার' প্রতিবাদে পিছিয়ে রইল না। ১৭.১.১৮৯১ তারিখে 'Indian Mirror' থেকে জানা যায় 'The Sakti of Dacca' সম্মতি আইনের বিরোধিতা করেছিল। তবু সরকার বিলটি নিয়ে এগিয়ে গেলেন, কারণ ইতিমধ্যে লণ্ডনের সংবাদপত্র ও জনমত এ ব্যাপারে চাপ দিতে শুরু করেছে ; ভারতীয় জনমতও এগিয়ে এসেছে নির্দিষ্ট ভাবে।

এতদিন পর্যন্ত সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মরা নেতৃত্ব দিলেও, ব্রাহ্ম নন এমন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সহবাস আন্দোলনে তাঁরা ব্রাহ্মদের সমর্থন করেননি। এর মূল কারণ পূর্বোক্ত 'তিন আইন পাস' (১৮৭২), যাতে স্পষ্টই বলা হল ব্রাহ্মরা হিন্দু নন। যা শিবনাথ শাস্ত্রী পূর্বে "ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের সহানুভূতি-নাশের অন্যতম কারণ" বিবেচনা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে গ্রন্থ, যাতে অজ্ঞাত কারণেই হিন্দুবিরোধী মনোভাবের পরিচয় রয়েছে বলে আধুনিক ঐতিহাসিক ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন।[৪১] সমসাময়িক ও প্রাচীনযুগে যে সমস্ত উপাসক নিজেদের হিন্দু বলতেন এবং

৩৮. B. M. Malabari, 'Child Marriage and enforced widowhood', pp. 1-105

৩৯. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬৬

৪০. Buckland, C. H. 'Bengal under the Lieutanant Governors', Vol. II, 2nd. Ed., p. 917

৪১. ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', পৃ. ১১৭

হিন্দুরা যাদের শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হয় গ্রন্থটিতে (যদিও সব সময় অকারণ নয়)। এতে সনাতনপন্থী হিন্দুরা আঘাত পান। হিন্দুরা তাই ব্রাহ্মসমর্থিত 'সহবাস সম্মতি' বিলটির বিরোধিতা করলেন। সগৌরবে হিন্দুধর্মের ধ্বজা নিয়ে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (ভট্টাচার্য)। সহবাস সম্মতি আন্দোলনে বাংলাদেশে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক। অথচ যা এতদিন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আলোচ্য অংশে তার প্রতি রেখাপাত করব।

সহবাস আন্দোলনে শশধর তর্কচূড়ামণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সমকালীন একটি পত্রিকা লেখে,[৪২] "পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বন্যার সম্মুখে যেদিন শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী গৌরকায় তীক্ষ্ননাসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শশধর আসিয়া দাঁড়াইলেন সে দিন কলকাতা শহরে তরঙ্গ উঠিয়াছিল।"

চূড়ামণি মহাশয় কলকাতায় প্রকাণ্ড সভায় প্রবল রাজশক্তির অণুমাত্রও ভয় না করে আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর ধর্মবক্তৃতা সর্বত্র আলোড়ন এনেছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, পণ্ডিত মহাশয়ের দৈহিক আকৃতি ও বাচনভঙ্গি কোনওটিই আকর্ষণীয় ছিল না, এমনকী তাঁর বক্তব্য বিষয়ও স্পষ্ট নয়। অথচ অফিসের ছুটির পর কর্মক্লান্ত ব্যক্তিরা ঝড় জল উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুনত। পণ্ডিত মহাশয় প্রবল রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে ও শহরের অলিতে গলিতে সভা করে সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে ও পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশ করে বিলটির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য, আইনটি পাস হলে 'গর্ভাধান সংস্কারের'[৪৩] পরিপন্থী হবে, কেননা আইনের শর্তানুসারে ১২ বছরের পূর্বে স্ত্রী ঋতুমতী হলেও গর্ভাধান সংস্কার পালন করা যাবে না, অথচ স্ত্রীর প্রথম রজঃদর্শনেই যা করণীয়। যা একান্তই শাস্ত্রসম্মত এবং যা ভাবী সন্তানের মঙ্গলকামনায় হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। তিনি জোর গলায় বললেন,

"এই গর্ভাধানক্রিয়া হিন্দুর কোন অভিনব আচার নহে, ইহা অতীব প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। যে দিন বেদ চতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছে সেইদিন হইতে অদ্য পর্যন্ত বরাবর ইহা প্রচলিত। গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত, চতুর্যুগ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত প্রবাহে ইহা চলিয়া আসিতেছে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান স্মৃতিসংগ্রহ পর্যন্ত সূত্র সংহিতা পুরাণাদি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই এই গর্ভাধান সংস্কারের বিশেষ সমাদর।......অতএব গর্ভাধান করা আমাদের সনাতনধর্ম। হিন্দুসমাজে বর্তমানে এর বতিক্রম লক্ষ্য করা হলেও বর্তমান সময়েও যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু তাঁহারা প্রত্যেকেই

৪২. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ', 'ব্রাহ্মণ সমাজ', ফাল্গুন ১৩৩৪

৪৩. গর্ভাধান সংস্কার—

"উদরস্থ সন্তানের নাম গর্ভ, আর উৎপাদনের নাম আধান। রজ উদ্‌গম হইলে যথাবিধ প্রথমবার সন্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করার নাম 'গর্ভাধান'। গর্ভাধানের সমস্ত বিধি বিধানাদি হইতে এই অর্থই প্রকাশিত হয়। হিন্দুগণও এই অর্থেই 'গর্ভাধান' কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং গর্ভাধান কথা শুনিলে এই অর্থই বুঝিয়া থাকেন।"—শশধর শর্ম্মা, 'বেদব্যাস', মাঘ ১২৯৭

গর্ভাধান অবশ্য পালনীয় বিচার করেন। কিন্তু আজকাল ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু নহেন, প্রকৃত হিন্দুগণ যাঁহাদিগকে অপবিত্র হিন্দু বা পতিত হিন্দু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অন্যান্য সৎ কার্য্যের ন্যায় ইহাও না করারই সম্ভব। তৎপর খৃষ্টিয়ান মুসলমানের মধ্যেও যেমন সকলেই তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করে না, তেমন এই কোটী কোটী হিন্দুর মধ্যে যে অধার্ম্মিক এবং শাস্ত্রাজ্ঞায় প্রতিকূলবর্ত্তী লোক থাকিবে ইহা নিতান্তই সম্ভবপর।"

চূড়ামণি মহাশয়ের স্পষ্ট কথা, বাল্যবিবাহ দোষ নহে, দোষ শাস্ত্র না মানা। কাজেই এ ব্যাপারে বয়সের গুরুত্ব না দিয়ে বরং মাতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তাহলে বাল্যবিবাহজনিত দুর্ঘটনাও দূর হবে এবং শাস্ত্রসম্মত গর্ভাধান সংস্কার পালন করারও কোনও বাধা থাকবে না; শুধু তাই বা কেন? তিনি জানালেন হিন্দুর জীবন সংস্কারময়। শাস্ত্রে বিহিত ১০টি সংস্কারের মধ্যে প্রথম সংস্কারই 'গর্ভাধান'। এই 'গর্ভাধান' সংস্কারকে বাদ দিলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংস্কারও অর্থহীন হয়ে পড়বে। এতে হিন্দুধর্মের চরম সর্বনাশ হবে। হিন্দুর সেই চিরাচরিত পূজনীয় ধর্মের প্রতি গুরুতর আঘাত হবে, হিন্দুর মস্তকে বজ্রাঘাত করা হবে, হিন্দুর হৃদয়ে শূলবিদ্ধ হবে। "প্রকৃত হিন্দুগণ আজও পুত্র, কলত্র, যশ ও নাম, রাজ্য ঐশ্বর্য অপেক্ষা ধর্মকেই অধিকতর ভালবাসিয়া থাকেন। আজও কতশত হিন্দু, প্রাণপ্রিয় তনয় তনয়া, ব্রাহ্ম মুসলমানাদি হইয়া ধর্মচ্যুত হইলে, তাহাদিগকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম লইয়া অবস্থিতি করেন, আজও অনেক হিন্দু লক্ষ লক্ষ টাকার বিভব ঐশ্বর্য্য তৃণজ্ঞানে বিসর্জন করিয়া ধর্মের নিমিত্ত উদাসীন হইয়া থাকেন, সুতরাং সেই প্রিয় বন্ধু ধর্মের মস্তকে আঘাত করিলে হিন্দু পুত্রশোকাপেক্ষায়, স্ত্রী শোকাপেক্ষায়ও অধিকতর পরিতপ্ত হইবে। রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি সর্বনাশ অপেক্ষাও প্রপীড়িত হইবে। অতএব আমরা করপুটে সবিনয়ে কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, মহামান্য গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম রক্ষা করুন।"[৪৪] শুধু বাংলা পত্রিকা নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলিতেও[৪৫] তাঁর বক্তব্য সাড়ম্বরে ছাপানো হত।

চূড়ামণি মহাশয় তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পর্যালোচনা করে নিজের কথা এমনভাবে বললেন, যাতে শিক্ষিতমণ্ডলীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। হিন্দুর বিভিন্ন লৌকিক আচারের বিজ্ঞানসম্মত[৪৬] ব্যাখ্যা দিলেন 'ধর্মব্যাখ্যা' নামক একটি পুস্তক লিখে। তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটি সম্পূর্ণ কল্পিত হলেও সমকালীন শিক্ষিত মণ্ডলীতে যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। একদল প্রকাশ্যভাবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, দু-একজন ততটা না করলেও তাঁর কথার সার অংশ গ্রহণ করে তা নিজ সিদ্ধান্ত রূপে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ দলের। তাঁর কল্পিত 'ধর্মব্যাখ্যা' অনেক হিন্দুকে

৪৪. শশধর শর্ম্মা 'বেদব্যাস', ফাল্গুন ১২৯৭

৪৫. Sasadhur Tarkachuramoni, 'Indian Nation', 12 January, 1891

৪৬. ক) শশধর তর্কচূড়ামণি, 'ধর্মব্যাখ্যা' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

খ) 'ব্রাহ্মণ সমাজ', ফাল্গুন ১৩০৪

অধঃপতনের হাত থেকে পরিত্রাণ করেছে, এমন মন্তব্যও[৪৭] কেউ কেউ করেছেন। তাঁর তর্কবলে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ সে যুগের সেরা মনীষীগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এঁরা অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন ও পণ্ডিতমহাশয়ের 'ধর্মব্যাখ্যা'র কঠোর সমালোচনা করেন। নামী নন এমন পণ্ডিতরাও তাঁর কল্পিত ধর্মব্যাখ্যার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করে একাধিক পুস্তিকা লেখেন। পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশের 'শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা সমালোচনা' (১২৯১) পুস্তিকাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শশধর প্রণীত ধর্মব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটিতে তিনি একটি মজার গল্প লেখেন। অপ্রয়োজন বোধে উদ্ধৃতির প্রলোভন ত্যাগ করছি।

সমালোচনা যতই তীব্র হোক না কেন, পণ্ডিত মহাশয় এক সময় বক্তৃতার জোরে সারা দেশ গরম করে তুলেছিলেন, তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। 'বঙ্গবাসী', 'অনুসন্ধান', 'বেদব্যাস', 'জন্মভূমি' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকায় ; 'অমৃতবাজার', 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত', 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান', 'ইণ্ডিয়ান নেশন' ইত্যাদি ইংরেজি পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতা ছাপানো হত। অল্পদিনের মধ্যে এসব পত্রিকার চাহিদাও হু হু করে বেড়ে চলে। দুঃখের বিষয়, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মূল ফাইলের চিহ্ন বর্তমানে নেই, তবে 'অনুসন্ধান', 'জন্মভূমি', 'বেদব্যাস' ইত্যাদি পত্রিকার সাহায্যে সমকালীন জনমানসে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও আইনটি সম্বন্ধে দেশবাসীর তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

বিষয়টি সমকালীন জনমানসকে এরূপ আলোড়িত করেছিল যে, 'আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রদ করা যুক্তিযুক্ত কিনা?' কতিপয় স্বধর্মানুরাগী ব্যক্তিকে তা ভাবিয়ে তুলল। এঁরা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একাধিক পুস্তিকা লিখে স্ব স্ব মত প্রচার করলেন, সভাসমিতির মাধ্যমেও জোর জনমত গঠনের প্রয়াস চালালেন।

জয়গোবিন্দ সোম এ ধরনের একটি পুস্তিকায় বলেন,

"বিগত তিন হাজার বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না যে, এ প্রথা প্রচলিত থাকাতে ভারতবাসীর দৈহিক ও মানসিক কোন প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে ; বরং দেখা যায় যে, বাল্যবিবাহ দম্পতিদিগের মধ্যে চিরকালই অনুরাগ বৃদ্ধি ও ব্যভিচার দমন করিয়াছে।"[৪৮]

পরের মাসে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়[৪৯] ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জয়গোবিন্দ সোম, চন্দ্রনাথ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু,

৪৭. ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১
খ) 'আর্য অনার্য নাটক' ও 'হিং টিং ছট' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শশধর প্রণীত ধর্মব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন।
—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড (৪র্থ সং), পৃ. ৩২৪

৪৮. 'তত্ত্বকৌমুদী', ১ শ্রাবণ, ১৮০৯ শক

৪৯. 'তত্ত্বকৌমুদী', ১ ভাদ্র, ১৮০৯ শক

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন (বিরোধীদের কোনও বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি)।

প্রসিদ্ধ লেখক মনোমোহন বসু উক্ত সভায় বলেন, "হত্তু-কি খেগো বাকল পরা বুড়োরা যা করে গেছে, তার ভিতরে ভিতরে তাৎপর্য আছে ; খপ্ করে তা মন্দ বলা, আর তার বদল করা বড় ভুল। যে সব সংশোধন ও পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা আপনা, হতেই হবে।"

বর্ধমানের দাঁইহাট গ্রামে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভাতেও[৫০] শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সহস্রাধিক হিন্দু মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হলে হিন্দুধর্মে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে, সভ্যগণের সিদ্ধান্ত, সৎশিক্ষা ও সুনিয়মের দ্বারা সামাজিক কুসংস্কার দূর হবে, এজন্য আইনের প্রয়োজন নেই।

জনমানসে প্রস্তাবিত বিলটির ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পরিচয় প্রসঙ্গে ১৫.১০.১২৯৭ তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লেখে,

"সম্মতির বয়স লইয়া হিন্দু সমাজে বড় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুই এই বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন। এমন গ্রাম নাই বা এমন নগর নাই যে, যেখান হইতে ঐ বিলের সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে না। সকল হিন্দুই ধর্মহানির ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছেন। গভর্নমেণ্ট এ সকল দেখিয়াও যে বিল পাস করিতে অগ্রসর হইবেন, এরূপ তো মনে হয় না।"

মনে হোক বা না হোক, প্রস্তাবিত বিলটি যথাসময়ে পরিষদে উপস্থিত করা হয়। সরকারি পর্যায়ে আলোচনাকালে স্যার অ্যান্ড্রুস্ স্কোবল বিলটি সমর্থন করে বলেন, এ বিল পাস হলে,

১) নারীসমাজকে অপরিণতাবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে,

২) উপযুক্ত বয়সের পূর্বে সহবাস থেকে মেয়েদের রক্ষা করা যাবে।

উল্লিখিত দু'টি কারণে বিলটি সমর্থন করে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায়[৫১] বলেন, "আমি যদি হিন্দু হতাম তাহলে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, বিচারপতি তেলাং, দেওয়ান রঘুনাথ রাওয়ের সঙ্গে একত্রে ভুল করতে ইচ্ছা করতাম। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বা তিলকের সঙ্গে ঠিক করতে নয়...।" উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে এমন কথা বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

পক্ষে-বিপক্ষে সব কিছু শুনে ভাইসরয় বলেন, বিলটি পাস হলে নারীসমাজ উপকৃত হবে। তবে রক্ষণশীলরা যেহেতু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বিলটির বিরোধিতা করছেন, তাই এ ব্যাপারে তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমর্থন পাবেন। দেখা যাক ভাইসরয়ের এ আশা কতদূর পূরণ হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ আন্দোলনেরও প্রবর্তক। এক সময় আইন করে এ প্রথা রদ করার কথাও বলেছিলেন। বিলটি পাসের পূর্বে সরকারের তরফ থেকে তাই তাঁর মত

৫০. 'বেদব্যাস', ভাদ্র ১২৯৭

৫১. 'সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা' (অপ্রকাশিত), কলকাতা ১৮৯১

চাওয়া হয়। আইনের দ্বারা সামাজিক প্রথার পরিবর্তন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বিদ্যাসাগর কিন্তু আইন পাসের বিরুদ্ধেই মত দেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে ৫.২.১৮৯১ তারিখে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারিকে একটি পত্র দেন। পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

“......শাস্ত্রের ব্যাখ্যামতে প্রথম রজঃদর্শনের সময় গর্ভাধান সংস্কার আবশ্যক, কাজেই প্রস্তাবিত আইনটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে দ্বিতীয় উত্তর হইতেই পারে না। তবে বঙ্গদেশে এ প্রকার পরিবার সকলও বর্তমান আছে যাহাদের কুলাচার মতে, যে রজোদর্শনের ফলে শাস্ত্রাচার লক্ষণানুসারে গর্ভাধান সম্ভব ; তাঁহারা তখনই সংস্কারটি করাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বঙ্গদেশের জলবায়ুতে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেও সম্ভব।” তাই এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে,

“১) বয়সের উপর কোনও কড়াকড়ি না করিয়া ‘রজোদ্গমের পূর্ব্বে সহবাস দণ্ডণীয়’ এইরূপ আইন করা হউক। তাহাতে যাহাদের বার বৎসরের পরও রজোদর্শন হয় তাহারাও রক্ষিতা থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী হইবে।

২) যাহার উপর অত্যাচার করা হইবে সে বা তাহার নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্য কাহারও নালিশ গ্রাহ্য হইবে না।

যে সমাজে আপোষের বিবাদ অত্যন্ত অধিক তাহাতে এরূপ ব্যবস্থা রাখা একান্তই ’[৫২]

চট্টোপাধ্যায় বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কাছে ব্যক্তিগত একটি পত্রে[৫৩] বিলটি পাস সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট অমতের কথা জানান।

১৮৮৭-তে ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হিন্দুবিবাহ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহ প্রচলনের কারণস্বরূপ একান্নবর্তী পরিবারকেই দায়ী করেন। যে কারণেই হোক বর্তমানে তার ভাঙন ধরেছে, কাজেই বাল্যবিবাহও একই কারণে সমাজ থেকে বিনা প্রয়াসেই বিদায় নেবে। যাঁরা আইন করে, জবরদস্তি করে এ প্রথা ওঠাতে চান, তাঁরা এ প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করে নিয়ে দু-একটি ফলাফল মাত্র বিচার করেছেন, হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের আনুযঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁরা দেখেননি। সামাজিক অন্যান্য সহকারী নিয়মের মধ্য থেকে বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হবে। অল্পে অল্পে নতুন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নতুন আকার ধারণ করে সমাজের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আপন উপযোগিতা সূত্রে বন্ধন করছে। অতএব যাঁরা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁদের অকারণে ব্যস্ত হতে হবে না। উপরন্তু ভালরূপ শিক্ষা ছাড়া বাল্যবিবাহ উঠে গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হবে। যেখানে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠে যাচ্ছে, যেখানে তার অভাব সেখানে আজও বাল্যবিবাহ উপযোগী।

১৮৯১-এর গোড়ার দিকে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় ‘অকাল বিবাহ’ নামে প্রবন্ধে, উপার্জন ক্ষমতা জন্মাবার আগে পুরুষের বিয়ে হলে তাকে ‘অকাল বিবাহ’ বলতে হবে বলে মন্তব্য

৫২. মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ‘ভূদেব চরিত’, ৩য় ভাগ, ১৩৪, পৃ. ৩৩৩-৩৬

৫৩. ‘সচিত্র শিশির’, ২২ কার্তিক, ১৩৩১

করেছেন। তিনি যা বলতে চাইলেন এককথায় তা হল, বাল্যবিবাহ প্রচলনের পেছনে পূর্বে যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল, বর্তমানে তার অনুপস্থিতিতেই আর সে প্রথা টিকে থাকতে পারে না।

বাল্যবিবাহ নিবারণে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণই প্রধান হয়ে উঠবে, তা বুঝতে স্বামী বিবেকানন্দের অসুবিধা হয়নি। তবে স্বামীজী বাল্যবিবাহকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন এবং যে করেই হোক এ কুপ্রথার মূল উৎপাটন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কতকগুলো বয়স্ক পুরুষের হিংস্র কামনার শিকার হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকারা, একথা ভাবতেই তাঁর গা গুলিয়ে উঠত। তাই 'কনসেন্ট বিল' নিয়ে ধর্মধারীদের অকারণ চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন,

"দেশে এমন শিক্ষিত লোক জন্মায়নি যারা সমাজ শাসনের ভয়ে ভীত না হঁয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিত রাখতে পারে। এই দ্যাখ না এখনও মেয়ে বার, তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন কনসেন্ট আইন করবার সময়ে সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো করে চেঁচাতে লাগলো আমরা আইন চাই না। অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচানো দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে ভাবত আমাদের সমাজে এহেন কলঙ্ক আছে।"[৫৪]

বাল্যবিবাহের কথা বলতে গেলে স্বামীজীর ঘৃণা শব্দে শব্দে ঝরে পড়ত। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত একাধিক ব্যক্তিগত পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে ২৩.১২.১৮৯৩-এ স্বামী সারদানন্দকে লেখা এ বিষয়ক একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব :

"আমি বাল্যবিবাহকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, এই মহাপাপই আমাদের জাতীয় জীবনের চরম দুর্গতির কারণ......।"[৫৫]

বিলটি পাসের পূর্বে সে যুগের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিচারক রমেশচন্দ্র মিত্রের কাছে সরকার মত চাইলে ১৫.১.১৮৯১ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি পত্রে তিনি বিলটি পাস না করার পক্ষেই সুপারিশ করেন। কারণস্বরূপ তিনি বলেন, "বিলটি পাস হলে জনসাধারণের ওপর অকারণে পুলিসী নির্যাতন বাড়বে, লজ্জাশীলা হিন্দু রমণীরাও এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন না। বার বছর কম সন্দেহে বিচারকরা যে কোন রমণীকে শরীর পরীক্ষার আদেশ দিতে পারেন, যা সমগ্র জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কারণ হবে।" এসব কথা চিন্তা করে তিনি বলেন, "যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের রক্ষা করাই সরকারের উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। তা না করে 'ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের' ৩৭৫ ধারার সংশোধন করে তা করলে লাভ অপেক্ষা বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।"[৫৬]

"আইনটি পাস হলে আমাদের অন্তঃপুরবাসী রমণীদের জোর করে থানাতে বা

৫৪. দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬৮

৫৫. Burke, Marie Louis, 'Swami Vivekananda in America New Discoveries', 1958, p. 527

৫৬. 'The Statesman', March 1891

বিচারালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।" একথা বললেন তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র সেন। ফুলমণির সহবাস-জনিত মৃত্যু এ ব্যাপারে একমাত্র দৃষ্টান্ত। কাজেই এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে, পার্সী সংস্কারক মালাবারির পরামর্শ মতো বিলটি পাস করে তরলমতির পরিচয় দেওয়া সরকারের উচিত হবে না।[৫৭]

সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'সময়' ইত্যাদি ব্রাহ্ম সমর্থিত পত্রপত্রিকা বিলটি সমর্থন করেছিল। অবশ্য অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এ বিলের বিপক্ষীয় শক্তিরও পরিমাপ করেছে।[৫৮]

তদানীন্তন শিক্ষিত মানসের প্রতিনিধি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এক্ষেত্রে প্রথাগত ঐতিহ্য ও নীতির পরিপোষকতা করেছিল।

বিলের বিপক্ষে মত দিয়ে পূর্বোক্ত রক্ষণশীল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ব্যবসায়িক সাফল্য অনেকের ঈর্ষার কারণ হল। ১৯.৪.১৮৯১ তারিখ থেকে পত্রিকাটি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'রও ভাগ্য ফিরে গেল। রাতারাতি এর চাহিদা ৫০০ থেকে বেড়ে ১,৫০০ কপিতে দাঁড়ায়। 'বেদব্যাস' জনপ্রিয়তা অর্জনে সকলকে ছাড়িয়ে গেল। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য 'অনুসন্ধান' পত্রিকার গাত্রদাহ নতুন নজির সৃষ্টি করল। 'জন্মভূমি'ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। বিল পাসের সংবাদে সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে 'জন্মভূমি' লেখে,[৫৯]

"আইনের আভাস পাইয়াই লোক সমূহের অঙ্গযষ্টি, বাত্যাবিক্ষোভিত কদলীপত্রের ন্যায়, ঘোররূপে আন্দোলিত হইতেছে। লোক সকল যেন দিশাহারা জ্ঞানহারা সদা ইতস্তত ধাবিত। অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল শিরে করাঘাত করিতেছে। দলে দলে লোক 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয়ে আসিয়া সৎযুক্তি কি, ইহাই কেবল জিজ্ঞাসিতেছেন। কত ব্যক্তি রাজা শশিশেখরেশ্বরের নিকট আশ্রয় লইতেছেন, কেহবা ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে গিয়া ধরিতেছেন ; কেহবা শোভাবাজারের রাজভবনে উপনীত হইয়া রাজগণ সমীপে কাতরকণ্ঠে আপন মর্মব্যথা জানাইতেছেন। ওদিকে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন, শ্রীদীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একত্রে মিলিত হইয়া ধর্মনাশের আশঙ্কা বুঝাইয়া ব্যবস্থাপত্রে সহি করিতেছেন। অন্যদিকে পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামশ্রয়ী, পণ্ডিত শ্রীব্রাহ্মব্রত সামাধ্যায়ী প্রভৃতি জ্ঞানিগণ সর্বনাশের সূত্রপাত দেখিয়া শাস্ত্র সাগর মন্থন পূর্বক গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রতিপন্ন করিতেছেন। গৃহের শিরোভাগে অগ্নি লাগিয়া দাউ দাউ জ্বলিতেছে, গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? প্রবল ভূকম্পে দেশ থরথর কাঁপিতেছে, মানুষ কি আর স্থির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে? মহার্ণবে পতিত নৌকা মহাঝটিকায় ডুবু ডুবু আরোহীগণ কি আর স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারে?"

পরিস্থিতির বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে ১২৯৭ -এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'অনুসন্ধান' পত্রিকা

৫৭. 'The Amrita Bazar Patrika', January 22, 1891

৫৮. P. Sinha, 'Aspects of Social History', p. 128

৫৯. 'জন্মভূমি', মাঘ ১২৯৭

লেখে,

"একদিকে যেমন 'বঙ্গবাসী', 'দৈনিক', 'বঙ্গনিবাসী', 'অমৃতবাজার', 'হোপ', 'হিন্দুরঞ্জিকা', 'ঢাকা প্রকাশ', 'টাইমস', 'সুধাকর' প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্সী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী, আর অন্যদিকে দেখিলাম 'ব্রাহ্মিকা সখী', 'সঞ্জীবনী', নিমব্রাহ্ম 'সময়' প্রভৃতি হিন্দুর গৃহশত্রু ক-একজন বিল যাহাতে পাস হয় সেজন্য বিশেষ উদ্যোগী।"

শাস্ত্রের নির্দেশ যুক্তি তর্ক ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মনে স্থান পায় না। সাধারণ মানুষ দেশাচারকেই মেনে চলে। 'গর্ভাধান' সংস্কার হিন্দুসমাজে বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি লৌকিক আচার। এবং হিন্দুরা নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে আসছেন। আইনের কথা শুনে সমাজের তথাকথিত সংরক্ষণপন্থীরা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন।

"একব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, 'ইহা কখনই সম্ভব নয়। বোধহয় আপনারা আমাকে তামাসা করিতেছেন।' আমরা বলিলাম, 'না ইহা সত্য কথা।' তখন তাঁহার সর্বশরীর যেন ফুলিতে লাগিল, বক্ষ বিশাল হইয়া উঠিল ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া অশ্রুজলের পরিবর্তে যেন রুধির ধারা বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি উচ্চরবে বলিলেন, 'সত্য সত্যই যদি এ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। চন্দ্রসূর্য আর উদিত হইও না। বায়ু আর বহিও না। গঙ্গাজল শুকাইয়া যাও। তীর্থক্ষেত্র ভূগর্ভে প্রোথিত হউক। দেশ অতলস্পর্শে ডুবিয়া যাউক।'"

সহবাস আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় দিয়ে 'বেদব্যাস' লেখে,

"অকস্মাৎ এ ভীষণ বার্তা শুনিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারত কাঁপিয়া উঠিল। বহুকালের নিদ্রিত জড়তাভাবাপন্ন ভারতহৃদয় কি যেন সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল। শত শত বৎসরের কলহ ভুলিয়া দৈববলে একপ্রাণ হইয়া উঠিল। এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজশাসনে আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা বলা যায় না।"[৬০]

জনমানসে বিলটির এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় কতিপয় স্বধর্মানুরাগী ব্যক্তি বিষয়টি পুনর্বিবেচনায় উদ্যোগী হয়ে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের বিধান চান। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে নামকরা পণ্ডিতদের কাছে 'গর্ভাধান সংস্কারের শাস্ত্রীয়তা' সম্বন্ধে বিধান চেয়ে পত্র লেখেন। নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, বরিশাল ইত্যাদি স্থান থেকে চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, রামতারণ শিরোমণি, চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার প্রমুখ ৫১ জন পণ্ডিত স্বতন্ত্রভাবে 'গর্ভাধান সংস্কার' শাস্ত্রসম্মত বিধান দেন এবং তা পালন না করলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে বলেন। পণ্ডিতদের মতসমূহ সংকলন করে তিনি 'সহবাস সম্মতি বিষয়ক আইন সম্বন্ধে দেশীয় ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য সরকার আইন পাস থেকে বিরত হোন। ইংরেজি জানা কিশোরীচাঁদ মিত্র নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, বিলটির প্রতিবাদ করে ইংরেজিতে 'Criticism of the Age of Consent Bill'

৬০. 'বেদব্যাস', ফাল্গুন ১২৯৭

(1891),[৬১] লিখে এবং বিনামূল্যে তা বিতরণ করে স্বধর্মানুরাগের পরিচয় দেন।

মুসলিমরাও বিলটির প্রতিবাদ করলেন। এঁদের বক্তব্য, বিলটি পাস হলে ১২ বছরের কম বয়স্কা স্ত্রীরা রজস্বলা হলেও যতদিন না স্বামী সহবাসের উপযুক্ত হচ্ছেন (ইস্‌লামের ভাষায় কবিল ওয়াতি সবিবা) ততদিন পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ দাবি করতে পারছেন না। অভিভাবকের ওপর এ বোঝা চাপানো এবং তার ব্যক্তিগত এই ক্ষতি উভয়ই ইসলাম ধর্মবিরোধী। ইতিমধ্যে বিধবা বা স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা হলে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ দাবি করাও কখনও সম্ভব হবে না। ধর্মের অনুশাসন সম্পূর্ণ না মেনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ ভরণপোষণ বহনে স্বামীকে বাধ্য করলে তা ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে। এসব কারণ দেখিয়ে 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত' পত্রিকায় জনৈক মুসলমান[৬২] এর প্রতিবাদ করেন।

বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভাসমিতি ছাড়া কলকাতায় জানবাজারের সাবিত্রীসভা, বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভা ও শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় বিলটির প্রতিবাদ জানানো হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমর্থন পাবেন বলে ভাইসরয় পূর্বে যে মন্তব্য করেন, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক তার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫.১.১৮৯১-তে উক্ত পত্রিকায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, রাজা রাজেন্দ্রলাল, বিচারক স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার টি. মাধবরাও প্রমুখ সমকালীন চিন্তাশীল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক দীর্ঘ তালিকা দেন, যাঁরা বিলটি সমর্থন করছেন না। ঐ একই পত্রে বিলটির সমর্থক ব্যক্তিদের অনুরূপ একটি তালিকাও চাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ থেকে কোনও তালিকা দেওয়া হয়নি।

ফুলমণির সহবাসজনিত দুর্ঘটনা এ ব্যাপারে একমাত্র দৃষ্টান্ত, অথচ এই একমাত্র দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করেই সরকার হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাই এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন এবং ২১.১.১৮৯১ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় Dr Jogendranath Datta, Pandit Dwarkanath, Dr. M. C. Dowell প্রমুখ দেশি-বিদেশি ডাক্তার ও কবিরাজের এক দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরলেন যাঁরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধরনের কোনও রোগীর সন্ধান পাননি। তাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রাজকুমার সর্বাধিকারী ১৬.২.১৮৯১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় A. Scoble-এর পূর্বোক্ত মন্তব্যের (নারীসমাজকে অপরিণতাবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি থেকে রক্ষা করা যাবে, এবং উপযুক্ত বয়সের পূর্বে সহবাস থেকে মেয়েদের

৬১. এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে ইংরেজি ভাষায় 'সহবাস সম্মতি' আইনের প্রতিবাদ করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা সহ তার উত্তর সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
ধন্বন্তরী আ. সি. চান্দার অভিমত, "মিঃ মনোমোহন ঘোষের এই আইনের দ্বারা পরিচালিত কুটিল মস্তিষ্কপ্রসূত জটিল ও কৌতুকাবহ প্রস্তাব, বিদ্যাদিগ্‌গজ উইলসন সাহেবের প্রমাণ প্রয়োগ এবং সহসোত্থিত সংস্কারক 'সেন বাবু'র আত্মম্ভরিতারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে গ্রন্থকারের স্বধর্ম্মানুরাগ ও কুলাচারপ্রিয়তা দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম।" (পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত।)
—'সুবোধিনী', ফাল্গুন ১২৯৩

৬২. A. Mussalman, 'Reis and Rayyet', January 31,1891

রক্ষা করা যাবে।) তীব্র সমালোচনা করে বিলটি সম্বন্ধে আপসহীন পরিচয় না দিতে সরকারকে পরামর্শ দেন। প্রতিবাদকারীরা এরপর মালাবারিকে লেখা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর সাহেবের পত্রের কথা বলেন, "বাল্যবিবাহ রহিত করিতে চেষ্টা কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সাধারণ ইউরোপের প্রথা যেন অনুসরণ করা না হয়। অর্থাৎ অধিক বয়স পর্যন্ত কি পুরুষ কি স্ত্রী অবিবাহিতা থাকাতে ইউরোপে যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা যেন ভারতবর্ষে দেখিতে না হয়।"[৬৩] (ইংরেজিতে লেখা। এখানে কিয়দংশ অনুবাদ)

প্রতিবাদকারীরা এরপর বিলটির সমর্থক সংস্কারক-নামধারী ব্যক্তিদের চারভাগে ভাগ করলেন—১) পার্সী সংস্কারক, ২) ইংরেজ সংস্কারক, ৩) ব্রাহ্ম সংস্কারক, ৪) বাবু সংস্কারক, যাদের সঙ্গে অন্তত হিন্দুধর্মের কোনও যোগ নেই। কাজেই 'অনুসন্ধান পত্রিকা' ১৫.১০.১৮৯১ তারিখে একটি চিঠিতে স্পষ্টভাষায় জানায়, "গভর্নমেণ্ট যদি আইন পাস করতে চান, তাহলে দেশীয় পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায়গণের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য অহিন্দুর এ ব্যাপারে কথা কইবার কোনও অধিকার নেই।" প্রতিবাদকারীরা মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রতিজ্ঞার কথা "ধর্মনাশ করিব না, এবং ধর্মে হস্তক্ষেপ করিব না" স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

"ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং বলুন আমি ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। কিম্বা ঐ প্রতিজ্ঞার ঐরূপ অর্থ নয়।"

'বেদব্যাস'-এর কাকুতিমিনতিও[৬৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"শ্রী শ্রী মহারানীর দোহাই দিয়া বলি, রাজপুরুষদিগের দোহাই দিয়া বলি, আমাদের কুলকামিনীদের লজ্জা রক্ষা করুন। তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করুন, আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা করুন, সংসার রক্ষা করুন, সমাজ রক্ষা করুন, এই বিল অবরুদ্ধ করুন।"

প্রতিবাদকারীরা বলেন, বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে নতুন প্রচলিত হয়নি, বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণ এর কোনওরূপ দোষ দেখেননি, অথচ সংস্কারক নামধারী বাবুরা একে সর্বদোষের আকর মনে করছেন। কাজেই নিষ্ঠাবান হিন্দু নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তথাকথিত সংস্কারক-নামধারী বাবুদের উদ্দেশ্যে তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন,

"সমাজ সংস্কারকগণ! আর আমাদের জ্বালাইও না। তোমরা তোমাদের মধ্যে যুবতী বিবাহ, প্রৌঢ় বিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, অন্তিম বিবাহ, যাই কেন প্রচলন কর না অন্যকে তোমাদের অনুসরণ করিতে বলিও না। হে ইংরেজরাজ! আমরা অনুনয় করিতেছি আমাদিগকে রক্ষা কর, অব্যাহতি দাও।"

আবেদন নিবেদনের এরূপ অসংখ্য চিত্র সমকালীন পত্রপত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি[৬৫] করেছে। এতে ব্যর্থ হয়ে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নিরুপায় হয়ে কালীঘাটে কালীর চরণে শরণ নেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিলটি পাস হলে বাস্তব অসুবিধা হয়তো কিছু দেখা দিতে পারত, দেশবাসী কিন্তু ধর্মনাশের আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে "মা মা শব্দ। সর্বত্র মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর।" শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

৬৩. 'বেদব্যাস', ফাল্গুন ১২৯৭
৬৪. 'বেদব্যাস', ফাল্গুন ১২৯৭
৬৫. 'সুবোধিনী', কার্তিক ১২৯৭

ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে কালীমন্দিরে সমবেত হয়ে কেহ বা হোম, কেহ চণ্ডীপাঠ, কেহ কীর্তন, অনেকে আবার বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ, জপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে রত হল। কোনও কোনও বেদজ্ঞ পণ্ডিত মধুর স্বর-সংযোগে সামগানে প্রবৃত্ত হলেন, কোথাও বা অবধূত সন্ন্যাসী ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে, শতাধিক সুব্রাহ্মণ মায়ের মন্দিরের চারদিক বেষ্টন করে এককালে চণ্ডীপাঠে প্রবৃত্ত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থেকে এক মহা হোমের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কেউ বা হাড়িকাঠে প্রাণত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর, অন্যে আবার তাকে সান্ত্বনা দেয়। এককথায়, "কলিকালে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব।"[৬৬]

'বেদব্যাস' ফাল্গুন ১২৯৭ সংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ-বিষয়ে একটি চিত্র এরূপ :

"পরদিন প্রভাতে লোকে দেখিল পাগ্‌লী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিতেছে, মুখে মাছি বসিয়াছে, কাকে চক্ষু খুলিয়া খাইবার জন্য ঠোকর মারিতেছে। যে দেখিল সেই বুঝিল, কেন সরলা মরিল। সরলা জলে ডুবিয়া মরিল না কেন? সরলা মনুর পার্শ্বে চিতার উপর শুইল না কেন, অন্ধকার রাত্রি কেহ ত দেখিতে পাইত না। এমন করিয়া মরিলে দেশের লোক তাহার দোদুল্যমান নগ্ন শরীরের দিকে ত তাকাইত না, এমন করিয়া কাকে ত সোনার অঙ্গে ঠোকর মারিত না। পোষ্টমর্টেমের জন্য পুলিশে ত রজ্জু কাটিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইত না! না—তাহা হইলে দেশের লোক ত রাজাকে ধিক্কার দিত না, দানব পিশাচেরা এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া লজ্জিত, ভীত হইত না। তাহা হইলে সমাজ সংস্কারকেরা নিজদিগের কৃত কর্ম্মসকলের এমন নিদর্শন দেখিয়া, এত স্পর্দ্ধা ত করিতে পারিত না। সরলা এত কথা বুঝিয়াছিল, তাই জীবনধিক্কারছবী নিজ জীর্ণ শরীরকে গাছের আগায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল।"

বিলের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে দলাদলি কিরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল 'অনুসন্ধান' পত্রিকা[৬৭] তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখে,

"একদিকে যেমন দেখিলাম রাজা প্যারীমোহন, রাজা শশিশেখরেশ্বর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের ভাবী ভাবনা ভাবিয়া আকুল, অন্যদিকে তেমনই দেখিলাম ব্রাহ্ম আনন্দমোহন, দ্বিজরাজ কৃষ্ণকমল ও সর্ববিরোধী শম্ভুচন্দ্র সকলেই আমাদিগকে দুর্দশার চরম সীমায় পতিত করিতে পারিলেই যেন সন্তুষ্ট।"

উনিশ শতকের শেষ দশকে এইভাবে সহবাস সম্মতি বিষয়ক বিলটিকে কেন্দ্র করে পত্রপত্রিকাগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও বহুবিবাহ আন্দোলন সমাজকে আলোড়িত করলেও সর্বস্তরের মানুষকে এত বেশি প্রভাবিত করেনি। উদ্ধৃতির সংখ্যা না বাড়িয়ে সংস্কারক নামধারী বাবুদের হাত থেকে সমাজ ও ধর্মরক্ষার জন্য স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার[৬৮] সতর্কবাণী উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

"হিন্দুসন্তান, আবার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠুন। এই সকল স্বেচ্ছাচারী

৬৬. 'বেদব্যাস', ফাল্গুন ১২৯৭
'চিত্রদর্শন', কার্তিক ১২৯৭

৬৭. 'অনুসন্ধান', ৩০ ফাল্গুন, ১২৯৭

৬৮. 'অনুসন্ধান', ১৫ চৈত্র, ১২৯৭

কুলাঙ্গারদের হস্ত হইতে সমাজ রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। মুষ্টিমেয় কুলাঙ্গারগণের দ্বারা সমাজের যে অনিষ্ট হইতেছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তানগণ কি তাহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন না।"

প্রতিবিধানের আর সময় পাওয়া গেল না। 'সম্মতি আইন' পাস হল, ১৯ মার্চ ১৮৯১। ইতিহাসে যা 'এজ অব কনসেন্ট অ্যাক্ট' নামে পরিচিত। আইনটি ফৌজদারি মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়। আইনটির ভাল দিক যে ছিল না তা নয়, এমনকি শাস্ত্রবিরোধী নয়। আইনটির প্রয়োগ সম্বন্ধে 'পাবলিক রিফর্ম সার্কুলার'-এ ভারত গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি সি. জে. লায়ালের পক্ষ থেকে উদার নীতির পরিচয় দেওয়া হবে, এমন প্রতিশ্রুতিও[৬৯] দেওয়া হয়। অথচ বিষয়টি কেন্দ্র করে ঝড় বেশি যা উঠেছিল তা বাংলাদেশেই। সামাজিক ব্যাপারে বাঙালিদের রক্ষণশীলতাই এর একমাত্র কারণ। তাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এর বিরোধিতা করেছিল। আইন পাস হওয়ার পরও রাজা শশিশেখরেশ্বর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ ব্যক্তি, হিন্দু সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এবং দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, হিন্দু-মুসলমান, বিলের বিরোধী সকলকেই ১৫.১.১২৯৮ তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বিলটির যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাঁদের কোনওদিনই ভুলবেন না 'চিত্রদর্শন' এমন আশ্বাসও দিয়েছিল। যার ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশবাসী বিলটির বিষয়ে জানতে পারে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয় সেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাকে, 'বঙ্গবাসী'র কৃপায় আর যাই হোক রাজা অন্তত বলতে পারবেন না, "কাহারও আপত্তি না পাইয়া বিল পাস হইল।"

সবটা মিলে ফল দাঁড়ালো, এ পর্বে সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহ-যোগ্য বয়স ১২ বছর নির্দিষ্ট করে আইন পাস হল। কিন্তু আইন, আইনই রয়ে গেল, বাল্যবিবাহ আজও বর্তমান। এর কারণ দেশজোড়া অশিক্ষা, যুগসঞ্চিত সংস্কার ও সংস্কারকদের স্ববিরোধী মনোভাব।

কেশবচন্দ্র সেনের কথা বাদ দিলেও বিদ্যাসাগরের স্ববিরোধিতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। মনে হয়, এ কি বার্ধক্যের ধীরতা? কিন্তু তা নয়। আইন করে সামাজিক প্রথা উচ্ছেদের প্রয়োজন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেরূপ ছিল, শেষার্ধে তা অনেকাংশে কমে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের বয়স উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলে[৭০] সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাও ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে। এসব দেখেশুনেই বিদ্যাসাগর আইন পাসে উৎসাহ দেখাননি।

তবে কি এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল? না, তা হয়নি। সমকালীন বাঙালি জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার না করলে, উত্তরকালে বাঙালি মেয়েদের আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ এর দীর্ঘদিন পরও সগৌরবে চলেছিল। ১৯২১-এর

৬৯. 'সম্মতি আইনের বয়স বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা', ১৮৯১ (প্রথমে অপ্রকাশিত, পরে প্রকাশিত), পৃ. ১১৭

৭০. 'Census Report of the Government of India', 1901

সেন্সাস রিপোর্ট বা আদমসুমারি অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ বছর সমগ্র ভারতে এক বছরের কম বয়সের ৬১২টি, পাঁচ বছরের কম বয়সের ২০২৪টি, দশ বছরের কম বয়সের ৩,৩২,০২৪টি হিন্দু বিধবা ছিল। সামাজিক প্রথার বলি এসব অসহায় বালিকাদের উদ্ধারের জন্য পুনরায় ১৯২৯-এর নভেম্বর মাসে আইন পাস করা হয়। যাতে মেয়েদের ন্যূনতম বিবাহযোগ্য বয়স পূর্বের ১২ বছর নির্দিষ্ট থাকলেও, ছেলেদের ন্যূনতম বয়স ১৫ বছর নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানেও এ প্রয়োজন একেবারে শিথিল হয়ে যায়নি। জন্মের হার ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন বিবাহ বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছর করে আইন পাস করার কথা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন।[৭১]

শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাই পূর্বে যে বিষয়টি সমাজে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বর্তমান তা সংবাদপত্রের দৈনিক সংবাদ সরবরাহের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্ষুদ্রতম পরিসরে মাত্র স্থান পেয়েছে। দীর্ঘ ৮৭ বছর পর বর্তমান বিষয়টি সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হলেও সমসাময়িক কালে সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে কীরূপ প্রভাবিত করেছিল, তা সাহিত্যে প্রতিফলন অংশে আলোচনা করব।

৭১. 'যুগান্তর', ২১.৯.১৯৭৮

সাহিত্যে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রতিফলন
(১৮৫০-১৯০০)

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা কবিতা (১৮৫০-১৯০০)

নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্মক্ষণ সূচিত হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। যদিও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্ত সুপরিচিত। আমাদের মনে হয় ঈশ্বর গুপ্ত এমন একজন মানুষ যাঁকে আমরা চিরদিন ভুল বুঝেছি এবং যাঁর প্রতি চিরদিন অবিচার করেছি। বেথুনের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে যিনি উল্লসিত হয়ে লিখলেন,

"হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষ সকল, স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন।"[১]

স্ত্রীশিক্ষার পারিবারিক প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে যিনি পুনরায় লিখলেন,

"স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানশিক্ষা করণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমারদিগের ক্লেশ হইতেছে তাহা কি লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, আমরা যদ্যপি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিরোধ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে, আর সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।"[২]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেথুন স্কুলে কন্যা ভর্তি করেছেন, সদাশয় ব্যক্তিটির এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য তিনি সুধিগণকে আহ্বান[৩] জানিয়েছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সংখ্যার পর সংখ্যায় যিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ক্লান্তিহীন, তিনিই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরূপে চিত্রিত। অথচ যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৫৬ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে নীরব (একটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে) সেই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী আমাদের কাছে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরূপে চিহ্নিত, গবেষকগণ কর্তৃক সমাদৃতও।

১. স্ত্রীবিদ্যাশীর্ষক, 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকীয়, ২৮.১.১২৫৬

২. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৮), পৃ. ৪১-৪২

৩. "অস্মদ্দেশের সর্বাগ্রগণ্য প্রধান মহাশয়েরা যদি এ বিষয়ে যথাযোগ্য অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন তবে অবিদ্যাবৃন্দের বিদ্যালাভের কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না।"
—'সংবাদ প্রভাকর', সম্পাদকীয়, ২৪.৩.১২৫৮

আমাদের মনে হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের দু'টি সত্তা। একটি চিন্তানায়কের, অপরটি ব্যঙ্গ-রসিকের। সেই মানুষটি যিনি পরিহাসপ্রিয়, তিনিই কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে রক্ষণশীল সমাজের অমূলক ভীতিকে ব্যঙ্গ করে পরিহাসছলে যখন লেখেন,

"আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥"[৪]

তখন আর সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা তাঁকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলতে পারি না।

বিষয়টিকে যদি আমরা অন্যভাবে দেখি তাহলে বলতে পারি, সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ উভয় দিক থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্যে যদি আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি, স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, অন্ধ অনুকরণের মোহে যদি মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, সে দিক থেকে কবিতাটি তাঁর সতর্কবাণী। এ কবিতা-মুকুরে আপন মুখের বিকৃত রূপটি দেখে বাঙালি নিজেকে হয়তো সংশোধন করতে পারবে, ঈশ্বর গুপ্ত এমন আশা করেছিলেন। বাঙালিকে নিয়ে রঙ্গরসের আসর জমানোই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, অন্ধ অনুকরণপ্রিয় বাঙালিকে স্বধর্মে দীক্ষিত করানোর জন্যই গুপ্তকবির প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর লেখনীকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে শাণিত করা।

ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাব (১৮২৪-৭৩) নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে। স্বাধীন রমণীর ব্যক্তিত্বময়ী রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। বীরাঙ্গনা প্রমীলা কবির এ উদ্দেশ্য সাধনে উপস্থাপিত, যাকে আমরা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিফলন বলতে পারি।

---

৪. 'দুর্ভিক্ষ', 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী', (বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ), পৃ. ১৪০

স্ত্রীশিক্ষাই নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে। স্ত্রীশিক্ষার ফলেই আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী রমণী প্রমীলা সমান অধিকারের দাবি নিয়ে স্বামী মেঘনাদের পাশে রণক্ষেত্রে মিলিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছে। বলতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদনের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনাপরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে এক নব আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়েছিল তা ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করেছিল,[৫] 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) সেই ঘনীভূত প্রকাশের সার্থকতম দলিল।

বাস্তবে তখন নারীমুক্তি সম্ভব হয়নি, কিন্তু কাব্যে তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপনের পূর্বে কোনও নারী সঙ্ঘ এদেশে ছিল না। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকা সমাজে মহিলা সভ্যদের উপস্থিত থাকবার সুযোগ দেওয়া হল। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনাপর্ব। মেয়েরা এই প্রথম পুরুষের পাশে বসবার অধিকার পেল। ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে ১৮৫৮-এ এর ইচ্ছামাত্র সূচিত হয়েছিল, ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম ইচ্ছাপূরণ। মেঘনাদবধ যখন লেখা হয় তখন বঙ্গ সমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার উন্নতি আরম্ভ হয়েছে, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ডিরোজিওর প্রভাবে সুশিক্ষিত বাঙালি যুবকরা হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করেছিলেন, গৃহে তা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্র তখনও প্রস্তুত হয়নি। কাজেই অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা সঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখে কৃতবিদ্য যুবক সেদিন মোহিত হয়েছিলেন। দেশি ও বিদেশি আদর্শের এমন নিপুণ মিশ্রণ সেকালের কবিকল্পনায় আর কোথাও নেই, মনে হয় কবিমানসের আদর্শ নারী কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।[৬] প্রমীলা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক নায়িকা কুলের অগ্রজা। বেহুলার সতীত্বনিষ্ঠার সঙ্গে তিলোত্তমার নারীমর্যাদাটুকু সম্মিলিত হয়েছে প্রমীলা চরিত্রে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বিভিন্ন ভদ্রমহিলা যে দাবি তুললেন সে শুধু বাঁচার দাবি নয়, নারীত্বের দাবি, সমান অধিকারের দাবি।

সীতা, সুভদ্রাও মাইকেলের প্রিয় চরিত্র। এঁরা যেন ভিন্ন যুগের দ্বিবিধ নারীব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি। সীতা অতীত নারীসমাজের প্রতিনিধি, তাই চিরনিগৃহীতা ; ভারতীয় নারীর নিরুদ্ধ পুঞ্জীভূত বেদনার গাঢ়তম ভাষা সুভদ্রা, ভাবীসমাজের স্বাতন্ত্র্যময়ী রমণী। রথের রজ্জু তাই তার আপন করে। সীতা বিনম্রা আর সুভদ্রা দীপ্তিময়ী। কবি 'সুভদ্রাহরণ' নামে পৃথক কাব্য লিখে এই পৌরাণিক আধুনিকাকে চিরস্মরণীয় এবং কাব্যের অঙ্গনে এক স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের অধীশ্বরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আর সময় পাননি। কবিমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সেই অপারগতাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

মধুসূদনকে কেন্দ্র করে নারীপ্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে যে নতুন পথ সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী কবিরা সে পথেই অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু মধুসূদন যে প্রতিভার

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (২য় সং), পৃ. ২২১
৬. দ্রঃ মোহিতলাল মজুমদার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', (সং ১৩৪৩), পৃ. ১০৬

অধিকারী ছিলেন, সমসাময়িক কোনও কবির তা ছিল না। তথাপি স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমকালীন কবিরা কাব্যরচনার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন, আন্দোলনাশ্রয়ী সাহিত্য হিসাবে তা উল্লেখের দাবি রাখে।

নারীর মহিমামণ্ডিত রূপের পরিচয় রয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) 'সুরসুন্দরী' কাব্যে, যা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিফলন।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৭-৭৮) 'মহিলা' কাব্যে।

বিদ্যাধন জগতে দুর্লভ, বিদ্যা অন্ধকে চক্ষুষ্মান করে, গুণিগণের ভূষণ, সুতরাং বিদ্যা দ্বারা মঙ্গল ছাড়া কোনওরূপ অমঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। তাই স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল সমাজের কাল্পনিক ভীতি, যথা শিক্ষিতা মহিলার অবাধ্যতা, আত্মম্ভরিতা, চারিত্রিক অবনতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনে কবির নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে :

"বিদ্যা হ'লে ললনার
বাধ্য না থাকিবে আর,
পুরুষে না মানিবে, হইবে অভিমানী।
সুতবিজ্ঞ হ'লে পরে
মাতায় অবজ্ঞা করে,
হেন যদি হয়, তবে হেন কথা মানি,
হ'লে নারী বিদ্যাবতী,
কখন না থাকে সতী,
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবিঃ হেন তায়,—"
হেন ভ্রম হৃদে যার,
যুক্তি কি করিবে তার!
হা বানি! গণিকাদলে গণে সে তোমায়!
পুরুষেরা বিদ্যাবিষ কেন তবে খায়!"[৭]

কবির এ প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়নি। আর সেজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে বহুবিতর্কিত এই স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিফলন।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ নয় ; শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। যেহেতু পিতৃগৃহে অথবা পতিগৃহে কোথাও মেয়েদের শিক্ষার যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া হয় না। তাই নারীসমাজের অবনতির জন্য শিক্ষাকে দায়ী করা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে তা প্রতিফলিত :

"থাকিতে পিতার ঘরে,
যদি কিছু শিক্ষা করে,
বিবাহ হইলে সব পাঠ সাঙ্গ পায়!

৭. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মহিলা' (১৩৫৭ সং), পৃ. ৬৮-৭০

থাকে নিয়া গৃহকাজ,
কিম্বা বেশ, ভূষা, সাজ ;
দৈবে যদি কভু ঘটে অবকাশ তায়,—
দূষ্য গ্রন্থ দেশময়,
পাঠে করে কালক্ষয়,
নারীপাঠ্য গ্রন্থ অল্প, কেবা তা পড়ায়।
কুপথ্য ক্ষুধায় খায়,
ঘোর রোগে পড়ে তায়,
হেন মতে স্বভাবের বিকার ঘটায়!
শিক্ষা নয়, শিক্ষার অভাবহেতু তায়।" (ঐ)

সাংসারিক দায়িত্ব স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ। স্ত্রীশিক্ষাই স্ত্রীকে পুরুষের সমকক্ষ করে। কাজেই পারিবারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সুশিক্ষার প্রয়োজন। অশিক্ষিতা নারী শিক্ষিত পুরুষের নিকট একপক্ষ পক্ষীবিশেষ। পারিবারিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে তাই অবিলম্বে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে কবির এরূপ চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি :

"সংসারের সুখ যত,
সব বুদ্ধি অনুগত,
নারী নরে পরস্পরে সংসার চালায় ;
নারী অশিক্ষিতা যথা,
অর্দ্ধ ভাগ বুদ্ধি তথা
ক্রিয়াহীন রয়, কিম্বা রত কুক্রিয়ায়।
এক কর ভগ্ন যার।
কোন কাজে সুখ তার।
এক পদ খঞ্জের গমন অগত্যায়।" (ঐ)

মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে পুত্রকন্যাকে নানা হিতবাক্য ও সদুপদেশ দানে তাদের পরিপূর্ণভাবে মানুষ করে তুলতে সমর্থ হবেন। জননীর স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতময়ী শিক্ষা পুত্রকন্যার মানসিক উৎকর্ষ সাধন করবে। কাজেই স্ত্রীশিক্ষার এই বাস্তব প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, কবি ভ্রান্তি ও কুসংস্কার ত্যাগ করে অবিলম্বে সকলকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হতে আহ্বান জানিয়েছেন :

"ভ্রান্তি বোধ পরিহর,
স্ত্রীশিক্ষায় যত্ন কর ;
হে হিন্দু, ধরায় তুমি খ্যাত বুদ্ধিমান,
জায়া, ভগ্নী, কন্যাগণে,
শিক্ষা দেহ সযতনে
সমাজ অশুভ সবে পাবে পরিত্রাণ।

গৃহে না কলহ রবে,
পরিবারে প্রীতি হবে,
জন্মিবে বলিষ্ঠ, শিষ্ট, সুত সুতাগণ,
কষ্টের অর্জিত ধনে,
ভোগে সুখ হবে মনে,
দিতে নাহি হবে ধাত্রী গুরুর বেতন,
হবে তব নিলয় কমলা নিকেতন!" (ঐ)

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার যে দিকগুলি কবি উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রকাশ করেছেন, তা নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, একান্তই বাস্তব। কাজেই কবি যুক্তিবাদী মননশীলতারও অধিকারী ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে নারীস্তুতি বর্ণনায় পঞ্চমুখ, যা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিফলন বলা যায় :

"জানি আমি নারী, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠকাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কারে!
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী!
উপমার কারিগরি বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলা খেলা (গোপীর হিন্দোলা)!
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা ;
নাচিছে উর্বশী যেন বাসন্তী নিচোলা।"[৮]

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনে পত্রপত্রিকায় একাধিক কবিতা লেখা হয়। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুতে দেখি, স্ত্রীশিক্ষাকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে সংস্কারকরা ধর্মশিক্ষা বা নীতিগত শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এঁদের বক্তব্য, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষা বা নীতিগত শিক্ষা পেলে রমণীহৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি দূর হবে, সমাজ ও সংসারে শান্তি নেমে আসবে। কাজেই স্ত্রীশিক্ষার ভাবী সুফল সম্বন্ধে কবির অভিমত ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে :

"শিক্ষিতা বঙ্গের নারী বিদ্যা উপার্জন করি,
কুরুচি কুসংস্কার গিয়াছে চলিয়া।
সুরুচির আভরণে, সেজেছেন সযতনে
নূতন নূতনতর, বেশেতে শোভিয়া।
বৃথা সে সকল শোভা, যদি ধরমের আভা,
কেবল রমণীহৃদে নাহি উজলয়।"[৯]

রমণীগণ বিদ্যার্জন করে কুসংস্কারমুক্ত হলে আমাদের গৃহাঙ্গন আলোকিত হয়ে উঠবে। বিদ্যারূপ ভূষণে রমণীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে, মূর্তিমতী করুণার অধিষ্ঠাত্রী

৮. দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'অশোকগুচ্ছ', (সং ১৩১৯), পৃ. ৭
৯. 'পরিচারিকা' আশ্বিন ১২৯৫ (৬ সংখ্যা), 'বঙ্গনারী' কবিতা

দেবীরূপে ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমগ্র বিশ্বের নরনারীর হৃদয় সে সৌন্দর্য ও মহিমায় মুগ্ধ হবে। কাজেই কবি বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা করে বঙ্গললনাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে উপদেশ দিয়েছেন :

"পুণ্যের প্রদীপ জ্বালো অন্ধকারে কর আলো ;
শতশত গুণে তব, সৌন্দর্য্য বাড়িবে।
তুমি স্বরগের ছবি তোমারে দেখিয়া দেবী
পৃথিবীর নরনারী মোহিত হইবে।" (ঐ)

পরিশেষে কবি বঙ্গললনাদের সম্ভাষণ করে বিশ্বের নারীসমাজে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে কাতর আহ্বান জানিয়েছেন :

"ওগো বঙ্গ কুলনারী তোমারে বিনয় করি,
দুঃখিনী একটি আজি, করে নিবেদন।
তোমরাই শুদ্ধমতি, গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সতী
ধর্ম্মই তোমাদের অপূর্ব ভূষণ।" (ঐ)

॥ ২ ॥

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে একাধিক কবিতা লেখা হয়েছিল। পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের (১৮০৬-৫৭) কাব্যে আমরা এর প্রথম প্রতিফলন লক্ষ্য করি।

নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনকে দাশরথি রায় সমর্থন করেননি। অর্থাৎ কাব্যে নারীকে মুক্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে, মেয়েরা যদি লেখাপড়া শিখত তাহলে গোপনে প্রেমপত্র লিখত, "ঘটত ভাল পিরীতের পন্থা।"[১০] যদিও নাবীদের দুঃখদুর্দশায় তাঁর কবিহৃদয় ভারাক্রান্ত। তিনি তাদের পরাধীন অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পক্ষী যেন পিঞ্জরে বদ্ধ।" অথচ এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, তা তিনি সমর্থন করেননি। সবটা মিলিয়ে আমরা তাঁকে অনুদার ও রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করলাম।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নারীসমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হবে। রক্ষণশীল সমাজের এ ধরনের চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে একাধিক কবিতায়। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ ধরনের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

"ফাটকে আটক রব না
আপন করে যতন ক'রে খুলে দেছ ডানা।
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শিকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি, দখল কর জেনানা।
আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব
টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা।

---

১০. হরিপদ চক্রবর্তী, 'দাশরথি রায় ও তাঁর পাঁচালী', (সং ১৩৬৭), পৃ. ৪৩০

এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মীপূজার আল্পনা।
আমরা সব ছাড়্বোনা আঁড় নয়ন, আর মোহন বেণী
ঐটি নারীর নিশানা,
(শুন পুরুষ) ঐটি নারীর নিশানা,
প্রেমের বন্দর, রইলো অন্দর, গুছিয়ে কর গিন্নিপনা।"[১১]

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনকে সমকালীন কবিরা কীভাবে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কবিতাগুলির আলোচনা থেকে তা বোঝা যায়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধেও কিছু বক্তব্য ছিল, বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করেননি, যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দেশীয় ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেয়েদের সেই আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা এঁদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন। কাজেই কাব্যে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনই বেশি। তাই বিরুদ্ধে লেখা কবিতার সংখ্যাও কম। কিছু কিছু ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের স্ত্রীশিক্ষাজনিত উগ্র স্বাধীনতাবোধ ও উন্নাসিকতাই এ সমস্ত কবিতায় সমালোচিত হয়েছে। আন্দোলনের ইতিহাসে তার গুরুত্ব থাকলেও, সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশাধিকার নেই। কাজেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, সমকালীন শিক্ষিত জনমানসে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ব্যাপক অভিনন্দন লাভ করেছিল।

১১. বৈষ্ণবচরণ বসাক (সংকলিত) 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত', (সং ১২৯৯), পৃ. ৫৩৫

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫০-১৯০০)

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিফলন রয়েছে বাংলা নাটক ও প্রহসনে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েদের বসবার অনুমতি দেওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়।

নারীশিক্ষার এই অগ্রগতি প্রগতিশীলরা পর্যন্ত অনেকে ভাল চোখে দেখলেন না, রক্ষণশীলেরা স্বতঃই আতঙ্কিত হলেন। কাজেই দু-একটি[১] ছাড়া অধিকাংশ নাটক প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কুফল চিত্রিত হল। সমসাময়িক দু-একটি ঘটনাও এ জাতীয় নাটক, প্রহসনের বাস্তব উপাদান জুগিয়েছিল, দু-একটি প্রহসনে তার ইঙ্গিত পাই।[২] সমাজ সংশোধনের তাগিদেও অনেকে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। গ্রন্থকার হওয়ার প্রলোভনও অনেককে এ কাজে উৎসাহিত করেছিল, স্বীকারোক্তি যাই থাক্।

উদ্দেশ্য যাই হোক, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে জটিল করবে। শিক্ষা পেলে বাঙালি মেয়েদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এই আতঙ্ক অধিকাংশ প্রহসনে প্রতিফলিত। স্ত্রীসমাজের এই বিপর্যয়ের জন্য প্রহসনকারেরা আবার পুরুষদেরই দায়ী করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রকৃত শিক্ষায় যদি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে আমাদের ব্যবহার শোধরাতে হবে, আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, ভ্রান্ত অভিমান বিসর্জন দিতে হবে, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কঠোর কশাঘাতকারী গ্রন্থকারের গুণগান করতে হবে, এমনকি এজন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে আমাদের

১. অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশাচার'

২. রাখালদাস ভট্টাচার্য, 'স্বাধীন জেনানা', ১৮৮৬

'একটী কথা'-তে লেখক বলেছেন—"কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রহসন দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, যে সকল ভণ্ড পাষণ্ড উন্নতি ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পবিত্র হিন্দুসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিতেছে, তাহাদের নিমিত্ত এই মুষ্টিযোগের আবশ্যক। তথাপি যদি কেহ গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইতে চাহেন তবে গ্রন্থকার বলেন, 'সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।'"

মতিগতি ফেরাতে হবে।[৩] প্রহসনকারেরা কোনও কোনও প্রহসনে পুরুষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে পরমার্শ দিয়েছেন। কোথাও বা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই বুঝিয়ে পাশ্চাত্য রীতি বর্জন করে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন, কোথাও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বাড়াবাড়ির জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন, বা আমাদের সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতিনীতির ভেদ দেখিয়ে নব্যরীতিকে বিসর্জন দিতে বলেছেন। এককথায় ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি মেয়েরা কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছিল তার হাস্যকর চিত্র তুলে ধরে এঁরা সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করার অধিকার গ্রহণ করেছেন। রক্ষণশীল প্রহসনকাররা এখানেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে "শিক্ষিতা স্ত্রী বেশ্যারই নামান্তর" এমন মন্তব্য করেছেন। অধিকাংশ প্রহসনেরই কিন্তু সাহিত্যমূল্য নেই। তথাপি জনসাধারণ এ আন্দোলনকে কিভাবে নিয়েছিল, প্রহসনগুলির অভিনয়ে মঞ্চসাফল্য ও সমকালীন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত নাটক ও প্রহসন লেখা হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম প্রকাশকাল-সহ উল্লেখ করছি :

ক্ষেত্রমোহন ঘটক	'কামিনী'	১৮৬৯
জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার	'সুধা না গরল'	১৮৭০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	'কিঞ্চিৎ জলযোগ'	১৮৭২
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	'স্বর্ণলতা'	১৮৭৩
কেদারনাথ মণ্ডল	'পাপের প্রতিফল'	১৮৭৫
অজ্ঞাত	'মেয়ে মনস্টার মিটিং'	১৮৭৫
যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	'ইহারই নাম চক্ষুদান'	১৮৭৫
কানাইলাল সেন	'কলির দশ দশা'	১৮৭৫
রাধামাধব হালদার	'এই কলিকাল'	১৮৭৫
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	'খণ্ডপ্রলয় বা পঞ্চরং'	১৮৭৮
"	'মুই হাঁদু'	১৮৯৪
"	'আচাভূয়ার বোম্বাচাক'	১৮৮০
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	'পাঁচ পাগলের ঘর'	১৮৮০
অমৃতলাল বসু	'বিবাহ বিভ্রাট'	১৮৮৪
"	'তাজ্জব ব্যাপার'	১৮৯০
"	'বৌমা'	১৮৯৭
অজ্ঞাত	'কলির মেয়ে বা নব্যবাবু'	১৮৮৫
রাখালদাস ভট্টাচার্য	'স্বাধীন জেনানা'	১৮৮৬
"	'সুরুচির ধ্বজা'	১৮৮৬
"	'রুক্মিণী রঙ্গ'	১৮৮৭
অজ্ঞাত	'ছোট বৌর গুপ্ত প্রেম'	১৮৮৬

৩. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ন', বৈশাখ ১২৯২

রাধাবিনোদ হালদার	'দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ'	১৮৮৭
অতুলকৃষ্ণ মিত্র	'গাধা ও তুমি'	১৮৮৯
"	'কলির হাট'	১৮৯২
সিদ্ধেশ্বর রায়	'বৌবাবু'	১৮৮৯
বিপিনবিহারী দে	'অবলা কি প্রবলা'	১৮৮৯
উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	'পাম করা আদুরে বৌ'	
কেদারনাথ মণ্ডল	'বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাশা'	১৮৯৪
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	'আক্কেল সেলামী বা উদ্ভট মিলন'	১৮৯৫
এস.বি. পাল	'মাগমুখো ছেলে'	১৮৯৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	'পাঁচ কনে'	১৮৯৬
দুর্গাদাস দে	'ছবি বা বড়দিনের পঞ্চরং'	১৮৯৬
"	'মিস্ বিনোবিবি, বি-এ'	১৮৯৮
"	'ল-বাবু'	১৮৯৮
সিদ্ধেশ্বর রায়	'লণ্ডভণ্ড'	১৮৯৬
অহিভূষণ ভট্টাচার্য	'বোধনে বিসর্জন'	১৮৯৬
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	'কষ্টিপাথর'	১৮৯৭
হরিদাস ভট্টাচার্য	'মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা থেকে ডুবে মরা'	১৮৯৭
পঞ্চানন রায়চৌধুরী	'আমার ঝক্‌মারীর মাশুল'	১৮৯৮ ইত্যাদি।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ কিরূপ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, উল্লিখিত তালিকা থেকে তা অনুমান করা সম্ভব হবে। এখানে আমরা কয়েকটি নাটক ও প্রহসনের সাহায্য নিয়ে বিষয়টির প্রতিফলন সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আধুনিক হওয়ার মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতির চিত্র অঙ্কন করে ক্ষেত্রমোহন ঘটক 'কামিনী' (১৮৬৯) নাটকে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন।

নাটকটির কাহিনী অংশে দেখি, সংস্কারমুক্ত উদয়রাম তাঁর মেয়েকে ছোটবেলা থেকে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মদ্যপানের অভ্যাসও করিয়েছেন। মদ্যপানে গৃহিণীর আপত্তিতে তিনি বলেন, "আহা! ভাল জিনিস ছেলেপুলেকে না দিয়ে কি খেতে আছে।" প্রতিবেশীরা এতটা সংস্কারমুক্তি সহ্য করেনি। কাজেই সবাই তাকে একঘরে করেছে। কামিনীর বিয়ের বয়স হল কিন্তু বর জোটে না। শেষপর্যন্ত কেবলরাম নামে এক অশিক্ষিত কুলীন পাত্রে তার নামমাত্র বিয়ে হয়। বিয়ের পর কামিনী পিতৃগৃহেই থাকে। মদ্যপা কামিনী অতি সহজেই প্রতিবেশী মুনসেফ মিহির ঘোষালের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয় এবং যথারীতি গর্ভবতীও হয়। কেবলরাম অশিক্ষিত হলেও কুলীন বলে গর্ব ছিল। একদিন কামিনী তার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও রাতে একা প্রকাশবাবুর সঙ্গে মুজরা শুনতে যায়। প্রকাশের শয়নগৃহে প্রকাশের স্ত্রী মোক্ষদা ছাড়াও মিহিরের স্ত্রী সারদা এবং কামিনীও আসে। মদ্যপানে উন্মত্তা কামিনী হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে নাচগানের আসরে ঢুকে

পড়ে—একটা হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটায়। নেশা কাটলে অনেক রাতে পালকিতে করে কামিনী গৃহে ফেরে। সকলের সামনে সে নিজেকে অপদস্থ করেছে। জীবনের প্রতি তার ধিক্কার জন্মে। অনুশোচনায় দগ্ধ কামিনী সেইদিনই আত্মহত্যা করে। একটা চিঠিতে জানিয়ে যায়, "ছোটোবেলা থেকে পোর্ট ওয়াইন খাইয়ে খাইয়ে বাবা তার সর্বনাশ করে গেছেন।"

কামিনীর চারিত্রিক অবনতির মূলে লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই মাত্র দায়ী করে নাট্যকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি। যদিও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, উদয়রামের স্ত্রীর বক্তব্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে, "বলি কামিনী! হ্যালো, এই কি তোর লেখাপড়া শেখার ফল! এত যে শিখলি সব কি ভস্মে গ্যালো।"[৪] শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজ যে ইতিমধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় রয়েছে।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের হালচাল, রীতিনীতিও বদলাচ্ছে, তা প্রবীণদের দৃষ্টি এড়ায়নি। নাটকটিতে বর্ণিত কৃষ্ণমোহনের বক্তব্যে তা ফুটে উঠেছে, "আগেকার হাউড়ো মাগিগুলো পাশা, শাঁখা, বাঁকমল পরে কর্তাদের ভোলাতো, এখন সে সকল প্রায় দেখা যায় না, উল্‌কীর সৌন্দর্য্য লোকের মন থেকে প্রস্থান করেছে, মিসি দাঁতে দেওয়াটা দেখতে দেখতে উঠে গ্যাল।"[৫] এ প্রসঙ্গে গোপালবাবুর সরল উত্তরও উপভোগ্য, "যে এপিডেমিক, আর মদের দৌরাত্ম্য হয়েছে। দিনে দিনে যেমন আমাদের আচার, আহার বেশবিহার বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে মাগীদের ফ্যাসন বদলে আস্‌চে।" এমনকি রক্ষণশীল পূর্ববঙ্গেও নব্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মারাত্মক বিস্তৃতির কথা এই নাটকে সারদা ঝুম্নোর মুখে শুনতে পাই। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা অপেক্ষাকৃত সভ্য, একথার প্রতিবাদে ঝুম্নো জবাব দেয়, "পূর্ববঙ্গের কারা, বাঙ্গালনীরে! ছাই, পোড়া কপাল আর কি? শুনেচি কারা নাকি সাহেবের সঙ্গে বসে খানা খেয়েছে, আবার নাকি মিসি উলীদের মত ঘাঘরা পরা হয়েছিল, গলায় দড়ি।"

রক্ষণশীল সমাজের মুখের কথাটিই যেন নাট্যকার কেড়ে নিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার নামে কিভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 'খণ্ডপ্রলয় বা পঞ্চরং' (১৮৭৮) প্রহসনে তা দেখিয়েছেন। নাটকটির প্রথমে একটি গানে নাট্যকারের সে উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছে :

"বিদেশী বেয়াড়া চালে, হিঁদুয়ানী রসাতলে,
দিলে যত হিন্দু নর নারী।
হ'ল সব একাকার, জাত কুল বাঁচা ভার,
এ বিপদে রাখ হে মুরারি।"

কাহিনী অংশে দেখি, ধনী রামশঙ্করের কন্যা তরুবালা। সে শিক্ষিতা। মেয়ে ও পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সে যথেচ্ছভাবে মেলামেশা করে। রামশঙ্করের দেখাদেখি প্রতিবেশী তর্কালঙ্কার ও আরও দু-একজন তাঁদের কন্যাদেরও ইংরেজি শিখিয়েছেন। কাজেই তরুবালা একা নয়। তার ইয়ারদের মধ্যে আছে শৈলবালা, মাতঙ্গিনী, শরৎকুমারী ও

৪. ক্ষেত্রমোহন ঘটক, 'কামিনী', সং ১২৭৫, পৃ. ৩৯
৫. ঐ, পৃ. ৮

ভাগ্যধরী। কলেজ স্কোয়ারের সামনে তারা এসে গান গায়,

"আমরা বড় মজা পেয়েছি।
ইম্যান্‌সিপেশনের জোরে স্বাধীন হয়েছি।"[৬]

এরা দাবি করে, 'জেনানা সিস্টেম' এরা উঠিয়ে দিয়েছে। এদের দলের ভাগ্যধরী চৌধুরী একজন এনলাইটেণ্ড লেডি। ঢাকা লিবার্টী ম্যাগাজিনের এডিটর। তিনি এনলাইটেণ্ড লেডিদের জন্য একটা স্বতন্ত্র পার্ক ও সুইমিং বাথ তৈরি করার চিন্তা করেন। মেয়ের গতিবিধি দেখে রামশঙ্কর চিন্তায় পড়েন এবং তর্কালঙ্কারের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তর্কালঙ্কারেরও ক্ষোভ কম নয়, তাঁর মেয়ে মাতঙ্গিনীও স্বাধীনা। ওদিকে ধর্মতলার মোড়ে তরুবালা তার ইয়ারদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে পথ চলে :

"আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে,
চুরুট মুখে ছড়ি হাতে।
মিন্‌সেগুলো অবাক হয়ে মুখের পানে দেখ্‌চে চেয়ে
আমর মর পড়লো বুঝি পথে।"

এমন সময় বেয়ারা এসে ভাগ্যধরীকে একটা চিঠি দেয়। ভাগ্যধরী বন্ধুদের জানায়, সে চিকাগোতে যাচ্ছে, সঙ্গে মিঃ রায়ও আছেন। যথাসময়ে মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, ভাগ্যধরী, শরৎকুমারী আর কে রায় জাহাজে চড়ে বসে। তর্কালঙ্কার গঙ্গার ঘাটে এসে মেয়েকে ফেরাতে না পেরে পুলিসের শরণাপন্ন হয়েও ব্যর্থ হন। প্রতিবেশী তাঁকে বলেন, "কেমন হয়েছে তো? বড় যে আস্বা কোরে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন? এখন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্কর হল যে।" তর্কালঙ্কার বলেন, "তাই ত হে ঘোষজা মহাশয়, এ হ'ল কি? যাবার সময় এতে 'খণ্ডপ্রলয়' কোরে চল্লেন, আর ফিরে এসে মহাপ্রলয় না করলে বাঁচি।"[৭]

রক্ষণশীল নাট্যকার স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিকারের রূপ দেখিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত পথ কী, সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত দেননি। অর্থাৎ নাট্যকার সমালোচকের ভূমিকা মাত্র গ্রহণ করেছেন, সংস্কারকের কর্তব্য পালনের কোনও প্রয়াস দেখাননি। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের সমকালীন মনোভাবের পরিচয় পাই 'অনুসন্ধান' পত্রিকার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে :

"পাশ্চাত্য সভ্যতার অমোঘ অস্ত্র দুইটী স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই দুই অমোঘ অস্ত্র যে সমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিতে হইবে। অগ্নিদাহের সময় যেমন সমস্ত দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই স্তূপাকার ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সেইরূপ স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা যে সমাজে প্রবেশ করিবে, তাহাকে সহসা বিলাস বিশ্রমাদির বাহ্যিক চাকচিক্যে উজ্জ্বল করিবে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবে তাহার সার পদার্থ ধর্ম ও নীতি প্রভৃতি ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজের পুরুষ জাতি যেরূপ ধর্মভ্রষ্ট

৬. শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 'খণ্ডপ্রলয়'। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু কর্তৃক প্রকাশিত, সং ১৩০০, ১ম দৃশ্য, পৃ. ১

৭. ঐ, ৭ম দৃশ্য, পৃ. ২৯

বিলাসী স্বার্থপর ও স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইয়া উঠিতেছেন, রমণীগণ যে অনুরূপ হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?"[৮]

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীসমাজে অনুষ্ঠিত প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন হচ্ছে, পূর্বোক্ত নাটকের তর্কালঙ্কারের বক্তব্যে তার পরিচয় পাই।

"তর্কালঙ্কার। ইতর ভদ্দোর ঘরে তবেকানী মেয়েগুলো আমোদ করে যমপুকুর, পুণ্যিপুকুর, সেঁজাতির ব্রত করতো, এখন সেগুলো উঠে গিয়ে বই শ্লেট নিয়ে ঝীয়ের সঙ্গে দলে দলে স্কুলে যায়, সেটাও ত একবার মুখে এল না। ফল গচানে, ধন গচানে, কলা ছড়া প্রভৃতি ব্রত করবার জন্য মেয়েগুলো দোরে এসে ব্রাহ্মণদের জন্য গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সেগুলোও কি এখন দেখতে পাও।" (দ্বিতীয় দৃশ্য। পৃ. ৪)

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে স্ত্রীসমাজ সচেতন হয়ে উঠেছে, রক্ষণশীল প্রহসনকারের এ উদারতাটুকুও অবশ্য কম উল্লেখযোগ্য নয়। রামশঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনে এর পরিচয় পাই :

"রামশঙ্কর।...তোমার ভুলকুনিতে ভুলে ভেকো বোনে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে সর্বনাশ করেছি।

পদ্মাবতী। আমার দোষ কি বল? সকল বড় মানুষের মেয়ে আজকাল স্কুলে যায়, তাই আমি তরুকে পাঠিয়েছিলাম, আমাদের কপাল হতে এমন হবে তা কেমন কোরে জানব?" (পঞ্চম দৃশ্য। পৃ. ১৫)

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীসমাজের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হলেও, পুরুষসমাজের বিকৃতরুচিকেই অনেকে এর জন্য দায়ী করেছেন। রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন জেনানা' (১৮৮৬) প্রহসনটিতে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'একটি কথা'তে লেখক বলেছেন, "কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রহসন দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তবে একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে, যে সকল ভণ্ড পাষণ্ড উন্নতি ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পবিত্র হিন্দুসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিতেছে তাহাদের নিমিত্ত এই মুষ্টিযোগের আবশ্যক। তথাপি যদি কেহ গায়ে পড়িয়া লইয়া বিবাদ বাধাইতে চাহেন তবে গ্রন্থকার বলেন, "সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।"[৯]

নেপালের পত্নী হেমাঙ্গিনী শিক্ষিতা ও স্বাধীনা। নেপালের উৎসাহ ও চেষ্টায় তিনি স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়াশোনা করেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'Equality of right'-কে মূল্য দিয়ে চলেন। নেপালের উৎসাহেই অবশ্য তাঁর এতখানি উন্নতি। তবে কালীপদবাবুর সঙ্গে যখন নেপালের স্ত্রী সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়, তখন নেপালের মন একটু খুঁতখুঁত করে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সে বিশ্বাস হারায় না। যেমিন ফাণ্ডের টাকা তছরূপ করেও সে স্ত্রীকে গয়না গড়িয়ে দেয়।

পুত্রবধূর গতিবিধি পিতামাতার কাছে অশোভন বলে মনে হয়, পিতা পুত্রের কাছে নালিশ করে তিরস্কৃত হন। পত্রিকা পরিচালনা করতে গিয়ে নেপাল ঋণগ্রস্ত হয়। পাওনাদারদের তাড়নায় নেপাল স্ত্রীর কাছে গয়না চাইলে স্ত্রী তা দিতে অস্বীকার করে

৮. 'অনুসন্ধান', বৈশাখ ১২৯৮

৯. রাখালদাস ভট্টাচার্য, 'স্বাধীন জেনানা', ১২৯২, একটি কথা, পৃ. ৯

এবং তার সামনেই তার বন্ধু কালীপদবাবুর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়ে যায়। নেপাল জোর করে গয়না নিতে গেলে Female-এর 'Sacred body assalt' করলে তার বিরুদ্ধে চার্জ আনবে জানায়। ইতিমধ্যে কালীপদবাবু এসে তাঁর 'Female friend'-কে অসভ্য নেপালের হাত থেকে উদ্ধার করে নিরুদ্দেশ হয়। নিরুপায় নেপাল আক্ষেপ করে, "উঃ, স্ত্রীস্বাধীনতার ফল কি বিষময়! ব্যাপিকা রমণীর শিক্ষা কুহকে পড়ে কি লাঞ্ছনাই ভোগ কল্লেম।" (পৃ. ৩৪)

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের রুচিবিকৃতি অনেককে ভাবিয়ে তুলেছিল, কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল যে মেয়েদের পক্ষে শুভ হবে না একথা চিন্তা করে একশ্রেণীর মানুষ এর বিরোধিতা করেছিলেন। সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধিতা করে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লেখে,

"আমরা দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা সত্বর হিন্দুরমণীর শিক্ষা সম্বন্ধে একটা কর্তব্য অবধারণ করবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষে হিন্দুর গৃহে কি প্রকার অশান্তির আলয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর হিন্দু সন্তানকে বুঝাইতে হইবে না। অতএব এই সময় সকলে সাবধান হইবেন, এই একমাত্র প্রার্থনা।"[১০]

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের এ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে নেপালের পিতার বক্তব্যে, "সেই সময়ই দশজনে বারণ করেছিল যে, ওরকম লেখাপড়া শেখা বিবিয়ানা মেয়ে ঘরে এনো না--তখন দশজনের কথা শুনলেম না, বেটীর বাপের ফুকোয় পড়লেম, এখন তার ফলভোগ করি।"

শিক্ষার নামে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার অনুরূপ চিত্র পাই লেখকের 'রুক্মিণী রঙ্গ' (১৮৮৭) নামে অপর একটি প্রহসনে। তবে এ প্রহসনে লেখক শিক্ষিতা নারী রুক্মিণীকে তার কুকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন। এটাই এ প্রহসনের নতুনত্ব।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা রুক্মিণী বিবাহিত স্বামীকে উপেক্ষা করে অনাচারে লিপ্ত হয়। পিতার প্রশ্রয়ে এর মাত্রা বেড়ে চলে। বন্ধুদের কাছে রুক্মিণী তার স্বামীর বর্ণনা দেয়, "A skeleton emaciated dog. কতকগুলো হাড়ের বোঝা দিদি। কাছে শোও তো টের পাও। তার গায়ে যে হতভাগাটার চাম্‌সে গন্ধ যেন dryfish a nasty bat.....ওয়াক্ থু থু।" দিনেশের ওপর রুক্মিণীর খুব টান। বিবাহবিচ্ছেদ করে দিনেশকে বিয়ে করাই রুক্মিণীর ইচ্ছে। আইনসম্মত ব্যবস্থার জন্য দিনেশ এ ব্যাপারে ল-ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে। রুক্মিণীর স্বামী হাঁদা আপসের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং আদালতে নালিশ করে। রুক্মিণীর অ্যাংলো বন্ধুরা এ ব্যাপারে তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে পরামর্শ দেয় এবং উন্নতিশীল দল তার কার্যকলাপের প্রশংসায় মত্ত হয়। এমন সময় পুলিস এসে রুক্মিণীকে গ্রেপ্তার করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রুক্মিণীর চৈতন্য হয়। অনুশোচনায় দগ্ধ রুক্মিণী বলে, "হায়! ভারত মহিলার পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভান কি বিষম অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, আমার দূরদৃষ্টবশতঃ সেই অবলম্বনকে পরিত্যাগ করে ইহজীবনের সুখের পথে কণ্টক রোপন কল্লেম। এক্ষণে আমার পাপের যথোচিত

১০. 'অনুসন্ধান', ১৫ বৈশাখ ১২৯৮

প্রায়শ্চিত্ত হল। ভদ্রমহিলাগণ! আমার দৃষ্টান্ত দেখে সাবধান হও।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা চরমে উঠলে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হবে। পুরুষ থাকবে গৃহকোণে, নারী থাকবে বাইরে। অমৃতলাল বসু 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০) প্রহসনটিতে তেমন তাজ্জব ব্যাপার দেখাতে চেয়েছেন।

প্রহসনটির বিষয়বস্তুর জন্য অমৃতলাল বীরেশ্বর পাঁড়ের 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব' (১২৯৫) নামক গ্রন্থটির নিকট ঋণী।[১১] তবে সংলাপের ভাষা তাঁর নিজের। প্রস্তাবনায় বঙ্গনারীদের গানে স্ত্রীস্বাধীনতা এবং এর মূলে পুরুষের মতিভ্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়,

"ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে
দিয়েছি শিকল কেটে
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি
দখল কর জেনানা।"

এই নাটকের স্ত্রীলোকদের একজন হাইকোর্টে অ্যাপিলেট সাইডে ওকালতি করেন। শ্রীসরসীবালা ভঞ্জ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। অন্য একজন হাওড়া পুলিসের হেড কনস্টেবল ইত্যাদি। সভাগৃহে স্ত্রীলোকদের বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতা, অমৃতলালের ভাষার ওপর আধিপত্যের পরিচয়। গিরিবালার সাহেবি বাংলা ও অনঙ্গ-মঞ্জরীর ঢাকাই বাংলা বিশেষ উপভোগ্য। বঙ্গদেশে স্ত্রীস্বাধীনতার আধিক্য দেখে ভীত উড়িয়াদের কথোপকথন ও গান এবং গড়ের মাঠে ভলেন্টিয়ার রমণীদের ড্রিল, উলুবেড়ের হাটে গিয়ে গোয়ালা গিন্নির গোরু কেনা, গিন্নি মারা যাওয়ায় জেঠামশায়ের শুভকর্মের জিনিস না ছোঁয়া প্রভৃতি ঘটনা হাসির উদ্রেক করে। প্রহসনটির শেষে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য নাট্যকার পুরুষকে অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন :

"ঘাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ ৷৷
মাগীদের স্বাধীন করে এখন যেন ম্যাড়ালড়ে,
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উল্টো চাপ।"

১৮৮৯-এ ১ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রথম অভিনীত হয় এবং পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় অভিনীত হয়। ১২৯৭ সালে প্রথম সংস্করণের পর ঐ একই বছরে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, একশ্রেণীর রক্ষণশীল মানুষের কাছে উনিশ শতকের শেষ দশকেও গ্রন্থটির যথেষ্ট সমাদর ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীসমাজের শালীনতা, রুচি ও দেশাত্মবোধ নষ্ট করেছে— কেদারনাথ মণ্ডলের 'বেহদ্দ বেহায়া' (১৮৯৪) প্রহসনটিতে তা প্রতিফলিত নারীদের মুখে একটি গানে—

১১. ড. অরুণকুমার মিত্র, ' বসুর জীবনী ও সাহিত্য', সং ১৯৭০, পৃ. ৪৭

"আমরা সবাই, গড় করি ভাই, এঁদের আক্কেলে।
এঁদের বিগ্‌ড়েছে চাল্, রাখবে না হাল্ কিছুই সেকেলে।"

প্রগতিশীল সংস্কারকদের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। নামকরণের মধ্যেও নাট্যকারের বিরূপ মনোভাব লক্ষণীয়।

শিক্ষিতা কৃষ্ণভাবিনী, মেয়েদের বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শারীরচর্চার প্রয়োজনও উপলব্ধি করে। রক্ষণশীল পিতা মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে রেগে যান। কিন্তু তাঁর অফিসের সাহেব হেসে বলেন, "বাবু it is very laudable idea indeed".......কৃষ্ণভাবিনী স্কুলে ডান্স শেখে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডান্সিং মাস্টারের প্রেমে সে পড়ে। ডান্সিং মাস্টার সাহেবদের প্রশংসা ও নেটিভদের নিন্দা করলে কৃষ্ণভাবিনী তাতেই সায় দেয়। কৃষ্ণভাবিনীর ঠান্‌দি এতকাল কাশীতে ছিলেন। সদ্য এসে নাতনিদের হালচাল দেখে তিনি বাপের আক্কেলকে দোষারোপ করেন। ডান্সিং মাস্টারের প্রতি কৃষ্ণভাবিনীর দুর্বলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। পড়াশুনার সঙ্গে মেয়েদের শারীরচর্চাও চলতে থাকে। পাড়ার মেয়েদের হালচাল দেখে প্রবীণরা অবাক হয়ে যান। তাঁরা এজন্য নব্য-বাবুদেরই দোষারোপ করেন। এমন সময় স্ত্রীলোকদের ব্যায়ামচর্চা ও জাতিনির্বিশেষে বলবান স্বামী নির্বাচনের জন্য রবিবারে পার্কে 'রাক্ষসী সভা'র অধিবেশন হবে এ মর্মে একজন হ্যাণ্ডবিল বিলি করে। নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি মিটিং চলে। সমর্থকালে বিবাহ, বলবান স্বামী জাতিনির্বিচারে নির্বাচন, স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদি নিয়ে মিস্ গাঙ্গুলী বক্তৃতা দেন। রাক্ষসী সভার সব সভ্যই সেখানে উপস্থিত থাকে। পাড়ার কতিপয় প্রবীণ ষড়যন্ত্র করে আগে থেকে গুণ্ডা ঠিক করে রাখেন। এরা মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। মিটিং শেষ হল, এবার স্বামী নির্বাচনের পালা। এমন সময় গুণ্ডারা ঢুকে পড়ে এবং মেয়েদের টানাহেঁচড়া করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। 'মুখের গরাস মুখে দিলাম কই' বলে মেয়েরা খেদ করে।

শিক্ষার আলোকবর্জিত রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজ স্ত্রীশিক্ষাকে কিভাবে দেখেছিল ঠান্‌দির বক্তব্যে তার পরিচয় পাই। নাতনি বিধুমুখীর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলোচনা চলে। বিধুমুখী জানায়,

"নাচগান একটা বিদ্যা, তাই আমরা শিখি। তুমি জান না, বিলাতে যে মেয়ে নাচগান জানে না, তার সহজে বিয়ে হয় না।

ঠানদি। বিলেতে কি হয় না হয়, তার এখানে কি? এই যে ওই মুহুর্য্যেদের পো, সেই যে আমার ভাসুরের নাম, ধরতে নেই, তিনি চারিটি মেয়ের পুট্ পুট্ করে বিয়ে হয়ে গেল। কৈ তারা নাচতে গাইতে জানে না বলে ত, আর আটকে রৈল না। তাদের বড় মেয়েটি আমাদের কিষ্টির চেয়েও ত ছোট, দুটা ছেলে হয়েছে আবার পোয়াতী।"[১২]

নীতিগতভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও শিক্ষিত মেয়েদের আচার-আচরণে অনেকে ভীত হয়ে পড়েছিলেন ; হরিহর ও পণ্ডিতমহাশয়ের কথোপকথনে তার পরিচয় পাই :

"হরিহর। (পণ্ডিতমহাশয়কে)। এই দেখুন না, স্ত্রীশিক্ষা অতি উত্তম, স্বীকার করি, কিন্তু এখনকার শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের দেখলে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়।

১২. কেদারনাথ মণ্ডল, 'বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাশা', সং ১৩০০, পৃ. ৯

...দুনিয়ার কাকেও গ্রাহ্য করেন না, লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছেন, গাড়ী চড়ে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, ঘরে বসে গুরুজনের সামনে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন। আল্তাপরা মলপরা, তুলে দিয়ে মোজা এঁটে বুট পায় দিয়ে হুট্ হুট্ করে বেড়াচ্ছেন, কারপেট বুনছেন, আর শুয়ে পড়ে বই পড়ছেন। পরিশ্রমের নামটা করতে চান না। রাঁধা বাড়া, পাঁচজনকে দেওয়া থোয়া, এসব দেখলে তাদের গায়ে জ্বর আসে।" (পৃ. ১৮)

দেশীয় আচার ও রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষা, সেটাই আদর্শ শিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের শুরু থেকেই এ নিয়ে সংস্কারকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য মতাদর্শে বিশ্বাসী একদল প্রগতিশীল যুবক চাইলেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্য আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে, অপর একদল মধ্যপন্থা অবলম্বন করে দেশীয় রীতিনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানের কথা বললেন। স্ত্রীশিক্ষার রীতিপদ্ধতি নিয়ে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে এ বিরোধ উনিশ শতকের নব্বই-এর দশকেও সমাজে প্রবল ছিল, সমকালীন পত্রপত্রিকায় তা আজও চোখে পড়ে।

"আজকাল অনেক পাশ্চাত্য সভ্যতাভিলাষী যুবকেরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আগাগোড়া ভাঙিয়া চুরিয়া উহা ইউরোপীয় বা ইংরেজি ধরনে নূতন করিয়া গড়িতে চান। উহার কমে তাঁহাদের মন উঠা ভার। কিন্তু ফ্রাইং প্যানে লুচি ভাজায় যেমন ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, ইউরোপীয় বা ইংরেজী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারতীয় সমাজ নির্মাণের চেষ্টা পাইলে সেইরূপ পরিশ্রমের অপব্যয় করা হইবে।"[১৩]

সাংসারিক জ্ঞানে ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। একথা জানিয়ে নব্যবাবুদের পাস করা স্ত্রীর মোহ ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'পাঁচ কনে' (১৮৯৬) প্রহসনে। নাট্যকারের এ বিষয়ক বিদ্রূপের কিছু অংশ মূল নাটক থেকে উদ্ধৃত করছি :

"Entrance না পাশ কল্লে কেউ কুটনো কুটতে পাবে না, L.A. না পাশ কল্লে রাঁধতেও পাবে না, B.A. না পাশ করে রাঁধতে পাবে না, কুটনোও কুটতে পাবে না। M.A. পাশ কল্লে হাওয়া খেতে যাও, আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া 'Compulsory.'" (তৃতীয় দৃশ্য)

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে দুর্গাদাস দে-র 'ছবি বা বড়দিনের পঞ্চ রং' (১৮৯৬) প্রহসনে। প্রহসনটিতে স্ত্রী-চরিত্রগুলির নামকরণে শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি নাট্যকারের তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়।

মিস্ বঙ্কিম বিনোদিনী B.A. (Hon) ডেপুটি দুহিতা
মিস্ প্যাঁজকলি তরফদার B.A.M.B. (Midwife)
মিস্ বিগনোলিয়া বড়ুয়া B.A.Bc. এন্জিন ড্রাইভার
মিস্ সুস্নীলতা সাধুখাঁ M.A.B.L. (Ex-Atorney at Law).

এ প্রহসনের নায়িকা ডেপুটি কন্যা মিস বিনোদিনী বি.এ. অনার। পিতা নদেরচাঁদ ভেবেছিলেন লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়েকে মানুষ করতে পারলে ভবিষ্যতে বিনা পণেই কন্যার বিয়ে দিতে পারবেন। এ চিন্তা করে তিনি টাকাপয়সা খরচ করে কন্যা

১৩. শ্রীকৃষ্ণভামিনী দাস, 'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৭

বিনোদিনীকে বি.এ. অনার পাশ করান। কন্যার শৌখিনতা বজায় রাখতেও তাঁকে যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। বিনোদিনী নভেল পাঠ করে নিজেকে নভেলের নায়িকা বলে মনে করে এবং পতি নির্বাচনে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায়। বিশেষ করে পিতার নির্বাচিত কোনও অপরিচিত যুবককে এককথায় পতিরূপে গ্রহণ করতে সে আপত্তি জানায়। অনেক কষ্ট করে নদেরচাঁদ রামদাস নামে এনট্রান্স পাশ করা যুবককে রাজি করে। রামদাসের পিতা কালাচাঁদ অত্যন্ত অর্থলোভী। তিনি জানান, ডেপুটি কন্যা হোক আর সাধারণ কন্যা, হোক শিক্ষিতা অশিক্ষিতা, তিনি জানতে চান না, পণের টাকা তাঁর চাই-ই। শেষে নদেরচাঁদ তাতেই রাজি হলেন। কিন্তু আক্ষেপ করে বলেন, "মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখালেম, বড় করে রাখলেম, তবু টাকা খরচ।"

বিনোদিনী নভেল পড়ে নিজেকে হিরোইন ভাবে। বিয়ের খবর পেয়ে আক্ষেপ করে বলে, "প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ হলো না, বিবাহ হলো না, যাতনা হলো না, আমার হিস্টিরিয়া হলো না, আমার সহজ বিবাহ হবে।" ঠাকুরমা ভেবে অবাক হন, তিনি সেকেলে মানুষ। নাতনির কাণ্ড দেখে তিনি দুঃখ করে বলেন, "তখন ত বলেছিলুম মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখান কিছুই নয়। নদেরচাঁদ তো শুনলে না। কেবল বল্‌তো ঠাকুরমা লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে রাখলে বে-র সময় টাকা লাগবে না। তা এখন কি আর সে কাল আছে, এখন ওজন করে টাকা নেয়, মেয়ের বাপকে পথের ভিখিরি করে। এখন দেখছি নদের এ কূলও গেল, ও কূলও গেল।"[১৪]

জিম্‌ন্যাস্টিক গ্রাউণ্ডে জিম্‌ন্যাস্টিক বেশে প্যাঁজকলি সুস্‌নীলতা, দাদখানি, পমেটম ইত্যাদি উচ্চশিক্ষিতারা ব্যায়াম করে। মিস্ বিনোদিনী ছুটতে ছুটতে এসে তার বিপদের কথা জানায়। এরা বঙ্কিম বিনোদিনীকে এ বিয়েতে কনসেন্ট দিতে নিষেধ করে। বঙ্কিম বিনোদিনী হিরোর জন্য আক্ষেপ করে, "আমায় জগৎসিংহ দাও, নয় চন্দ্রশেখরকে দাও, নয় প্রতাপকে দাও, আর যদি জীবিত হিরো দাও, তবে হেমচন্দ্রকে দাও, নয় রবীন্দ্রনাথকে দাও, নয় অক্ষয়চন্দ্রকে দাও, নয় চন্দ্রনাথকে দাও। আমার ভাগ্যে রামদাস। রামদাসের কথা ভাবতে ভাবতে সে মূর্চ্ছা যায়।" সবাই মিলে তার মূর্চ্ছা ভাঙায়।

বিবাহবাসরে রামদাস কনে ও তার সঙ্গিনীদের হালচাল দেখে বশ্যতাস্বীকার করা শ্রেয় বিবেচনা করে। রামু জানায়, সভ্য হওয়ার জন্য সে চব্বিশ ঘণ্টাই এদের কাছে থাকতে রাজি, যদি এদের হজব্যাণ্ডরা আপত্তি না করে। দাদখানি তখন বলে ওঠে, "সেরকম হজব্যাণ্ড আমরা লাইক করি না, আর সেরকম হজব্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিক্‌সও করি না। হজব্যাণ্ড অবাধ্য হবে না, হজব্যাণ্ড ফারনিচারের মত থাকবে যেখানে সাজিয়ে রাখবো সেইখানেই থাকবে।" রামদাস ইচ্ছে করে নভেলি ঢঙে কথাবার্তা বলে। কনে বঙ্কিম বিনোদিনী একটু আশ্বস্ত হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর চাল বজায় রাখতে রামদাস ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দেনার দায়ে জেলে যায়। বিনোদিনীর এতে চোখ খোলে, সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। অনুশোচনায় দগ্ধ বিনোদিনী বলে, "আমি শিক্ষার দোষে সমাজের আচার ব্যবহার ত্যাগ করে বিবিয়ানা করে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি ও দিয়েছি, ভগবান কি আমাকে মার্জনা করিবেন।" পিতা নদেরচাঁদ দুঃখ করে বলেন, "আমি

১৪. দুর্গাদাস দে, 'ছবি বা বড়দিনের পঞ্চ রং', সং ১৩০৩, পৃ. ৯

সাহেবীয়ানা করে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, আমার নিতান্ত ইচ্ছা একবার তীর্থদর্শন করে আসি। এস আমরা তীর্থদর্শনে যাই।" প্রহসনটির শেষে বিদেশির মুখে দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রীতিনীতির প্রতি নাট্যকারের আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। (ইউরোপীয় কারাধ্যক্ষ্য) "...হিন্দুদের যে পুণ্যময় সংসার ক্ষেত্রে পুণ্যময়ী কুললক্ষ্মীদিগের যে মুখ চন্দ্র সূর্যও দেখিতে পায় নাই, আজ কিনা তাহারা আদালতে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ স্বামীর নামে অভিযোগ আনিতেছে।" (পৃ. ৭৫)

বিনোদিনীকে উপদেশ দেওয়ার মধ্যেও নাট্যকারের কণ্ঠই যেন শুনতে পাই। "বিবিয়ানা পরিত্যাগ কর, নিজ স্বধর্মে মতি রাখিয়া গুরুজনার প্রতি ভক্তি রাখিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ কর গে। আর এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হইও না।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কুফল প্রতিফলিত হয়েছে অমৃতলাল বসুর 'বৌমা' (১৮৯৭) নামে অপর একটি প্রহসনে। প্রহসনটিতে লেখক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষভাবাপন্ন স্ত্রীলোক, স্ত্রৈণ স্বামী, ভণ্ড সংস্কারক ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন।

ভণ্ড সংস্কারক বাবুরামের স্ত্রী কিশোরী শিক্ষিতা। বেলা ১১টার সময় ঘুম থেকে উঠে তৈরি চা পান করা তার অভ্যাস। ঝি না আসায় বাবুরামের মা বাসন মাজেন, ঘুম থেকে উঠে চা না পেয়ে কিশোরীর মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা। বাবুরাম বলে, "প্রিয়ে আমার খুব বীরাঙ্গনা তাই এখনও চা না খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য কোন অবলা হলে—।" বৌ-এর পক্ষ নিয়ে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং নিজেই চা করে খাওয়ায়। শাশুড়ি একবার বৌকে হেঁসেলে যেতে বলায় কিশোরী রেগে যায় এবং বলে, "আসুন আমার সঙ্গে আসুন, আলমারী খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কি হেঁসেলে গিয়েছিল।" প্রতিবেশী মতিলাল বিদ্রূপ করে বাবুরামের মাকে বলেন, "তিনি যেন দিনরাত পুত্রবধূকে সেবা করেন। বৌমারও ত আবার ছেলে হবে, তুমি এখন এসব না করলে উনি কার দেখে শিখবেন। শেষে ত ওকেও আবার একদিন ছেলের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে।"

বাবুরাম ও কিশোরীর দীক্ষাগুরু বামাদাস ও হিড়িম্বা। হিড়িম্বার অনুকরণে কিশোরী চব্বিশ ঘণ্টা নভেলের ভাষায় কথা বলে, নভেলের নায়িকার মতো ব্যবহার করে। নিজের কিশোরী নামটি বদলিয়ে সে রেখেছে উলাঙ্গিনী। পুত্র ও পুত্রবধূর হালচাল দেখে বাবুরামের মা অন্নপূর্ণা ভাবেন, নিশ্চয় পুত্রের মাথা খারাপ হয়েছে, সেইসঙ্গে পুত্রবধূর। কিন্তু কিশোরীর সহচরীদের আচরণও অনুরূপ, তাহলে কি সকলেরই মাথা খারাপ হয়েছে! তিনি হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। অপরের ওষুধ জাল করে নিজের নামে চালানোর অপরাধে বাবুরামের কয়েদবাস হয়। শেষ পর্যন্ত বাবুরামের মামা মতিলালের হস্তক্ষেপে বাবুরাম সে যাত্রা রক্ষা পায়।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকটি দিকের প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রহসনটিতে বর্তমান। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কাজেই নারীর শিক্ষাপ্রণালীও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। নারীকে পুরুষোচিত শিক্ষা দিলে তার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তত হবে, হিড়িম্বা চরিত্রটি পরিকল্পনার পেছনে নাট্যকারের সেই উদ্দেশ্যই বর্তমান।

হিড়িম্বা হিন্দুদের পূজায় বকশিশ দেয় না কিন্তু 'ঈদে' দেয়। জুতা ছিঁড়লে স্বামীকে

জিজ্ঞেস করে সে জুতা চিবায় কিনা! স্বামীর মুখের মাপে জুতার মাপ স্থির করে। স্বামী 'মাইরি' বললে অশ্লীলতার দায়ে তাকে কান মলতে বাধ্য করে। স্বামী স্ত্রীকে 'মায়ের অধিক মান্য' করবে এটাই সভ্যতা এবং কিশোরী প্রভৃতিকে সেই সভ্যতাই শিক্ষা দেয়। বামাদাস ও বাবুরাম উভয়ই স্ত্রৈণ। তবে বাবুরামের স্ত্রৈণতায় তার প্রতি ঘৃণা হয়, কিন্তু বামাদাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সহানুভূতি দেখা দেয়, মনে হয় স্ত্রৈণতা তার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র। যেমন হিড়িম্বাকে সে বলে,

"আমি কে—তুমি ছাড়া আমি কে? তোমার বলেই আমি সম্প্রদায়ের ভিতর কান্না তুলে দিয়ে বীররস প্রবেশ করিয়েছি। পঞ্চাশের পাঁচ তুলে নিলে যেমন শূন্যটির কোন মূল্য থাকে না, তেমনি হিড়িম্বা, তুমি যদি অধমকে ত্যাগ কর, তা হলে আমি একটি শূন্যের মত পড়ে থাকব, তুমি ইউনিট আমি জিরো।"

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের কর্মবিমুখতা ও উন্নাসিকতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কিশোরী চরিত্রে। নাট্যকার মতি মামার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। পুলিস ইনস্পেক্টরের সম্মুখে বাবুরাম ও কিশোরীর কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও তাদের চরিত্র সংশোধন প্রকারান্তরে নকলের প্রতি নাট্যকারের ঘৃণা এবং এর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়াস। তবে বাবুরাম ও কিশোরীর চরিত্র সংশোধনের জন্য মতিলালের দীর্ঘ বক্তৃতা, কঠোর উপদেশ ও কটু তিরস্কার প্রহসনের কৌতুকরসের মধ্যে বিরক্তিকর হয়েছে।

১৩০৩ সালের ১১ পৌষ (২৫.১২.১৮৯৬) স্টার থিয়েটারে 'বৌমা' প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল এবং অভিনয় চলাকালীন প্রহসনটির দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ হয়েছিল। অভিনয়ের দিন 'স্টেটস্‌ম্যান' 'বৌমা' সম্পর্কে মন্তব্য করে,

"It is certain to be a success, and it is a pity that the house cannot accomonodate a much larger audience. Infinite pains have been bestowed on this production."[১৫]

'Indian Daily News' স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'বৌমা' সম্পর্কে লেখে, "On Friday night this theatre was artistically illuminated and decorated with garlands and flowers and leaves. A prettier picture has seldom been presented by a native theatre. A modern society force, 'The wife' was for the first time put on the stage, before an exceptionally crowded audience and the piece went with spirit, the encores being numerous and enthusiastic."[১৬]

অমৃতলালের এ জাতীয় নক্‌শাগুলো কিভাবে সমাজের ভেতর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সমসাময়িক একটি চিত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি,

"স্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে 'বৌমা' নামক একখানি নূতন সামাজিক নক্‌সার অভিনয় হইতেছে। নক্‌সাকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু। বসুজ মহাশয় নক্‌সা আঁকিতে

১৫. 'The Statesman', 25.12.1896

১৬. 'The Indian Daily News', 29.12.1896

সিদ্ধহস্ত। রঙ্গসাহিত্যের এই অংশ এখন তিনিই রাখিয়াছেন। তিনিই এখন এই অংশের অধিনায়ক। অন্যান্য রঙ্গালয়ে যে সকল রঙ্গদার নক্‌সা অভিনীত হয়, তাহা অমৃতলালেরই আংশিক অনুকরণ,—তাঁহারই গ্রন্থের বিকৃত সংস্করণ—কিংবা তাঁহারই অমৃতময়ী উক্তির ক্ষীণ প্রতিষ্ঠান মাত্র। সুতরাং কালে অমৃতলালেরই জয়জয়কার হইবে,—বঙ্গসাহিত্যের এই অংশে তিনি অমর হইবেন।

নক্‌সায় আখ্যায়িকার অংশ খুব কম থাকে। যখন যে চিত্রটির অবতারণা করা হয়, তখন সেইটিই একটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা। অথচ সমগ্র গ্রন্থের সহিতও সেই চিত্রটির সূতার টান থাকে। চুল টানিলেই মাথা আসে। তুখোড় খেলোয়াড় অমৃতলাল, এক বৌমার চুলের মুঠী ধরিয়া সমাজের অনেকগুলি জীবকে নাচাইয়াছেন।... বড় দুঃখ, এ ছবি দেখিয়াও আবার লোকে হো হো করিয়া হাসে। এই চিত্র সর্বত্র অতিরঞ্জিত নহে, ইহা ভাঁড়ের তামাসা নহে। ইহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও তিতিক্ষার অনেক জিনিষ আছে। ইহা নব্য-বঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, সাহেবপুচ্ছধারী বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙালী নরনারীর মানসিক তত্ত্ব, আর ভণ্ড সমাজসংস্কারক 'অবলাবান্ধবরূপী' একটি অদ্ভুত জীবের নিখুঁত ফটো।...রঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গ সমাজ অমৃতলাল বসুর নিকট অনেক আশা রাখে। তিনি এখন লোক শিক্ষকের পদে আসীন।"[১৭]

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যুগের প্রয়োজনে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে সমাজের কোনও কোনও অংশে নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ পরিষ্কার হয়ে উঠে। স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য বা তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখার ফলে অনেকক্ষেত্রেই কিছু অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি দোষ শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে প্রকাশ পায়। সেই বিকৃতির জ্বালা, বেদনা, ক্ষোভ, বিরক্তি উপরি উক্ত প্রহসন, নাটক, নক্‌শা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ও স্বাধীনতার সম্প্রসারণের দ্বারা নারীসমাজকেও যে একটা বলিষ্ঠ শক্তিরূপে গড়ে তোলা যায়, প্রারম্ভিক মুহূর্তে তা স্বাভাবিকভাবে অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কাজেই এ প্রহসন ইত্যাদি থেকে একথা স্বীকার করা যাবে না যে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতা আমাদের সমাজে অমঙ্গলদায়ক এবং সেই কালে এ জাতীয় নাটক ইত্যাদি অভিনয়ে দর্শকের অভাব না ঘটলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে, নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার অগ্রগতিতে এ সমস্ত নাটকাদি প্রকৃতপক্ষে কোনও অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেনি বলেই নারীসমাজের বর্তমান অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে।

১৭. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, 'সন্দর্ভ সংগ্রহ', বৈশাখ ১৩০৫

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস (১৮৫০-১৯০০)

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিফলন রয়েছে বাংলা উপন্যাসে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম ও প্রকাশকাল এরকম :

সমর্থনে রচিত / বিরুদ্ধে রচিত

শিবনাথ শাস্ত্রী	'মেজবউ' (১৮৭৯), 'যুগান্তর' (১৮৮৫), 'নয়নতারা' (১৮৯২)
প্যারীচাঁদ মিত্র	'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)
ব্রজনাথ ভট্টাচার্য	'সরোজবাসিনী' (১৮৮৩), 'কনকনলিনী' (১৮৮৪)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪)
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত	'চিরসঙ্গিনী' (১৮৮৫)
স্বর্ণকুমারী দেবী	'স্নেহলতা' (১৮৯২), 'কাহাকে' (১৮৯৮)
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	'দুখানি ছবি' (১৮৯৮)
কেদারেশ্বর সেন	'স্মৃতিমন্দির' (১৯০০)

বিরুদ্ধে রচিত

'বাঁশরী' প্রণেতা	'নবদুর্গা' (১৮৮৪)
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬), 'বাঙালী চরিত' (১৮৮৬) 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬)
বীরেশ্বর পাঁড়ে	'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব' (১৮৮৮)
রাজকৃষ্ণ রায়	'অনুপমা' (১৮৮৯), 'বউবাবু' (১৮৮৯) ইত্যাদি।

উল্লিখিত উপন্যাসগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বেছে নিয়ে বাংলা উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিফলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৮৭৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম মেয়েদের বসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর মতো মানসিকতা তখনও সমাজে গড়ে ওঠেনি। স্ত্রীশিক্ষার যা কিছু অগ্রগতি তা সীমাবদ্ধ ছিল কতিপয় শহরবাসী ব্রাহ্ম ও হিন্দু পরিবারের মধ্যে।

শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে যাঁরা এর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৮-এর পরের বছর 'মেজবউ' (১৮৭৯) উপন্যাসটিতে লেখক বিষয়টিকে উপস্থাপিত করলেন। কাজেই এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা। স্ত্রীশিক্ষামূলক এ উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকাতে'[১] লেখক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন,

"গুরুজনের শুশ্রূষা, পতিসেবা, দাসদাসীদিগের প্রতি বাৎসল্য, অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যা, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সৌজন্য, এইগুলিই নারীগণের শিক্ষণীয় প্রধান সদ্‌গুণ। এইগুলিকে প্রদর্শন করিবার দুই একটি মাত্র চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।"

অবশ্য গ্রন্থটি রচনার পেছনে বাইরের তাগিদের[২] কথাও লেখক অন্যত্র উল্লেখ করেছেন।

প্রমদা এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে শিক্ষিতা, একান্নবর্তী পরিবারের রুচিসম্পন্ন কুলবধূও। উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমদার কয়েকটি দোষের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, যা প্রকারান্তরে তার গুণ সন্দেহ নেই।

প্রমদার প্রথম দোষটি সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, প্রমদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার ঘর, বিছানার চাদর ইত্যাদি পাড়ার বধূদের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। প্রমদার এ দোষের জন্য পাড়ার বধূরা তাকে ব্যঙ্গ করে 'বাবুবউ' 'বিবিবউ' ইত্যাদি সম্ভাষণ করে।

প্রমদা পড়াশুনা করতে ভালবাসে, লেখক এটিকে তার দ্বিতীয় দোষ বলে উল্লেখ করেছেন। বিয়ের পূর্বে পিত্রালয়ে যা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, বিয়ের পর নিজের আগ্রহে ও স্বামী প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় তার আরও উন্নতি হয়েছিল। তার ঘরেই পাড়ার বধূরা তাসের আড্ডা বসিয়ে হইহুল্লোড় করে অথবা পরচর্চা করে মধ্যাহ্নকালীন অবসর যাপন করে। সে সময়ে প্রমদা পড়ে কিংবা চিঠিপত্র লেখে এবং মধ্যে এক-আধটি পরিহাসের কথা বলে।

শিক্ষিতা প্রমদা শাশুড়ির চক্ষুঃশূল। তিনি তার আচার আচরণের মধ্যে বড়মানুষী চাল লক্ষ্য করেন। মার্জিতরুচি ও সদয় ব্যবহারের জন্য প্রমদা শ্বশুরের বিশেষ প্রীতিভাজন। মৃত্যুশয্যায় প্রমদাকে ডেকে শ্বশুর যে ক'টি কথা বলেছিলেন তা থেকে প্রমদার চরিত্রগত মাধুর্যের দিকটি ধরা পড়ে, স্ত্রীশিক্ষা যার মূল কারণ। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে তা উদ্ধৃত করছি :

"কর্তা! মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার বাড়ীর মধ্যে মানুষের মত! তুমি যদিও বয়সে বালিকা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রবীণার ন্যায়। মা, তোমার হাতেই ইহাদিগকে দিয়া গেলাম। সংসারটা যাতে ছারখারে না যায় তাই করো।" (৫ম পরিচ্ছেদ)

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'মেজবউ', ১৮৭৯, ভূমিকা।
২. ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণের অনুরোধে একটি পারিবারিক উপন্যাস রচনার দায়িত্ব তিনি পালন করলেন বাঁকিপুরের কাছে প্রকাশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অবস্থানকালে। এই ৮-১০ দিনের মধ্যে 'মেজবউ' নামক একখানি উপন্যাস লিখে কলকাতায় প্রেরণ করেন। দ্রঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', সিগনেট সং, পৃ. ১৬৭

উপন্যাসটির অপ্রধান চরিত্র বামার মধ্যেও লেখক স্ত্রীশিক্ষার শোভন রূপ চিত্রিত করেছেন :

"যে বামা কলিকাতায় থাকিতে চারি পাঁচ বৎসর পাকশালার দিকে যায় নাই, কেবল শিল্প সঙ্গীতাদি শিক্ষা ও পুস্তকাদি লইয়া থাকিত, সেই বামা আনন্দ চিত্তে দাদা ও বৌদিদির পরিচারিকার কার্যে ব্রতী হইয়াছে।" (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

স্ত্রীশিক্ষা সাংসারিক কাজকর্মের অন্তরায় নয়, বরং সহায়ক। শিক্ষার গুণেই বামার পক্ষে প্রয়োজনে সাংসারিক দায় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া এবং তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার পারিবারিক গুরুত্বের দিকটির প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উদ্দেশ্যমূলক এ রচনাটির শিল্পগত ত্রুটি সম্বন্ধে 'দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা'য় ১৮৮০ সালে লেখক বলেছেন :

"উপন্যাসে এখনকার পাঠকেরা যাহা চান তাহার কিছুই ইহাতে নাই।" লেখকের এ মন্তব্য সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর পাঠকের কাছেও এর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সমানই ছিল, গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ তার প্রমাণ।[৩] 'মেজবউ'-এর উপসংহার লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শান্তিমঠ'[৪] (১৮৮৭) নামে একটি উপন্যাস লিখে। এ থেকেও উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন সংস্কারপুষ্ট পরিবারের গণ্ডির মধ্যে নারীশিক্ষার সহজ স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—লেখকের 'যুগান্তর' (১৮৮৫) নামে অপর একটি উপন্যাসে।

তর্কভূষণ প্রাচীনপন্থী। তাঁর মতে, দশ বছর হতে না হতেই মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। কাজেই বাংলা পড়িয়ে লাভ কি? অথচ এই তর্কভূষণই শেষপর্যন্ত ভগ্নী বিজয়ার কথায় তার মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর পড়ার অনুকূলে মত দিয়েছেন। বিজয়া ও তর্কভূষণের এ প্রসঙ্গে কথোপকথনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বিজয়া। তুমি যে আমাকে এখানে থাকতে বলছো, সে বিষয়ে একটা কথা আছে। বিন্দু কলকেতার মেয়ে স্কুলে পড়ে। তাঁর বড় সাধ ছিল বিন্দুকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন, মরবার সময়ে আমাকেও অনুরোধ করে গেছেন, এখানে থাক্‌লে ত বিন্দুর পড়াশুনা বন্ধ হবে।

তর্কভূষণ। (একটু বিরক্ত স্বরে) তোমাদের ঐগুলোই ত আমি ভালবাসি না। নন্দকিশোর সৎ লোক ছিল বটে কিন্তু সকল কাজে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। তার ফল দেখ ভাই দুটোর কি দশা ঘটেছে। মেয়েছেলের লেখাপড়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আর পড়বেই বা কতদিন? দশ বৎসর না হতেই ত শ্বশুর ঘরে পাঠাতে হবে। এদেশে ত কোনও দিন মেয়েছেলের লেখাপড়ার প্রথা নাই ; সংসারের কোন্ কাজটা আট্‌কে আছে?

বিজয়া। তোমার কাছে আমার প্রাচীন কালের কথা বলা শোভা পায় না। শুনেছি সেকালে নাকি মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করতেন? আর শাস্ত্রেও নাকি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার নিষেধ নাই।

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'মেজবউ', ১৮৭৯, পৃ. ৯৫, ২য় সং ১৮৮০, একাদশ.সং ১৯১২

৪. ড. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ২১৯

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি, যে একটু উষ্ণতা আসিয়াছিল, ভগিনীর পবিত্র ও সরলতাপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, —হাঁ তুমি যা শুনেছ তা সত্য, প্রাচীনকালে রমণীদের বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল বটে, আর ইহাও সত্য যে, এ বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ নাই। আমার মনের কথাটা এই, যে প্রথাটা রহিত হয়েছে, এমন কি দরকার পড়েছে যে নূতন করে সে প্রথাটা চালাতে হবে।

বিজয়া। দরকার আছে বৈকি? আচ্ছা ভেবে দেখ দোখি, আমি পড়তে পারি বলে তুমি আমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে বৌদের শোনাতে বলেছ। যে জন্য বলেছ তা আমি বুঝেছি ; আমার একটা কাজ বাড়ে ও বৌদেরও উপকার হয়। যদি বৌরা পড়তে পার্‌তেন রামায়ণ মহাভারত পড়ে কি উপকার পেতেন না? বিদ্যাশিক্ষা করলে ত জ্ঞানলাভ করবার উপায় হয় ; জ্ঞান কি পবিত্র বস্তু নয়? কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের পক্ষেই কি জ্ঞানলাভ করা দরকার নয়?

তর্কভূষণ। শেষপর্যন্ত অনেক চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা যদি তুমি ইচ্ছা কর ত তোমার মেয়েকে এখানকার স্কুলে দিও।" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

স্ত্রীশিক্ষা বলতে এখানে লেখক মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা বলেননি। স্পষ্টই চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী শিক্ষা অর্থাৎ চারিত্রনীতিগত শিক্ষার কথা বলেছেন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থ যার সহায়ক। তাঁর ধারণা, স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত ভূমি তৈরি করার জন্য প্রথমে সনাতন শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করাব প্রয়াস চালাতে হবে, পরে প্রয়োজনমতো পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বপন করা সম্ভব হবে, ফলও আশানুরূপ ফলবে।

প্রাচীনপন্থী তর্কভূষণকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে আনার পক্ষে লেখকের এ কৌশল বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

"আচ্ছা যদি তুমি ইচ্ছা কর ত তোমার মেয়েকে এখানকার স্কুলে দিও।" তর্কভূষণের এ স্বীকৃতি তারই পরিচায়ক।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে শিক্ষিতা নারীর ভূমিকার যে দিকটি লেখক উপন্যাসটিতে বিজয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা অভিনব।

তর্কভূষণের মানসিক পরিবর্তন সাধনে বিজয়ার ভূমিকাও উপন্যাসটিতে স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত।

একই উদ্দেশ্যে লেখা লেখকের তৃতীয় উপন্যাস 'নয়নতারা' (১৮৯২)। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দেশীয় ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে তার কল্যাণী রূপটি তুলে ধরার প্রয়াস উপন্যাসটিতে বর্তমান।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়নতারা লেখকের সে উদ্দেশ্যসাধনে উপস্থাপিত। নয়নতারা শিক্ষিতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। পিতৃবন্ধু মণিলাল তাকে 'জুয়েল' বলে অভিহিত করে। উদ্ভিদবিদ্যা, সংস্কৃত, ইংরেজি কাব্য, বৈষ্ণব কাব্য প্রভৃতি পাঠ, পিতাপুত্রীতে চন্দ্রালোকে বোটের ছাতে বসে পরমার্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি তা'র জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও ভগবদ্ভক্তির পরিচায়ক। নয়নতারার ভ্রাতৃপ্রীতি ও আত্মমর্যাদাবোধও প্রখর। তার হস্তক্ষেপে বন্ধুবর্গসহ ভাইদের মাতলামি দূর হয়। ভাই যোগেশও মদ্যপান

ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করে। পিতার মৃত্যুর পর তার প্রখর ব্যক্তিত্বে গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এককথায়, উপন্যাসটিতে লেখক নয়নতারার জ্ঞানার্জনস্পৃহা, ভগবদ্ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, আত্মসম্মানবোধ, পরদুঃখকাতরা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের পরিচয় দিয়ে সমাজ গঠনের কাজে এ জাতীয়া বিদুষী নারীর অনিবার্য ভূমিকার দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

শিবনাথ মনে করতেন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নারীসমাজকে নবতর সত্যে বিশ্বাসী করে, সমাজের একটি মহৎ সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত করতে পারে। সে বিশ্বাসের রূপদান তিনি করেছেন উপন্যাসটিতে। আত্মচিন্তা, ঈশ্বরবিশ্বাস ও সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, প্রগতির লক্ষ্যহীন গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে যে সমাজকল্যাণের কাজে লাগানো যেতে পারে এমন এক সম্ভাবনার পথ দেখাতে চেয়েছেন লেখক।

নয়নতারার চরিত্রচিত্রণে লেখক আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তবে পূর্ববর্তী উপন্যাস 'যুগান্তরের' তুলনায় লেখকের প্রচারধর্মী মন এখানে অনেকটা সংযত ও সচেতন। কাজেই উপন্যাসটি শৈল্পিক ভূষণ লাভেও অধিকারী।

১৮৮৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের পড়াবার সম্মতি পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশির দশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ-বর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ অর্থাৎ কোনটি কতদূর স্বাস্থ্যকর, এসব ভাবনাচিন্তা শুরু হল। বিষয়টি সমাজ জীবনকে কিভাবে এবং কতদূর আলোড়িত করেছিল, সুধীজনের জ্ঞাতার্থে নিম্নে কয়েকটি পত্রপত্রিকার[৫] মন্তব্য পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

ক) "স্ত্রীপ্রকৃতির সমোন্নতি সাধনই স্ত্রীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।...যেহেতু বিবাহিতা জীবনে তাহাদিগকে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সঙ্গীতাদি শিক্ষা অপেক্ষা নারীর পক্ষে উত্তম রন্ধন শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।" —'বঙ্গমহিলা', মাঘ ১২৮৩

খ) 'পরিচারিকা', মাঘ ১২৮৭

গ) "যাঁহারা স্ত্রীলোকদের এম. এ. বি. এ. উকিল ব্যারিষ্টার করে তুলতে চান, ঘোড়াকে দিয়া হাতীর কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিলে যেরূপ বিফলত্ব হইতে হয়, সেইরূপ ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদি কোমল গুণের বিকাশই স্ত্রীশিক্ষা।" —'পরিচারিকা', আশ্বিন ১২৯৫

ঘ) "নারীশিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, ভূবিদ্যা, শিক্ষাবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা সমুদয়েই নারীরা পারদর্শী হউক কিন্তু তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী পুরুষদের ন্যায় কেন হইবে?" —'পরিচারিকা', শ্রাবণ ১২৯৭

ঙ) "আমরা দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুসন্তানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা সত্বর হিন্দুরমণীর শিক্ষাসম্বন্ধে একটা কর্তব্য অবধারণ করিবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষে হিন্দুর গৃহ কি প্রকার অশান্তির আলয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর হিন্দুসন্তানকে বুঝাইতে হইবে না। অতএব এই সময় সকলে সাবধান হইবেন এই একমাত্র প্রার্থনা।" —'অনুসন্ধান', বৈশাখ ১২৯৮

চ) "নারীজাতির শিক্ষা সর্বথা ধর্মভাবপূর্ণ ও সহজসাধ্য হওয়া প্রয়োজন।...রমণীদিগকে সর্বাগ্রে ইহা জানিতে দেওয়া কর্তব্য যে, তাঁহাদের শিক্ষা দেশপ্রসিদ্ধ খ্যাতনামা হইয়া উপাধিলাভ করিবার জন্য নহে...।" শ্রী মতী চ —'মহিলা', পৌষ ১৩০৪

স্ত্রীশিক্ষার রীতিপদ্ধতি নিয়ে এইভাবে সমাজে যখন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সময়ে সুকৌশলে বঙ্কিম তাঁর এ বিষয়ক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি ঘটালেন 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসে।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র 'প্রফুল্ল'। ভবানী পাঠকের কাছে সে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করেছে, এবং দীর্ঘ ১০-১২ বছর বিপ্লবীদলে নেতৃত্ব দিয়েছে। অথচ সেই 'প্রফুল্ল' পূর্বভূমিকা ত্যাগ করে বিনা দ্বিধায় সংসারের কর্ত্রী হঁয়ে বসল। দেবী চরিত্রের এ পরিবর্তন পাঠকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক বলে মনে হতে পারে—মনে হতে পারে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লেখকের এ একপ্রকার জবরদস্তি। পাঠকের এ সংশয় ভাষা পেয়েছে সাগরের মুখে। দেবীকে পুকুরঘাটে বাসন মাজতে দেখে সাগর প্রশ্ন করে, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুমবরদারি কি তার ভাল লাগিবে?" (৩য় খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

প্রফুল্লর মুখে এর উত্তর তিনি পাঠককে শুনিয়েছেন, "এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়, কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম, ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" (৩য় খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)

এতবড় চরিত্রের এই পরিণামের জন্য পাঠকের মনে যে ঔচিত্যবোধ জাগানো উচিত ছিল, বঙ্কিম তা করেননি। প্রফুল্লর নিজের উক্তি এ পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে প্রফুল্ল চরিত্রটি আনুপূর্বিক বিচার করলে এ পরিবর্তন আকস্মিক মনে হয় না। নিশির প্রতি বক্তব্য (কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ স্বামী দেখিলে—শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না) অথবা নিশি যখন বলিল, "তুমি সন্ন্যাসত্যাগ করিয়া ঘরে যাও," দেবী তখন স্পষ্ট জবাব দিল, "সে পথ খোলা থাকিলে আমি এখানে আসিতাম না।" দেবীর একমাত্র সত্য পরিচয় এটিই। অন্য কোনও পরিচয় বড় হয়ে তার প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করেনি। ভবানী পাঠক হয়তো একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারতেন প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করে মাছ খেত, কিন্তু কেন? প্রফুল্লর জীবনে এই স্বামীপ্রেম এত দুর্বার ছিল যে, এই জীবনকে অর্থাৎ দেবীরানির জীবনকে সে কোনওক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। বঙ্কিম স্বয়ং লিখিতেছেন, "তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।" কাজেই দেবীর গৃহপ্রত্যাশী মন যে প্রতিনিয়ত ব্রজেশ্বরের গৃহের চতুষ্পার্শে ঘুরে বেড়াত, এসব ঘটনা তার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

নারীজীবনের সার্থকতা যে গৃহজীবন ছাড়া অন্যত্র হতে পারে না এবং স্ত্রীশিক্ষা এর সোপান, উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র সে মতই প্রচার করেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করলেও অনেকে অধিক বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা, এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করেননি। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের 'চিরসঙ্গিনী' (১৮৮৫) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

উপন্যাসটিতে বর্ণিত ললিত ও সতীশের কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লেখকের উপরি উক্ত মনোভাবের প্রতিফলনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"সতীশ। যদি বালিকাগণের প্রকৃতশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহাদিগকে স্বামীর অধীন না করা যায়, কোন মূঢ় মানব, অস্বীকার করিবে যে ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা সংসার কার্য্যক্ষেত্রে বিষময় ফল প্রসূন হওয়া অসম্ভব? কোন মূঢ়মতি অস্বীকার করিতে পারে যে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া তাহাদের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া সংসার সাগর অতিক্রম করিবে? বালিকাগণ বুদ্ধির পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা লাভ করে, যেমন তাহারা পূর্ণবয়স্ক হইতে থাকে, তাহাদের হৃদয়েও সেই শিক্ষা দৃঢ় সম্বন্ধ হইতে থাকে।" (চতুর্থ স্তবক, পৃ. ২৬, সং ১২৯১)

বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার পরিপন্থী, অথচ লেখক 'বালিকাগণের প্রকৃতশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহাদিগকে স্বামীর অধীন' করার পক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও 'প্রকৃতশিক্ষা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন, উপন্যাসটিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

বাল্যশিক্ষা গুণে বালিকা 'উন্মাদিনী' শেষ পর্যন্ত উন্মত্ত 'সতীশকে' বিয়ে করে এবং তার আন্তরিক ভালবাসা ও সেবাযত্নে অল্পদিনেই সতীশ সুস্থ হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে এইভাবে লেখক নারীহৃদয়ের দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি গুণের বিকাশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরেছেন। যদিও উন্মত্ত সতীশের মানসিক পরিবর্তন সাধনে শিক্ষিতা উন্মাদিনীর ভূমিকা কাহিনীর ভেতর দিয়ে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসটি দুর্বল ও অসংলগ্ন।

উনিশ শতকের নয়ের দশকেও রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' (১২৯৯) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

মেয়েরা ঘর সংসার করবে, এর বাইরে পড়াশুনা ইত্যাদি বাহুল্য মাত্র। পালিতা কন্যা স্নেহলতার প্রতি জগৎবাবুর স্ত্রীর উক্তিতে তা প্রতিফলিত।

জগৎবাবুর শিশুকন্যা টগর স্নেহলতার বই কেড়ে নেওয়ায় স্নেহলতা জগৎবাবুর স্ত্রীর নিকট অভিযোগ করে বলে, "মাসিমা! আজ আমার এখনি পড়া মুখস্থ করতে হবে, মেসোমশায় এসে পড়া নেবেন বলেছেন।" স্নেহলতার এ অভিযোগের উত্তরে জগৎবাবুর স্ত্রী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, তাঁর সে সময়ের বক্তব্য স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনুদার মনোভাবের পরিচায়ক :

"পড়া নেবেন? মিন্‌সে যেমন হতবুদ্ধি হয়েছে, বিয়ের বর খোঁজ ধেড়ে মেয়ে হয়ে উঠলো তা না, নেকাপড়া নিয়ে ধুয়ে খাবে নাকি?"

জগৎবাবুর স্ত্রীর মুখে লেখিকা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গ্রামবাংলার গৃহিণীদের অনুদার মনোভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তব। অর্থাৎ উপন্যাসটিতে লেখিকার সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণও বেশ স্বাভাবিক। সম্ভবত এসব কারণে ড. সুকুমার সেন উপন্যাসটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "বাঙালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।"[৬]

উনিশ শতকের শেষের দশকে স্ত্রীশিক্ষা মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে স্বীকৃতি পেয়েছিল চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' (১৮৯৮) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

৬. ড. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ২১৫

"প্রেমমালা। বাবা আমাদেব লেখাপড়া শিখাইতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, তিনি সেকেলে ধরণের লোক তবুও মেয়েদের জ্ঞানোন্নতির জন্য চেষ্টা হয়, তিনি তাহা খুব পছন্দ করেন।"[৭]

স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসটির অন্যতম চরিত্র বিনয়ের মুখে। বিনয়ের বক্তব্যের অংশবিশেষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

"বিনয়... স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করিয়া স্ত্রীজাতির কর্তব্য বিস্মৃত হন। সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শ্রমের কার্য্য সম্পন্ন করা পাচক পাচিকা ও দাসদাসীর কার্য বোধে ঘৃণার সহিত তাহা হইতে দূরে থাকেন—আপনাদের সন্তানাদির লালন পালনে যদি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন কথায় কথায় মুখভঙ্গি করিয়া মনের গরিমা ও আত্মপ্রাধান্যের পরিচয় দেন, তবে তাঁহাদের অপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত মেয়েরা শতগুণে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। যে শিক্ষার সংস্পর্শে স্ত্রীহৃদয়ের লজ্জা, ক্ষমা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়, যে শিক্ষার সৎদৃষ্টান্তে পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি হয়, গৃহকে প্রেমের আলয় করে, যে শিক্ষাগুণে পরিবারের সকলেই লোকসেবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক থাকে, আমি আমার গৃহে সেইরূপ শিক্ষার সুবিস্তার দেখিতে চাই।" (দশম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৭-৬৮)

কাহিনীটি শিথিল। বিনয়ের মুখে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ নীতিগর্ভ বক্তৃতা রক্ষণশীলদের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনুদার চিন্তাভাবনা দূরীকরণে সহায়ক, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন দেখিয়ে রক্ষণশীল সমাজের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস পেয়েছেন কেদারশ্বর সেন 'স্মৃতিমন্দির' (১৯০০) উপন্যাসে।

কাহিনীতে দেখি, হরিনাথ স্ত্রী সর্বাণীকে অবসর সময়ে গৃহে লেখাপড়া শেখান। এর সমর্থনে হরিনাথের বক্তব্য এই যে, সর্বাণী শিক্ষিতা হলে একাধারে গৃহকার্য, পুত্রকন্যার লালনপালন, সুশিক্ষার ব্যবস্থা, জমিদারি কাজকর্ম তদারক ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, কাজেই বিদেশে নিশ্চিন্তভাবে কাজকর্ম করা সম্ভব হবে। পুত্রবধূর লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারটা হরিনাথের মা সমর্থন করলেন না। সর্বাণীর কোনও ক্রটি না থাকলেও লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে তাঁর অশান্তির মাত্রা বেড়ে চলে। প্রতিবেশীরাও হরিনাথকে সমর্থন করেননি। তাঁরা হরিনাথের সাক্ষাতেই হরিনাথ ও সর্বাণীর নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন। 'লজ্জাহীনা' বলে সর্বাণী ঘোষিত হলেন, হরিনাথ 'সমাজদ্রোহী', 'ধর্ম্মদ্রোহী', 'কর্ম্মদ্রোহী' ও 'মাতৃদ্রোহী' বলে ঘোষিত হলেন। মোটের ওপর গ্রামে যা প্রচারিত হল, তাতে সর্বাণীর কুৎসা, হরিনাথের অপদার্থতা ও মাতা জাহ্নবীর চির দুঃখ। আর জাহ্নবীর দুঃখে সকলেই দুঃখিত।

মাতৃভক্ত হরিনাথ এতে আঘাত পেলেন। পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বাণী গৃহত্যাগ করলেন।

শিক্ষিতা সর্বাণীর মার্জিতরুচির দ্বারা সংসারের যে শ্রী ও সৌন্দর্য বেড়েছিল, সর্বাণীর গৃহত্যাগে সে আলো নিভে গেল। শাশুড়ি চোখ থাকতে চোখের মর্যাদা বোঝেননি, এখন

৭. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুখানি ছবি', সং ১২৯৫, পৃ. ৫৯

অন্ধকারে পড়ে চোখের গুরুত্ব বুঝলেন। তিনি বুঝলেন, সর্বাণী সত্যিই শক্তিময়ী ছিল। উৎস ছিল শিক্ষা। কৃতকর্মের অনুশোচনায় তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

দীর্ঘদিন পর হরিনাথ বহু অনুসন্ধানে সর্বাণীকে ফিরে পেলেন। উভয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগলেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে সমাজের কোন কোন মহলের ভ্রান্তধারণাজনিত অমূলক আশঙ্কা ছিল তা খণ্ডন করে, লেখক উপন্যাসটিতে স্ত্রীশিক্ষার শক্তির দিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যদিও রক্ষণশীলদের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কাকে ব্যক্ত করার প্রলোভন জয় করতে পারেননি।

"স্ত্রীশিক্ষার লাভ কি? লাভের মধ্যে দেখিতে পাই শুধু মানসিক বিকৃতি। শিক্ষিত স্ত্রীলোক মাত্রেরই কেহ কেহ সপ্তাহে সপ্তাহে ; কেহ কেহ বা দুই তিনদিন অন্তর, স্বামীর নিকট পত্র লিখিবার জন্য উন্মাদিনী হইয়া পড়েন। আবার নিয়মিত সময়ে পত্র না পাইলেও তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইবার উপক্রম হয়। তখন কেহ কেহ আলুলায়িত কুন্তলে বসনাঞ্চলে ধরাশয্যা অবলম্বন করেন। কেহ কেহ দীনক্ষীণা মলিনা হইয়া পিওনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কেহ কেহ'বা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসেন। আবার পত্র পাইলেও উন্মত্ততার শেষ হয় না। কেহ সেটাকে মস্তকে, কেহ বা হৃদয়ে, কেহ বা বক্ষে, কেহ বা ওষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া কেমন করিয়া নাকি আদর করেন, সে বিষয়ে আমি জানি না। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোককে মাপ করিবেন। কেহ বা ডালে কাঁটা দিতে দিতে দৌড়ে গিয়া মাচানে উঠেন। খট্ মট্ করিয়া পোর্টম্যান খুলিয়া কি জানি মাথা মুণ্ড পড়িতে বসেন। ডালে নুন দিতে ভুল হয়। কেহ কেহ অন্যপাত্রে ভাজিত মৎস্য স্থাপন করিয়া অঞ্চল গ্রন্থি হইতে কি যেন খুলিয়া তচ্চিন্তায়ই আত্মবিস্মৃত হয়েন। উদার মার্জারদল সেই বিকৃতির সুযোগ গ্রহণে মৎস্য দেহ উদরস্যাৎ করিয়া ফেলে তার বড় বাহাদুর। এ বিকারে আত্মরক্ষণশক্তির লোপ পায়, এ বিকারেই বর্ত্তিকাপার্শ্বে মক্ষিকাদল টিকটিকির উদরস্থ হয়। এ বিকারেই মুসলমান রাজত্ব ইংরাজের উদরস্থ হইয়াছে। উদারসর্বস্ব নব্য লেখক ঐ শেষোক্ত কারণদ্বয়ে স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষায় চাকুরী নাই, সুধু খাট্নী, জজম্যাজিষ্ট্রেট, দারোগা, এমনকি গ্রাম্য পোষ্টবাবু হবারও যো নাই।"[৮]

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার চিত্র তুলে ধরে এর আতিশয্যপূর্ণ দিকটির পরিচয় দিয়ে পরোক্ষভাবে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। স্ত্রীশিক্ষার পারিবারিক প্রয়োজন যে ছিল না তা নয়, যদিও তা রক্ষণশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এঁরা এর অর্থনৈতিক দিকটি মাত্র চিন্তা করেছিলেন, যা তখনকার সমাজে ছিল অসম্ভব। চাকরি করার অনুকূল পরিবেশ ও মানসিকতা তখনও আমাদের সমাজে গড়ে ওঠেনি। একদিন যে তা গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, এমন সম্ভাবনার কথা কিন্তু এঁরা ভেবে দেখেননি।

উপন্যাসটিতে লেখকের বাস্তববোধের পরিচয় পাই। সর্বাণীর গৃহত্যাগ, অনুশোচনায় দগ্ধ হরিহরের মাতার মৃত্যু, হরিহর ও সর্বাণীর পুনর্মিলন ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত।

---

৮. কেদারেশ্বর সেন, 'স্মৃতিমন্দির', সং ১৩০৭, পৃ. ৯৭

॥ ২ ॥

উনিশ শতকের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে প্রগতিবাদী আন্দোলনকে সুনজরে দেখেননি। ব্রাহ্মদের নৈতিক জীবনে এঁরা সততা ও শুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। শিক্ষার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর দাম্পত্যজীবনে প্রচলিত সতীত্বের আদর্শের বিরুদ্ধে যে বিরোধের সৃষ্টি করেছিল, একশ্রেণীর অনুদার ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষাকেই এর একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কাজেই একাধিক উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিরোধিতা করা হল। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সাহায্য নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য আলোচনা করছি।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'নবদুর্গা' (১২৯১)। গ্রন্থকারের নাম নেই। গ্রন্থকার নিজেকে 'বাঁশরী প্রণেতা' বলে অভিহিত করেছেন।

উপন্যাসটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটিকচাঁদের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে শিক্ষিতা নবদুর্গাকে এর কারণ বলে দেখানো হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া বইটির কোনও গুরুত্ব নেই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকৃতরূপের পরিচয় পাই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। উপন্যাসটির 'ভূমিকা'য় লেখক বলেছেন,

"স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী, বালকবালিকা মডেল ভগিনী পাঠে পরমজ্ঞান লাভ করুন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসারে সাবধান হউন, ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।"

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

এ উপন্যাসের নায়িকা কমলিনী। সে শিক্ষিতা এবং আধুনিকা। কমলিনী শেক্সপীয়র অনুবাদ করে, শেলীর বই বুকে নিয়ে ঘুমোয়। বায়রনের প্রেমপরায়ণতা তাকে মুগ্ধ করে। কমলিনীর ছলাকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পুরুষ বন্ধুবর্গের সঙ্গে নিঃশর্ত প্রেমচর্চা, প্রেমের গান মুখস্থ করতে গিয়ে মাথাধরা, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা শুনলে অসুস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি, এককথায় তার চারিত্রিক অবনতির দিকটি লেখক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন, মূল উপন্যাস থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কমলিনীর পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেন,

"কমলিনী বিবি গাউন পরা, নবঘনদর্শনে ময়ুরবৎ পেখমধরা, কাপড় কসনে কঠিন কুচগিরি যেন ঊর্দ্ধে উড়িবার উপক্রম করিতেছে বিলাতী কোমর বন্ধের সাহায্যে কটীতট ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর দেখাইতেছে, পায়ে জুতা মুখে জাল...।" (সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭০)

উনিশ শতকের সভ্যতার কল্যাণে কমলিনীর বন্ধুর অভাব নেই। বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তার অবাধ বন্ধুত্ব। কমলিনীর পুরুষবন্ধু ও গুণগ্রাহীদের আধিক্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তৎকালীন সমাজপ্রগতির প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করেছেন লেখক।

"ঊনবিংশ শতাব্দী বন্ধুত্বের কাল, প্রীতি পবিত্র প্রণয়, ভাব ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু কাহন কাহন মেয়ে, মেয়ের বন্ধু কাহন কাহন পুরুষ। কাহারো কথাটি কইবার যো নাই, ভবের হাটে বন্ধুত্বের কেনা বেচা চলিয়াছে।...

কমলিনীর নানাজাতীয় নানাশ্রেণীর বন্ধু। হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, বেহ্ম, সকলেই

তাঁহার বন্ধু দলভুক্ত। তাঁহার ছোকরা বন্ধু, যুবা বন্ধু, বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু, ব্যারিস্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, ডেপুটী বন্ধু, বি. এ. পাস বন্ধু, কলেজের এল. এ. ক্লাসের ছাত্র বন্ধু, দেওয়ান বন্ধু, পণ্ডিত বন্ধু, মূর্খ বন্ধু।"[৯]

উপন্যাসটিতে বর্ণিত অন্য একটি স্ত্রীচরিত্র 'অন্নপূর্ণা'র পাঠাভ্যাস-এ পাঠোন্নতির ব্যঙ্গ চিত্রটি বিশেষ উপভোগ্য। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তা উদ্ধৃত করছি :

"প্রথম মাসে উচ্চশিক্ষার হাতেখড়ি দিয়া অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, নবমীতে লাউ খাওয়া, নিষেধটা বড়ই কুবিধি। দ্বিতীয় মাসে উচ্চশিক্ষার প্রথমভাগ ধরিয়া বুঝিলেন, পেঁয়াজে গন্ধ ব্যতীত আর কোন দোষ নাই। গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা কেবল অঙ্গভার। অন্নপূর্ণা তৃতীয় মাসে উচ্চশিক্ষার বোধোদয় আরম্ভ করিলেন। এবার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তাঁহার মনে মনে এই ভাব উদয় হইল, কেন রমণীকুল চিরদিন পুরুষের পদানত থাকিবে? পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপাখীর ন্যায় কেন অন্দরের ভিতর পচিবে? চতুর্থ মাসে এই ভাব স্পষ্টীকৃত হইল। অন্নপূর্ণা, স্বামীর আদেশক্রমে আধঘোমটা দিয়া, স্বামীর বন্ধুগণের সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহির হইতে লাগিলেন। পঞ্চম মাসে আরও উন্নতি। কেবল একটা ভৃত্যের সাহায্যে, ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া, তিনি কলকাতা আসিয়া যাদুঘরে, পশুবাটিকা, কেল্লা, গড়ের মাঠ দেখিয়া বেড়াইলেন। ষষ্ঠ মাসে প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর সহিত নৌকার ছাদে উঠিয়া সর্ব্বজনচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া গঙ্গাতীরে হাওয়া খাইলেন। সপ্তম মাসে তাঁহার মুর্গীতে ঘৃণা রহিল না, অষ্টম মাসে তাঁহার গৃহে মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ হইল। নবম মাসে ব্রাহ্মণী রন্ধনীর বদলে বাবুর্চ্চি পাকশালা অধিকার করিল। দশম মাসে অন্নপূর্ণা সঙ্গীত বিদ্যায় মন দিলেন। একাদশ মাসে একজন মুসলমান ওস্তাদজী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর সঙ্গীতের তাল লয় মান শিখাইতে লাগিল। দ্বাদশ মাসে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, অন্নপূর্ণা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া ঈশ্বরানুরক্ত ভ্রাতৃগণের সমক্ষে স্বয়ং হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ঘোর দুর্দ্দিন ঘুচিল। বহুদিনের বদ্ধমূল গাঢ়তর অন্ধকারময় আকাশ নির্ম্মল হইল। সুসভ্যতার শরচ্চন্দ্র হাসিতে লাগিল।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯৪)

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও পুরুষের মেলামেশার গণ্ডি অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। একশ্রেণীর রক্ষণশীল মানুষ এতে বিচলিত হয়ে এ পরিবর্তনকে স্ত্রীসমাজের নৈতিক অধঃপতন মনে করে, স্ত্রীশিক্ষাকেই দায়ী করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতির কারণ ঘটেনি তা নয়, তবে এঁরা অসঙ্গতিকেই মাত্র দেখিয়েছেন, ভাল দিকের প্রতি ইঙ্গিতমাত্র করেননি।

উদ্দেশ্যমূলক এ উপন্যাসটির চরিত্রচিত্রণে অতিশয়োক্তি থাকায় উপন্যাস কাহিনীটি সাহিত্য হিসাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে ব্যঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী'র প্রচার হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির প্রচারধর্মিতার কারণ উল্লেখ করে বলেন, "অনেকেই ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিশেষ কোন ব্রাহ্ম পরিবারের নৈতিক জীবনের প্রতি সুরুচি বিগর্হিত

৯. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, 'মডেল ভগিনী', সং ১৩০৪, পৃ. ৫৫-৫৬

কটাক্ষপাত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১০]

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায় লেখকের 'বাঙালী চরিত' * (১৮৮৬) নামে অপর একটি উপন্যাসে। তবে এ উপন্যাসের লক্ষ্যস্থল প্রগতির ধ্বজাবাহী অধঃপতিত বাবুসম্প্রদায়, যারা রাতারাতি সংস্কারক নাম কেনার মোহে চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণে মত্ত, লেখকের ভাষায়, "শুধু মত্ত নয়, একেবারে উন্মত্ত।"

উপন্যাসটিতে লেখক স্ত্রীশিক্ষার এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকদের তীব্র সমালোচনা করে, স্ত্রীশিক্ষাকে পারিবারিক অশান্তির মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং নব্যবাবুদের এর মোহ ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। লেখকের বক্তব্যের কিছু অংশ মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করছি,

"স্ত্রীশিক্ষা নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে। এই 'স্ত্রীশিক্ষা'ই সর্ব্বনেশে জিনিষ ; তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের, সোহাগের, সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল প্রসবিণী, কালনাগিনী শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ, ইহাই যেন হাতের নোয়া, সিঁথির সিন্দূর, ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম ; ইহাই সংসারের সার সর্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্যা। বরং একদিন দশদিক্ উজ্জ্বলীকৃত কোহিনূর বিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তথাচ এ শিক্ষাটুকু ছাড়িতে পারি না। অধিক কি, বরং বিধবা হইয়া বার মাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না।"

'বরং বিধবা হইয়া বার মাস বাস করিব'—এ মন্তব্য লেখকের উদ্দেশ্যসাধনে কতদূর সহায়ক হয়েছিল—তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, একথা শোনার লোক যে সমাজে তখনও ছিল, তা অনুমান করা যায়।

উপন্যাসটিতে লেখক বলেছেন, "পুরুষেরই কি, আর স্ত্রীলোকেরই কি, কাহারও সুশিক্ষার আমরা বিরোধী নহি।" কিন্তু এ 'সুশিক্ষা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন উপন্যাসটিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অন্তত অক্ষর শিক্ষার কোনও কথা বলেননি।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লেখকের একই মনোভাবের প্রতিফলন 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬) নামে অপর একটি উপন্যাসে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের অভাবে উপন্যাসটির বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গরচনা বীরেশ্বর পাঁড়ের 'অদ্ভুত স্বপ্ন' (১২৯৫)।

নারী ও পুরুষকে একই শিক্ষা দিলে এদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হবে। স্ত্রী যাবে বাইরে, পুরুষ আসবে অন্তঃপুরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই হাস্যকর দিকটি তুলে ধরেছেন লেখক উপন্যাসটিতে। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে লেখকের বক্তব্য পাঠকের সামনে তুলে ধরছি :

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৫ম সং, পৃ. ৩৮৩

* 'বাঙালী চরিত', প্রথম ভাগ, ১২৯২ সাল

ঐ, দ্বিতীয় ভাগ, ১২৯২ সাল

ঐ, তৃতীয় ভাগ, ১২৯৩ সাল

"এই স্ত্রীপুরুষের বিবাদ স্বপ্ন ব্যাপার হইলেও এককালে উপেক্ষণীয় নহে। সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য কিনা, অন্ততঃ সম্ভব কি অসম্ভব বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব।"[১১]

উপন্যাসের কাঠামোতে লেখক এ বক্তব্যই সন্নিবিষ্ট করেছেন। রচনাটিতে উপন্যাসের কোনও গুণ নেই, কাজেই বিস্তারিত আলোচনা না করে, একই শিক্ষা পাত্রভেদে ভিন্ন ফল প্রসব করে, উপন্যাসটির ভেতর উদ্ধৃত একটি গল্পের সাহায্য নিয়ে, সেই লক্ষ্যটির পরিচয় দিয়ে এ আলোচনা শেষ করছি :

"কোন ব্যক্তি নিজ অসচ্চরিত্র পুত্র ও কন্যার সুশিক্ষা বিধান জন্য বাটিতে মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন। পাঠ সমাধানান্তে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু। ভারত পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে? পুত্র কহিলেন, পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা কহিল, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল। পুত্র ও কন্যার উত্তর শুনিয়া তাহাদের পিতা কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিলেন, উপদেশ পাত্র অনুসারে সঞ্চারিত হয়।" (পৃ. ৫-৬)

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন পর্বে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সপক্ষে ও বিপক্ষে ব্যাপক সামাজিক আলোড়ন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে যার সূত্রপাত এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের সম্মতিতে যার পরিসমাপ্তি। অথচ উপন্যাস সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিফলন বলতে উভয়পক্ষের আলোচনা থেকে যে জিনিসটা আমরা পেলাম, যদি আমরা সংক্ষেপে তা উপস্থিত করতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে, ২-১ টি উপন্যাসে মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। 'স্ত্রীশিক্ষা' বলতে অধিকাংশ উপন্যাসে নানা জন নানা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মানবিক শিক্ষা, সাংসারিক দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের উপযোগী শিক্ষা। এ শিক্ষা বলতে এঁরা যা বুঝতেন তা হল নারীর হৃদয়বৃত্তির জাগরণ, কল্যাণধর্ম ও শুভবুদ্ধির বিকাশে সহায়ক শিক্ষা। অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ, দরদ ইত্যাদি নারীচরিত্রের পুনরুজ্জীবিত করা, পাঠকের গোচরীভূত করেই বিজয়া[১২] যা পুনরায় চালু করতে চেয়েছিল।

১১. বীরেশ্বর পাঁড়ে, 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব', বিজ্ঞাপন, সং ১২৯৫

১২. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'যুগান্তর', সং ১৮৮৫ (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা প্রবন্ধ (১৮৫০-১৯০০)

আমাদের আলোচ্য পর্বের সূচনার বহুপূর্বেই সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে প্রবন্ধনিবন্ধ ও কথোপকথনমূলক সাহিত্যে। যদিও এগুলি ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের গঠনমূলক আলোচনার দিক, চিন্তা ও যুক্তির বিচার ও বিশ্লেষণ, পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা। প্রকৃতিতে এই রচনাগুলি প্রচারমূলক। সাহিত্যরসগুণ তার খুব বেশি ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রথম বাংলা পুস্তক রচনার কৃতিত্ব গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের।

আমাদের আলোচ্য পর্বে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা'[১] (১৮৫০) প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত ধারণা, যথা,

ক) শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী মানসিক শক্তি স্ত্রীগণের একান্ত অভাব।

খ) স্ত্রীশিক্ষা লোকাচার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার।

গ) স্ত্রীশিক্ষা অকাল বৈধব্যের কারণ।

ঘ) স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীসমাজকে স্বেচ্ছাচারী করবে অর্থাৎ নৈতিক অধঃপতন ঘটাবে।

ঙ) স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনের অভাব ইত্যাদি উল্লেখ করে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে সেগুলি খণ্ডন করে, স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে নিজের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখানে প্রবন্ধটি অবলম্বন করে লেখকের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রথমত, শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী মানসিক শক্তি স্ত্রীগণের একান্ত অভাব। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত এই ধারণাটির বিরুদ্ধে লেখক যে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন সংক্ষেপে তা হল এই যে, স্ত্রী-পুরুষের আপাতত শারীরিক পার্থক্য কিছু চোখে পড়লেও শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী মানসিক শক্তি মেয়েদের কম নয়, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছেলেদের অপেক্ষা বেশি।

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীশিক্ষা আপাতত দেশাচারবিরুদ্ধ হয়ে পড়লেও মূলত দেশাচারবিরুদ্ধ নয়, শাস্ত্রবিরুদ্ধ তো নয়ই। প্রাচীন গ্রন্থে তার প্রমাণ রয়েছে। আত্রেয়ী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিদর্ভ

১. দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ১ম খণ্ড, (৪র্থ সং), পৃ. ৩১-৪২

রাজকন্যা, রুক্মিণী, লীলাবতী, কর্ণাটক রাজমহিষী, কালিদাস পত্নী, খনা প্রমুখ বিদুষী রমণী এর দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়ত, বিদ্যাভ্যাস করলে নারীগণ বিধবা হয়, এর বিরুদ্ধে লেখকের স্পষ্ট জবাব, কারণটিকে নিয়ে যত খুশি হাসিঠাট্টা করা যেতে পারে, অন্তত তর্কে অবতীর্ণ হওয়া ঠিক হবে না। কাজেই এর উত্তর না দেওয়াই লেখক এর সমুচিত জবাব মনে করেছেন।

চতুর্থত, বিদ্যাশিক্ষা করলে নারীগণ দুশ্চরিত্র ও মুখরা হয়, এ ধারণাও ভ্রান্ত। বরং বিদ্যাভ্যাস নারীগণকে বিনয়ী, সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাবা করে তোলে, এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

পঞ্চমত, বাস্তবে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলে যাঁরা এর গুরুত্বকে হালকা করে দিতে চান, তাঁরা এর অর্থকরী দিকটি মাত্র চিন্তা করেন। এ প্রসঙ্গে লেখক এর পারিবারিক প্রয়োজন দেখিয়ে বলেন যে, যথার্থ বিদ্যা হলে রমণীগণ সমাজ ও সংসারে সবদিক থেকে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠবেন। সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করে অকুতোভয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হবেন। এ দুঃখময় সংসার তাঁদের কাছে সুখময় হয়ে উঠবে। বিশেষ করে আমাদের দেশের স্ত্রীরা আপন আপন গৃহকর্ম সমাপনের পর অবসর সময়ে শিক্ষাগ্রহণে নিযুক্ত থাকলে একাধারে চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষবিধান সম্ভব হবে।

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে উল্লিখিত বক্তব্য রাখার পর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে লেখক বলেছেন,

"আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন, এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রী পরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ এবং তাঁহারাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় বাস করিতে হয় ও যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয় এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় ; সেই সহধর্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্বদাই সংসারে সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?"

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রবন্ধটিতে লেখক যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখা পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে এ যুক্তিগুলিই অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধটির ভাষা এর নিজস্ব সম্পদ, লেখকের সাহিত্য প্রতিভার পরিচায়ক। প্রবন্ধটিতে করুণাময় ঈশ্বরের নিকট লেখকের কাতর প্রার্থনা,

"হে করুণাময় জগদীশ্বর। আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় আরোহণ পূর্ব্বক আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি

স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন......।"[২] ইত্যাদির মধ্যে তাঁর নারীদরদী হৃদয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এ প্রবন্ধটি প্রকাশের দীর্ঘদিন পূর্বে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২৪) গ্রন্থে দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনে প্রশ্ন রেখেছিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় বা মেয়েরা লেখাপড়া শিখে করবে কি? ইত্যাদি। এরপর দীর্ঘ ৩০ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ১৮৪৯-এ বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেথুন স্কুলের দৃষ্টান্তে কলকাতার আশপাশে আরও ২-৪টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েরাও বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে, তথাপি সংস্কার বড় প্রবল। তখনও মানুষের মনে সেই একই প্রশ্ন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কি করবে? দীর্ঘদিন পরও সাধারণ মানুষের মন থেকে এ সংশয়ের নিরশন হয়নি। রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজ তখনও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই ১৮৫৪-তে স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'মাসিক পত্রিকা'য় এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে লেখনী ধারণ করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় হরিহর ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায় হরিহর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও সংস্কারবশত তাঁর স্ত্রী এর বিরোধী। পদ্মাবতীর মুখেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তাঁর অভিমত শোনা যাক :

"মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখে কিঁ করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিনু সেখানে মাসী পিসী সকলেই আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখাপড়ার কথা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে বললেন, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেও কেও বললেন, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। মাগো মা! সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুকধুক করছে কায নাঁই বাবু আর লেখাপড়ায় কায নাই! মেয়ে আমার অমনি থাকুক। যে কয়েকদিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।"[৩] পদ্মাবতী এখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরবাসী মহিলাদের প্রতিনিধি। প্যারীচাঁদের সাহিত্যপ্রতিভাগুণে পদ্মাবতীর কথার ঝঙ্কারটুকুও পাঠকের কানে অনুরণিত হয়। হরিহর কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তিনি দেশি ও বিদেশি শিক্ষিতা গুণবতী মহিলাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে, স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েরা সাংসারিক ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে পরিবারে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে আনে, তা দেখিয়ে স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। এখানেই লেখক ক্ষান্ত হননি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে, শিক্ষা ব্যতীত কোনও কাজেই দক্ষতা জন্মে না ; একথা জানিয়ে একজন শিক্ষিতা মহিলা তাঁর স্বামীকে বলেছেন,

"দেখ ছেলে দুটীর লেখা পড়া এক রকম হইতেছে কিন্তু মেয়েটির একটি ভাল

২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ১ম খণ্ড, (৪র্থ সং), পৃ. ৪৫

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', (সং ১৯৭১), পৃ.-১৯৩-৯৪

শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছি কিন্তু শিখিবার অনেক বাকি আছে। এই কথা শুনিয়া আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম মেয়ের শিক্ষা দেবার জন্য টাকা নষ্ট করার তাৎপর্য কি? আজ আছে কাল পরের ঘরে যাবে। কড়ি খরচ করিয়া মেয়েকে শিখাইলে কি লাভ হইবে? আমার এই কথাতে পত্নী ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন : না বিরক্ত হই নাই--স্বামীর উপরে কি কখন স্ত্রী বিরক্ত হইতে পারেন? কিন্তু এ বিষয়টি তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। আমার একটা কথা শুন দেখি। বাপ মার কর্ম্মই. এই যে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সৎ উপদেশ দিবে। যদি কন্যার উপদেশ না হয় তবে তিনি সংসারে কোন কর্ম্মের যোগ্য হইতে পারেন? না গৃহকর্ম ভাল করিয়া জানিতে পারেন, না সন্তানাদির লালন পালন করিতে পারেন, না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে সুখী করিতে শক্ত হয়েন, না তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়?"[৪]

প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখনীতে স্ত্রীশিক্ষার শোভনরূপ এইভাবে চিত্রিত হয়েছে। লেখাপড়া ছাড়া সমাজ ও সংসারে কোনও স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। দেশীয় সংস্কার অনুযায়ী শিক্ষিতা নারীরা পুরুষদের অবমাননা করে না, তাছাড়া ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেককেই সুশিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ শিক্ষা ছাড়া মেয়েরা সাংসারিক কার্যে দক্ষ, বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণা হতে পারেন না এমন কথাও লেখক প্রবন্ধটিতে জোরের সঙ্গে বলেছেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'স্ত্রীশিক্ষাবিধান' নামে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ২০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে লেখক স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডন করে, যুক্তির সাহায্যে 'পুত্র ও কন্যাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই' দেখিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছাড়া এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বলে দ্বারকানাথ মন্তব্য করেছেন[৫]। তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ ভাব ও ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমর্থন এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে পৌঁছে দিতে অনেকাংশে সহায়তা করেছিল, তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

১৮৫৯-এ প্রকাশিত রামসুন্দর রায়ের 'স্ত্রীধর্ম বিধায়ক' পুস্তিকাটিও এ প্রসঙ্গে লেখা উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগুলির অন্যতম।

॥ ২ ॥

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অজস্র প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখা হয়। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য ইতিপূর্বে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখা পুস্তিকা ও প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অভিনবত্বের অভাবে সেগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

পত্রপত্রিকাতেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমার্ধের পত্রিকাগুলো বাদ দিলে পঞ্চাশের দশক থেকে যে সমস্ত পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ও বিরুদ্ধে কলম ধরে তার

৪. ঐ, ঐ, 'রামারঞ্জিকা', পৃ. ২৪৬-৪৭

৫. দ্রঃ স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পৃ. ২৭৯

মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

'সোমপ্রকাশ', 'বামাবোধিনী', 'অবলাবান্ধব', 'বঙ্গমহিলা', 'আর্যদর্শন', 'ভারতী ও বালক', 'ধর্মপ্রচারক', 'পরিচারিকা', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'বেদব্যাস', 'অনুসন্ধান', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকা ; 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইংলিশম্যান', 'ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন', 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত' ইত্যাদি ইংরেজি পত্রিকা ও আরও কয়েকটি ছোটখাট বাংলা পত্রিকা।

পঞ্চাশের দশকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যাঁরা মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে আগ্রহী হলেন, ক্রমে তাঁরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল অত্যুৎসাহী যুবক মেয়েদের হুবহু পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষা দেওয়ার দাবি তুললেন। অপর একদল এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দেশীয় রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান উচিত বিবেচনা করলেন। এঁরা তাই শিক্ষার ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রাখতে চাইলেন। রক্ষণশীলদের তো কথাই ওঠে না। মেয়েদের শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে এদের তৎপরতার কখনও অভাব হয়নি। কাজেই দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবৎ এ তিন গোষ্ঠী পুস্তিকা প্রকাশ করে ও পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় লেখা এ ধরনের অজস্র প্রবন্ধ চোখে পড়ে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের অভাব ও সাহিত্যগুণবর্জিত বলে আমরা এখানে প্রবন্ধগুলির বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হয়ে এ আন্দোলনের ব্যাপকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির নাম ও পত্রিকার নাম প্রকাশকাল সহ উল্লেখ করছি।

পক্ষে :

১) 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়', 'সংবাদ প্রভাকর', আষাঢ়, ১২৫৯
২) 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর', পৌষ, ১২৫৯

৩) 'স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা'	'সোমপ্রকাশ'	জ্যৈষ্ঠ,	১২৭২
৪) 'স্ত্রীনর্ম্যাল বিদ্যালয়'	'সোমপ্রকাশ',	পৌষ,	১২৭৩
৫) 'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা'	'বামাবোধিনী'	ভাদ্র,	১২৭৪
৬) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'বঙ্গমহিলা'	আশ্বিন,	১২৮২
৭) 'স্ত্রীস্বাধীনতা' (সম্পাদকীয়)	'বঙ্গমহিলা'	মাঘ,	১২৮৩
৮) 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীদিগের পরীক্ষা'	'বঙ্গমহিলা'	চৈত্র,	১২৮৩
৯) 'বঙ্গবামার (প্রতিবাদ)'	'আর্যদর্শন'	আশ্বিন,	১২৯০

১০) 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা', (শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আর্যদর্শন', আষাঢ়, ১২৯০

১১) 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থার প্রতিবাদ'	'আর্যদর্শন'	ভাদ্র,	১২৯০
১২) 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা'	'বামাবোধিনী'	অগ্রহায়ণ,	১২৯১
১৩) 'স্ত্রীশিক্ষা' (শ্রীশ্যামাসুন্দরী দেবী)	'বান্ধব' (৫ম সংখ্যা),		১২৯১

১৪) 'রমণীদের এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আনন্দপ্রকাশ,' 'বামাবোধিনী', শ্রাবণ, ১২৯২

১৫) 'স্ত্রীশিক্ষা' (অক্ষয়কুমার দত্ত)	'বামাবোধিনী'	আষাঢ়,	১২৯৩
১৬) 'স্ত্রীস্বাধীনতা'	'বামাবোধিনী'	আশ্বিন,	১২৯৩

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে ডাক্তারদের মতের প্রতিবাদ,' 'বামাবোধিনী', (২৭০ সংখ্যা), ১২৯৪

১৮) 'স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি'	'বামাবোধিনী'	জ্যৈষ্ঠ,	১২৯৪
১৯) 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল'	'ভারতী ও বালক'	শ্রাবণ,	১২৯৪
২০) 'হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা'	'রহস্য সন্দর্ভ'	ভাদ্র,	১২৯৪
২১) 'স্ত্রীশিক্ষার সুফল'	'পরিচারিকা'	আশ্বিন,	১২৯৭
২২) 'স্ত্রী ও পুরুষ'	'ভারতী ও বালক'	বৈশাখ,	১২৯৭
২৩) 'ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ফল'	'ভারতী ও বালক'	আশ্বিন,	১২৯৭
২৪) 'রমণীর শিক্ষা ও কার্য্য'	'ভারতী ও বালক'	পৌষ,	১২৯৭
২৫) 'শিক্ষিতা নারী'	'সাহিত্য'	আশ্বিন,	১২৯৮

মধ্যপন্থা :

১) 'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা'	'বামাবোধিনী'	শ্রাবণ,	১২৭৪
২) 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার আবশ্যকতা',	'বামাবোধিনী',	জ্যৈষ্ঠ,	১২৭৭
৩) 'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা'	'বঙ্গমহিলা'	আষাঢ়,	১২৮২
৪) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'বঙ্গমহিলা'	আশ্বিন,	১২৮২
৫) 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা',	'বঙ্গমহিলা'	চৈত্র,	১২৮৩
৬) 'স্ত্রীশিক্ষা ও ছাত্রীবৃত্তি'	'বঙ্গমহিলা'	জ্যৈষ্ঠ,	১২৮৩
৭) 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা'	'বামাবোধিনী'	অগ্রহায়ণ,	১২৯১
৮) 'স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি'	'বামাবোধিনী'	জ্যৈষ্ঠ,	১২৯৪
৯) 'স্ত্রী ও পুরুষ' (অপর একটি চিত্র)	'ভারতী ও বালক',	বৈশাখ,	১২৯৭
১০) 'স্ত্রীশিক্ষা' (পত্র)	'ভারতী ও বালক',	আষাঢ়,	১২৯৭
১১) 'হিন্দু প্রণালী মতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব',	'সংবাদ প্রভাকর',	আষাঢ়,	১২৯৯ (সম্পাদকীয়)
১২) 'স্ত্রীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত',	'মহিলা'	পৌষ,	১৩০৮

বিপক্ষে :

১) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'তত্ত্ববোধিনী'	চৈত্র,	১৮০২ শক
২) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'বঙ্গমহিলা'	ভাদ্র,	১২৮২
৩) 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীদিগের পরীক্ষা' (কল্যাণের হবে না)	'বঙ্গমহিলা'	চৈত্র,	১২৮৩
৪) 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা'	'পরিচারিকা'	চৈত্র,	১২৮৬
৫) 'স্বাধীন স্ত্রী'	'সুলভ সমাচার'	আশ্বিন,	১২৮৬
৬) 'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী'	'পরিচারিকা'	বৈশাখ,	১২৮৯
৭) 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা'	'ধর্মপ্রচারক'	জ্যৈষ্ঠ,	১৭০২ শক

৮) 'নারীধর্ম' (নীলকণ্ঠ মজুমদার)	'বেদব্যাস'	বৈশাখ,	১২৯৬
৯) 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিফল'	'ভারতী ও বালক',	চৈত্র,	১২৯৭
১০) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'অনুসন্ধান'	বৈশাখ,	১২৯৮
১১) 'স্ত্রীশিক্ষা' (কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়),	'বেদব্যাস'	জ্যৈষ্ঠ,	১২৯৮
১২) 'স্ত্রীশিক্ষা'	'বামাবোধিনী'	অগ্রহায়ণ,	১২৯৯
১৩) 'স্ত্রীশিক্ষা' (কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়),	'অনুসন্ধান'	জ্যৈষ্ঠ,	১৩০০
১৪) 'রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা'	'জন্মভূমি'		১৩০১-০২
১৫) 'স্ত্রীশিক্ষা' (শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র)	'জন্মভূমি'		১৩০৪-০৫
১৬) 'হিন্দুরমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা'	'জন্মভূমি'	অগ্রহায়ণ,	১৩০৫

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন সমাজকে কিভাবে আলোড়িত করেছিল, তালিকাটি থেকে তা অনুমান করা যাবে। বিশেষ করে বিপক্ষে প্রকাশিত তালিকাটিতে আশির দশকে বিরোধীদের ভূমিকায় 'তত্ত্ববোধিনী' আমাদের অবাক করে। এর কারণ চল্লিশের দশকে 'বিদ্যাহীন ভারতবর্ষের স্ত্রীগণের দুরবস্থা'য় উক্ত পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করে এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১ কার্তিক, ১৭৬৮ শকে ৩৯ সংখ্যায় লেখে,

"যতকাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞানলাভ করিয়া যথার্থ ধর্মগ্রহণে অধিকারিণী না হইবে, ততকাল সম্যকরূপে এদেশে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

একথা লেখার পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কেটে গেছে। পঞ্চাশের দশকে কলকাতা মহানগরীর বুকের ওপর বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরও বিভিন্ন স্থানে একাধিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীরা কোমর বেঁধে আসরে নেমেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী'র পূর্বোক্ত ৩১ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে একটি লাইনও ব্যয় করেনি।[৬] দীর্ঘ নীরবতার পর আশির দশকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ছেলেদের মতো মেয়েরাও সগৌরবে একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নারীপ্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে, তখন রক্ষণশীলদের দলে ভিড়ে 'তত্ত্ববোধিনী' লেখে,

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়প্রধান এবং পুরুষ প্রকৃতি

৬. উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, বিশেষ করে ১৮৪৯ ও তার পরবর্তী উত্তপ্ত স্ত্রীশিক্ষা-আলোচনার পরিবেশে 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পূর্ণ নীরবতা ও দ্বিধাজড়িত মনোভাব সত্ত্বেও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার রচনাসংকলন 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (২য়)-র সম্পাদক বিনয় ঘোষ সম্পাদকীয়তে (পৃ. ৫৪) মন্তব্য করেছেন; "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম আদর্শ ছিল প্রগতিশীল সমাজসংস্কার। হিন্দু বিবাহপ্রথার সংস্কার সাধনে, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির সপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছে।"

স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান শিক্ষা নহে ; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে। ঐরূপ শিক্ষাপ্রণালী হৃদয়ের স্বাভাবিক কমনীয় কোমলা গুণসমূহের ধ্বংস সাধন করিয়া স্ত্রী-স্বভাবকে পুরুষ-স্বভাবে পরিণত করিয়া ফেলে।"[৭]

মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে এ সংশয় একা 'তত্ত্ববোধিনী'র নয়। স্ত্রী-পুরুষের একই শিক্ষা সমর্থন করেও অনেকে স্ত্রীকে পুরুষের অধীনে রাখার কথা বলেছেন। আশির দশকে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী বামাবৃন্দের প্রকৃত সুখের জন্য স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেও স্ত্রীকে পুরুষের অধীনে রাখার সুপারিশ করেন।[৮] স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে চক্রবর্তী মহাশয়ের এ ধরনের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায়[৯] শ্রীশ নামে জনৈক ব্যক্তি লেখেন,

"স্ত্রীজাতি হইতে মনুষ্য সমাজ যে সম্যক মঙ্গল সাধন করিবে, তাহা তাহাদিগের স্বাধীনতা ব্যতীত কখন সম্ভবে না। এক্ষণে স্ত্রীজাতি অধীন থাকাতে, তাহাদিগের সত্তা পুরুষ সত্তার সহিত মিলিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই। সমাজ সম্বন্ধে তাহারা অর্দ্ধ মৃতপ্রায়। সুতরাং তাহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বাধীনতা হেতু যে মঙ্গল প্রসাধিত হইতে পারে, সমাজ সে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে......।"

রমণীগণের বর্তমান অধীনতা ঘুচিলে সমাজ এইরূপে পরিবর্তিত ও ব্যবস্থিত হইবে তাহাতে কারোরই বিপদ না ঘটিয়ে বরং উভয়েরই সুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ ঘটা একদিনের কাজ নয়, কিন্তু সমাজ ধীরে ধীরে অতি মৃদুগতিতে এরূপ হয়ে দাঁড়াবে। প্রবন্ধকারের এ আশা ব্যর্থ হয়নি। স্ত্রীশিক্ষার বর্তমান অগ্রগতিই তার প্রমাণ।

৭. 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র ১৮০২ শক।
৮. দ্রঃ 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা', 'আর্যদর্শন', কার্তিক-চৈত্র ১২৮৯
৯. 'আর্যদর্শন', আশ্বিন ১২৯০

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা কবিতা (১৮৫০-১৯০০)

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের উদ্যোক্তা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে স্বভাবকবি ধীরাজ 'বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে' নামে গান বাঁধলেন। অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত এই গানটি ধীরাজের কণ্ঠে শুনে বিদ্যাসাগর আনন্দ পেতেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সেকথা বলেছেন[১]। শান্তিপুরের তাঁতিরা সুযোগ বুঝে কাপড়ের পাড়ে,

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে"—গান তুলে বেশ দু'পয়সা করে নিল। এই জনপ্রিয় গানকে ব্যঙ্গ করে "শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে" অন্য একটি গানও প্রচারিত হল। এ ধরনের অজস্র গান পল্লীবাংলার আনাচে-কানাচে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের বউ-ঝি থেকে আরম্ভ করে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে গানগুলি ফিরতে থাকে। পল্লীগ্রামের চাষাভূষোর মধ্যে বিদ্যাসাগরের নামই হল 'বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর।'[২]

পাঁচালিকার দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭) 'বিধবাবিবাহ পালা' নামে একটি পালাগান রচনা করেন। মোট ছ'টি গীত সংবলিত এই পালাগানটিতে দাশরথির রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় থাকলেও আন্দোলনের প্রতি তাঁর কৌতুকমিশ্রিত সমর্থনের কথা অস্বীকার করা যায় না। দাশরথি-গবেষক শ্রদ্ধেয় হরিপদ চক্রবর্তী এটিকে পালা না বলে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর নকশা বলতে আগ্রহী।[৩]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরোধী, এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শাস্ত্রবিচার চলে এবং বিচারের অবসান হতে না হতেই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। তাই তাঁর খেদ,

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৫২

২. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', (৪র্থ সং), পৃ. ২৯৬-৯৭

৩. ড. হরিপদ চক্রবর্তী, 'দাশরথি রায় ও তাঁর পাঁচালী', (সং ১৩৬৭), পৃ. ৩৬৮

"না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ।"[৪] (বিধবাবিবাহ আইন)

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে কিরূপ হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন তিনি—

"কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী
তাহারা সধবা হবে প'রে শাঁখা শাড়ী।" (ঐ)

এমনকি "শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা"—[৫] এমন বিধবাদের বিয়ের সম্ভাবনাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমাজে একটা গুরুতর পরিবর্তন সূচিত করছিল। এই পরিবর্তন বস্তুতই মঙ্গলের কি অমঙ্গলের, আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরাবে না তাকে দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, মনে হয় সে বিচার করার মতো দূরদৃষ্টির অভাব ছিল তাঁর। বালবিধবাদের দুঃখ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বিচলিত করেনি। নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তার কোনওরূপ ব্যতিক্রম তিনি সমর্থন করতে পারেননি—

"বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে?" (বিধবাবিবাহ আইন)

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এসব মন্তব্য থেকে আপাতত মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে এক রক্ষণশীল অনুদার ব্যক্তির নামই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

"ঈশ্বর গুপ্ত অলপেয়ে / নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে"—দাশরথি রায়ের এ অভিযোগের কারণও সম্ভবত 'বিধবাবিবাহ আইন ও বিধবাবিবাহ' নামে উপরি উল্লিখিত কবিতাদু'টি।

কিন্তু এটাই ঈশ্বর গুপ্তের সব পরিচয় নয়। তিনি প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সমকালীন ব্যক্তিরাও তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখতেন। তিনি অক্ষয় দত্তকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি যে 'Progressive' চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাই তিনি 'Society for the Acquisition of general knowledge'-এর সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে জ্ঞান না থাকলেও Tom Paine's 'Age of Reason'-এর অনুবাদ তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' বের করেন।

বিধবাবিবাহ আইনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত আবেদনপত্রে সই করেছেন।[৬] প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, 'সংবাদ প্রভাকরে' বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ গ্রন্থ সম্পর্কে একাধিকবার সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন।[৭] এ ধরনের পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। 'অহং যথার্থবাদী' স্বাক্ষরে 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত'-তে বিধবাবিবাহ চালু না থাকার ফল আলোচনা করে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রতি 'ধর্মানুরঞ্জিকা'

৪. 'বিধবাবিবাহ আইন', 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, পৃ. ১২৩
৫. বিধবাবিবাহ, ঐ
৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', (সং ১৩৭৬), পৃ. ২১৬
৭. 'সংবাদ প্রভাকর', ৮. ২. ১৮৫৫ ও ৯. ২. ১৮৫৫

সম্পাদক যেভাবে কটূক্তি নিক্ষেপ করে শিষ্টাচারের বিধি লঙঘন করেছেন, তার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি।[৮] সব মিলিয়ে সমাজসচেতন, সহানুভূতিশীল, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল ঈশ্বর গুপ্তকে আর যাই হোক 'চক্ষুকর্ণ দু'টি ডানায় ঢাকা' 'প্রবীণ ও পরম পাকা'[৯] বলে অভিহিত করতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ('Society for the Acquisition of general knowledge') থেকে ঈশ্বর গুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই তরুণের মধ্যে যে পরিচয়ের সূত্রপাত, পরবর্তীকালে তাই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কারণ হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বৈঠকী মানুষ, আড্ডাবাজ স্বভাবকবি। বিধবাবিবাহ একদিকে যখন ঝড় তুলেছে, পণ্ডিতেরা যখন একের পর এক শাস্ত্রের পৃষ্ঠা উলটোচ্ছেন, অন্যদিকে তা তখন গালগল্প হাসিঠাট্টার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈঠকী মানুষ ঈশ্বর গুপ্ত যদি পরিহাসের সুরে দু-চারটি কবিতা লিখে থাকেন, তাহলে তাই কি তাঁর চিন্তাভাবনার একমাত্র পরিচায়ক?

'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা কখনও বিসর্জন দেননি, তাই একদিকে 'সংবাদ প্রভাকরে' যেমন বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা বেরিয়েছে, অন্যদিকে ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চাননের ন্যায় রক্ষণশীল ব্যক্তির লেখা ছাপাতে তিনি ইতস্তত করেননি।[১০] পরিহাসপটু আড্ডাবাজ স্বভাবকবি মাঝে মাঝে পরিহাস করার লোভ সামলাতে না পেরে লিখেছেন,

"যে সাগরে কূল নাই, তরি নাই, তরি।
বাপ বাপ সে সাগরে দণ্ডবৎ করি।"

পরিহাস ছেড়ে বিধবাবিবাহের পক্ষ নিয়ে এই মানুষটি যখন লেখেন, "পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, ঐরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ পূর্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, যেমত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত যত্নবারি সেচন না করিলে তাহার ফল দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর কর্মসাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, কঠিনতর কার্যসকল কোন মতেই অনায়াসে সাধ্য হইতে পারে না।"[১১] তখন অন্তত আর যাই হোক বিরুদ্ধ সমালোচকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্তকে চিহ্নিত করতে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বাধে।

বৈধব্যের দুঃখযন্ত্রণাও কবিদের রচনার বিষয় হয়েছে। বিধবাবিবাহ আইন পাস হল এবং দু-চারটি বিধবার বিয়েও হল, কিন্তু সমাজমন এ পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। সমকালীন কবিরা তাঁদের কাব্যে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বৈধব্যজীবনের

৮. 'সংবাদ প্রভাকর', ৭. ৩. ১৮৫৫
৯. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পৃ. ২৬০
১০. ঐ (১৯৭৫), পৃ. ২৬১
১১. 'সংবাদ প্রভাকর', ৫১৫৩ সংখ্যা, ১. ২. ১৮৫৫

অসহায়তার করুণ ছবি অঙ্কিত করে বিধবাবিবাহের পক্ষে সামাজিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস পেয়েছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭-১৯০৯) 'বঙ্গবিধবা' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবিধবার শুষ্ক মুখ, এলায়িত কুন্তল, আভরণহীন দেহ সন্দর্শন করে আহত কবি বলেছেন,

(১)
"কে রে এ রমণী সদা বিষাদিনী
দুলিছে কণ্ঠেতে বিষাদের মালা,
বিষাদিত বাণী কার ওষ্ঠে শুনি
বিষাদ পাথারে ডুবেছে রে বালা।" (বঙ্গবিধবা)

(২)
"এলায়িত বেণী কালভুজঙ্গিনী
সমরে দংশিছে নিতম্ব মাঝারে
কুঞ্চিত কপাল হায় রে কপাল।
ভেঙ্গেছে কপাল কাল পদ ভরে।" (ঐ)

—বঙ্গবিধবার অবর্ণনীয় দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কবি যেন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

(১৭)
"হারায়েছে সতী প্রাণ পতিধন
হরে নিল বিধি অবলা রতন,
তাই রে ভাসিছে নয়ন সলিলে
জুড়াও বালারে সুমধুর বোলে।" (ঐ)

সমাজের একশ্রেণীর মানুষের হৃদয়হীনতাকেই কবি বিধবার দুঃখকষ্টের মূল কারণ মনে করে তাদের সহানুভূতি উদ্রেকের উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

(১৮)
"এ বিষাদ ছবি নয়নে হেরিলে
দহে না কি হৃদি অনুতাপানলে?
রে ভারতবাসী তাই বলি তোরে
রেখো না এ ছবি নয়ন অন্তরে।
কে রাখিবে এবে তোরা না রাখিলে,
কে দিবে রে অন্ন বদন কমলে,
কে ঢাকিবে আর বারিদ নয়নে,
এ সারল্য ছবি ভুল না জীবনে।" (ঐ)

এই রচনা অত্যাচারিত মানুষের পক্ষ নিয়ে মানুষের বিদ্রোহ ঘোষণা। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, সমাজ ও সংসারের পরিপন্থীও নয়। উল্লিখিত চিন্তার

প্রতিফলন রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৭-৭৮) 'মহিলা'[১২] কাব্যে।

সমাজের স্বার্থে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও পরিবারের স্বার্থে বিধবাবিবাহ প্রচলন অনিবার্য। কাজেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন, সে সমস্ত অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদের প্রতি কবির আন্তরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটেছে কবিতাটির নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে :

(১৯৭)

"শাস্ত্রের বিধানে যদি কর কেহ বল,
নয় শাস্ত্রে অনুরাগ কেবল সে ছল।
পালিতেছে শাস্ত্রের বিধান কোন্ জনা
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া যাহা,
ব্রাহ্মণ কি করে তাহা,
তবে কেন কর শুধু অবলা পীড়ন।
বিশেষতঃ শাস্ত্র মর্ম বুঝে কয়জন।"

বিধবা সমস্যার বাস্তবচিত্র প্রতিফলনে কবির তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনার পরিচয়ও কবিতাটিতে পাওয়া যায়।

(২০০)

"বয়স্থা বিধবা নারী ঘরে আছে যার,
দেখ দেখি কোন্ দিন সুখ আছে তার।
পিতামাতা দহিতে সে জ্বলন্ত অনল।
অন্তরের ক্ষোভ ভরে,
সদা সে কলহ করে,
জ্বালাতন করিবারে সদা চায় ছল,
যারে সুখী দেখে তারে ভাবে পরদল।।"

উদ্দেশ্যমূলক এ কবিতাটি সমকালীন চিন্তাশীল জনমানসে অনুরূপ চিন্তাভাবনার বিকাশে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) 'বিধবা রমণী'[১৩] কবিতায়।

কবিতাটির প্রথম ছত্রে যৌবনবতী বিধবার রূপবর্ণনার মধ্যে কবির হৃদয়বেদনার সুন্দর পরিচয় পাই--

"আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে।
কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে।" (বিধবা রমণী)

১২. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মহিলা', (সং ১২৮৯), (১৯৫-২০৩ ছত্র)

১৩. কবিতাটি প্রথমে 'এডুকেশন গেজেটে' (১২৭৫, ১৬ ফাল্গুন) 'বিধবা' নামে প্রকাশিত হয়।

নারীর প্রতি কবির এ বেদনাবোধই তাঁকে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলেছে,

"পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে,
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে?" (ঐ)

নিষ্ঠুর দেশাচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই হিন্দুর দুর্গতির মূল কারণ মনে করে কবি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—

"ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার,
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে।
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।
দেখ রে দুর্ম্মতি যত, চিরম্লেচ্ছ পদানত,
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।" (ঐ)

নারীর প্রতি অবমাননাই হিন্দুর সর্বনাশের মূল কারণ। এমনকি রাজনৈতিক পরাধীনতার কারণও। রাজনৈ পরাধীনতা কবিচিত্তকে কিরূপ অহরহ দগ্ধ করত, উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় পাই।

বিধবা রমণীর প্রতি কবিহৃদয়ের সুগভীর শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ঘটেছে নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে,

"সোনার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির,
লিখিতাম নিম্নদেশে 'কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে'।" (ঐ)

যুগসমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধ, স্বাধীনতাস্পৃহা, তার বাস্তবায়নে অসামর্থ্য ইত্যাদি মানবিক গুণ থাকলেও, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনোভাব, সর্বোপরি অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়োচ্ছ্বাস কবিতাটিকে সার্থক গীতিকবিতার গৌরব হতে বঞ্চিত করেছে। তবে কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে গীতিকবিতার শান্ত মন্ময় সুর ধ্বনিত হয়েছে :

"অনাথা বিধবা দুঃখ রবে চিরকাল।
আমার অন্তরে গাঁথা, যখনি দেখিব
সুগন্ধ কুসুমে কীট, তখনি কাঁদিব ;
রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র পতন
যখনি দেখিব, হায় করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ !..." (ঐ)

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য হেমচন্দ্রের এ জাতীয় কবিতায় বায়রনের প্রভাবের[১৪] কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বায়রনের ন্যায় হেমচন্দ্র রোমাণ্টিক বিষাদকে আয়ত্ত করতে পারেননি। অর্থাৎ বিষাদের গভীরে উপনীত হতে পারেননি। এর ফলে কবির ব্যক্তিগত

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য', (সং ১৩৭৭), পৃ. ২৩২

দুঃখ ব্যক্তিগতই রয়ে গেছে, তা কল্পনাসমৃদ্ধ হয়ে সর্বহৃদয়সংবাদী হয়ে ওঠেনি।

কাব্যগত এসব ত্রুটি সত্ত্বেও কবিতাটি একসময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভাবপ্রবণ বাঙালির মুখে প্রায়ই শোনা যেত[১৫]—

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ রে।"

কখনও কখনও গোধূলি সময়ে মাঠ থেকে ফেরার পথে রাখাল বালকরা সুর করে গাইত, "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা।"

'ভারত কামিনী' কবিতাটিতেও বিধবাদের প্রতি কবির আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষের চিত্র প্রতিফলিত :

"বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ,
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।"

বিধবাদের প্রতি কবির শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় 'কামিনী কুসুম' কবিতায়। সার্থক গীতিকবিতার ধর্মও কবিতাটিতে বর্তমান—

"অধরে অমিয়া ধরি হৃদে ধরি বাসনা
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা।"

উদ্ধৃতিটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে শ্রদ্ধেয় সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি, "হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, যে মাধুর্য্য আছে, তাহা অবর্ণনীয়।"[১৬]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তও হেমচন্দ্রের কবিতার জনপ্রিয়তার[১৭] ঐ একই কারণ নির্দেশ করেছেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমকালীন কবিমানসকে কীরূপ আলোড়িত করেছিল তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি', 'কে তুমি', ও 'অবলা বান্ধব' কবিতায় কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) বিধবাদের প্রতি সমকালীন সমাজমনে সহানুভূতির তরঙ্গ উত্তোলনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' কবিতাটি রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন, "ছাত্রাবস্থায় তাঁহার কোন ব্রাহ্মবন্ধু তাহার ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া এই বিধবা চাকরানী দেখিয়াছে। দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে দেশাচার রাক্ষসী হইতে হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছে। নবীনচন্দ্র এই বিষয় শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া উক্ত কবিতা রচনা করেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে দিয়া উহা 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি উহা গেজেটে প্রকাশ করেন।[১৮]

১৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', (সং ১৩৬০), পৃ. ১৬০-৬৩
১৬. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'কবি হেমচন্দ্র', (সং ১৩১৮), পৃ. ২৪৯
১৭. R. C. Datta, 'Literature of Bengal', p. 218
১৮. দ্রঃ নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', (দ্বিতীয় সং, ১৩১৯), ১ম ভাগ, পৃ. ১৪৮

কবিতাটি লিখবার পূর্বে নবীনচন্দ্রের মনে ঘটনাটি সম্পর্কে যে কৌতুক ছিল, রচনায় তার সন্ধান পাই না। বরং করুণ গাম্ভীর্যের স্পর্শ রয়েছে কবিতাটির প্রতি ছত্রে।

(৮)

"মলিন বদন আহা! মলিন বসন,
মলিন রূপের আভা মলিন বরণ,
চন্দ্রমুখ হইয়াছে কালির বরণ।
এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন!"

'এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন'—কবির এ জিজ্ঞাসাই তরঙ্গ তুলেছিল উনিশ শতকে শিক্ষিত তরুণ বাঙালির হৃদয়ে। বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনে যার প্রথম প্রতিকারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে কবি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে। এছাড়া ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য সাহিত্যের মানবতাবাদও তাঁর হৃদয়কে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেছিল। নিষ্ঠুর দেশাচারের প্রতি দেশবাসীর অন্ধ আনুগত্যই বিধবার জীবনে বিপর্যয়েরও মূল কারণ। এ বিপর্যয় থেকে মুক্ত করে সুস্থ সমাজগঠনের ভূমিকায় তাকে নিয়োজিত করতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কর্ণধারের। উপযুক্ত কর্ণধার ছাড়া এ বিপদ-সাগরে পাড়ি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তা প্রতিফলিত :

(২৬)

"নিরাশ্রয় অবলার জীবনের তরী,
পড়ে দেশাচার ঝড়ে নিরাশা সাগরে,
বিনা কর্ণধার আহা! বাঁচিবে কি করি,
নিশ্চয় ডুবিবে পূর্ণ-যৌবনের ভারে।"

কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' প্রবন্ধের প্রভাব বর্তমান :

"আর কতদিন আহা! আর্য্য সুতগণ,
ভুলিয়া থাকিবে পাপ মোহের ছলনে।
কতদিন দেশাচার দুর্লঙ্ঘ বন্ধন,
পবিত্র মানিয়া তারা রাখিবে যতনে?"

এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে........।"[১৯] ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়।

বিধবা রমণীর পূত চরিত্র কবিহৃদয়ে কিরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল, কবিতাটিতে তার পরিচয় পাই। তাঁর মতে, এসব মহিলা বঙ্গের গৌরব, সকলের নমস্য, দেবেরও দুর্লভ ধন। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রতিমূর্তি বঙ্গবিধবার প্রতি কবি আন্তরিক

১৯. 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', (সমাজ, ১৩৪৫ সং), পৃ. ১৮৬

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে :

"দেবের দুর্লভ এই কুসুম রতন।"

কিন্তু কবি এখানেই থেমে যাননি। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও তার বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন :

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ঝাঁপ দিতে জলে,
বাঁচাইতে প্রাণপণে করিয়া যতন,
কিন্তু মিথ্যা এই ঝড়ে পড়িলে অতলে,
কার্য্য সিদ্ধ না হইবে, যাইবে জীবন।"

কাজেই এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিসন্ধানী কবি শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছেন,

"আ লো স্মৃতি! আর কেন? নয়ন আমারে,
প্রেমের সুবর্ণরঙে ; চিত্রেছ যে ছবি,
অতল বিস্মৃতি জলে ডুবাও তাহারে,
দেখিব না আর তারে সাক্ষী শশী রবি!"

বিধবাদের দুঃখকষ্টে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিচলিত হলেও প্রবল সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে বিধবাকে স্বাভাবিক সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করার মতো শক্তি না থাকায় এঁরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করেছেন। উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় পাই।

'কে তুমি' কবিতায় কবি শারদ আনন্দের পটভূমিতে বিষণ্ণ বঙ্গবিধবার হৃদয়বেদনা চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শারদীয় উৎসবে দেশব্যাপী আনন্দের অংশ নিতে বাংলাদেশের দুঃখিনী বিধবা অসমর্থ। সমাজপীড়িতা বিধবা বঙ্গনারীর ব্যর্থ জীবনের এ শূন্যতা, তার হৃদয়বীণায় আনন্দের শিহরন না জাগিয়ে বেদনার সুর ঝঙ্কৃত করে। বঙ্গবিধবার বিষাদময় জীবনের এ কারুণ্য কবিচিত্তকে কিরূপ বেদনাহত করেছিল, নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তার পরিচয় মিলবে :

"বাজিতেছে যেই আনন্দ সংগীত
বঙ্গ চিত্ত যন্ত্রে কাঁদাইল কেন
তোমার হৃদয় বীণা? তোল মুখ,—
বল না, কে তুমি?"

নারীসমাজের উন্নতির জন্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৭৬ সালে 'অবলাবান্ধব' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবীন সেনও 'অবলাবান্ধব' নামে একটি কবিতা লিখে নারীসমাজের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"কেবল অনাথা যত বিধবা কামিনী
তাহাদের সমদুঃখে হইয়া দুঃখিনী
কিম্বা পতিপ্রেমে দুঃখী যেই অভাগিনী
তোমাকে শুনাব তাঁর বিষাদ কাহিনী
....হাহাকার।"

কবি মানবতাবাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, উদ্ধৃতিগুলিতে তা চোখে পড়ে। তবে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো শৈল্পিক সংযমের অভাবও[২০] সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিধবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও আন্তরিক বেদনা প্রকাশিত হয়েছে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮-১৯২০) 'বিধবা নারী', 'আমি কে?', 'পাগলী বিধবার গান' ও 'বিধবার আরসী' কবিতায়।

বিধবাবিবাহকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন না জানালেও কবিতাগুলিতে বিধবাদের প্রতি কবি-হৃদয়ের বেদনামিশ্রিত শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ঘটেছে, যা সমকালীন সমাজমানসকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পেয়েছিল। অশুভ-শক্তির প্রতীক বলে চিহ্নিত সমাজের এ শ্রেণীর ভাগ্যাহত রমণীর হৃদয়বেদনাকে উপশম করে, স্বাভাবিক সমাজজীবনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হয়েছিল। এদিক থেকে কবিতাগুলি বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক মনে করে আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

'বিধবা নারী' কবিতাটি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, "পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা কন্যা মাতৃকম্পা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর আদর্শে 'বিধবা নারী' রচিত। তাঁহারি পাদপদ্মে ইহা অর্পিত হইল।"[২১]

কবিতাটিতে কবির এ উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অনুসৃত হলেও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে লেখা এ কবিতাটিতে নারীত্বের পূর্ণাদর্শ অঙ্কিত হয়েছে, যা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই :

পুণ্যহৃদয়া বঙ্গবিধবা দেবপ্রতিমা তুল্য। ত্যাগ ও সেবাধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। মর্ত্যলোকে বা কেন? দেবতাদেরও তিনি নমস্যা। জ্ঞানময়ী, ভক্তিময়ী, তপোব্রতে ব্রতী, বঙ্গবিধবা সাবিত্রী, অরুন্ধতী, গায়ত্রী প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় যে কোনও প্রাতঃস্মরণীয় রমণীর সমকক্ষ। পরিবারে তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। অনাথ আতুরের সেবায় তাঁর পবিত্র হস্ত সদা প্রসারিত। এককথায় বঙ্গবিধবার দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধুর্যে শ্রদ্ধাবনত কবিহৃদয় বিস্মিত। কবির এ বিস্ময় ভাষা পেয়েছে নিম্নোক্ত ছত্রে,

"দেবী কি মানবী উনি? কাহাকে সুধাই রে?"

কেননা, তাঁর মতে 'এহেন পুণ্যের ছবি বিশ্বমাঝে' বিরল। কবিতাটির অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলিতেও কবিহৃদয়ের অনুরূপ চিন্তাভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে :

"প্রশান্ত ললাট! নাহি সিন্দুরের ছটা,
তবু যেন ঝল্‌মল্‌ প্রভার কি ঘটা।
উষার সীমন্ত দেশে শুক্র তারকাটি,
লাজে সে গো গেছে সরি, হেরি পরিপাটি
মুখ বালার্কের ওই মহিমা কিরণ।

২০. 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১২৮১, পৃ. ৩১৯-২৮

২১. দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'অশোকগুচ্ছ', (দ্বিতীয় সং, ১৩১৯), 'বিধবা নারী', পৃ. ৭

শ্রী অঙ্গেতে হার, কাঞ্চী, বলয়, কঙ্কণ,
নাহি আর, তারা যেন কিছুদিন থাকি,
পবিত্র দেহের ওই রেণুকণা মাখি,
হ'য়ে গেছে সুপবিত্র! হই রে উদাসী,
নির্জ্জন আঁধারে এ যে তারাও সন্ন্যাসী!
দেবদ্বিজ গুরুজনে ; প্রাণমন সমর্পণে
পূজিছেন! হেরি তাঁরে পুণ্যময় হই রে,
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে!"

'পাগলী বিধবার গান', 'বিধবার আরসী' ইত্যাদি কবিতাতেও বিধবাদের প্রতি কবি-হৃদয়ের সুগভীর বেদনা ও গভীর সহানুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিশেষ করে বিধবার মলিন আরসী, সধবাজীবনে যেটি ছিল তার সবচেয়ে আদরের ধন, আজ তা সঙ্গীহীন, মৌন। মলিনতাকে আভরণ করে প্রিয়বিরহের অব্যক্ত বেদনা বুকে নিয়ে কোনওমতে সে টিকে আছে। তার অভিযোগ, বিধবা একবারও তার খোঁজখবর নেয় না। আরসীর এ মোহভঙ্গ হতে দেরি হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে, বিধবার দোষ নয়, তারা দুই সতীন একসঙ্গেই পতিহারা। বিধবার সমদুঃখে দুঃখী হয়ে আরসী শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করে,

"ভুল ভুল 'সখী' নয়, সে মোর 'সতীন' হয়,
সবকথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হয়েছে ভোর ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
একদিনে দু'সতীনে হারায়েছি স্বামী।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলন সহানুভূতিশীল মানুষের হৃদয়দ্বারে কি নিদারুণ আঘাত হেনেছিল, উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় মিলবে। কাব্য যে নিছক কবিকল্পনা নয়, কবির হৃদয় মন্থনজাত অমৃতরস, কবিতাটি পাঠে পাঠকের তা উপলব্ধি হবে।

বিধবার অসহায়তার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মানকুমারী বসুর 'পতিতোদ্ধারিণী' কবিতায়। সমাজ ও সংসারে বিধবারা কিরূপ অসহায়, কবিতার মাধ্যমে তা তুলে ধরে সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি লাভে কবির এ প্রয়াস অভিনব না হলেও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ কবিতাটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। আমরা এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে
কখন সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘরবাড়ী আমাদের তরে।
যে পড়ে তার ঠাঁই নয়।
অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙ্গিবে,
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কিছু উঠিতে চাহিবে
ছি ছি ; তার হাত না ধরিব।
সুখের সাধক মোরা আত্মসুখ দাস
সে পতিত পথের কাঙ্গালি।"

বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিরুদ্ধে আমরা হয়তো স্তূপীকৃত প্রমাণ জড়ো করতে পারি, কিন্তু নারীকণ্ঠের এ মৃদু তিরস্কারের জবাবের ভাষা কই?

বিধবাবিবাহের সমর্থনে সে সময় পত্রপত্রিকাতেও একাধিক কবিতা লেখা হয়েছিল। কবিতাগুলির বিস্তারিত আলোচনা না করে পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম ও পত্রিকার নাম, প্রকাশকালসহ উদ্ধৃত করছি :

'বিধবা বামার শোকোক্তি',	'বামাবোধিনী',	শ্রাবণ,	১২৭৭
'বিধবা সম্পর্কিত' (শ্রী শ্রীরাম পালিত)	'ধর্মরক্ষিণী সমাজ',	জ্যৈষ্ঠ,	১২৭৮
'বিধবা সম্পর্কিত'	'হালিশহর পত্রিকা',	মাহ অগ্রহায়ণ,	১২৭৮
'বিধবা রমণী'	'সাধারণী',	ফাল্গুন,	১২৮০
'আমি ত বিধবা' (শ্রীমতী কামিনী দেবী)	'বঙ্গমহিলা',	অগ্রহায়ণ,	১২৮৩
'বঙ্গবিধবা' (জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি)	'বান্ধব',	৪র্থ সংখ্যা,	১২৮৫
'বঙ্গবিধবা' (শ্রী দু. না. চ.)	'আর্যদর্শন',	বৈশাখ,	১২৮৮
'বিধবার প্রার্থনা'	'নবজীবন',	আষাঢ়,	১২৯২
'বালবিধবার কথা'	'অনুসন্ধান',	৩১ শ্রাবণ,	১২৯৬
'বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে লেখা'	'পূর্ণিমা',	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৩০৩

॥ ২ ॥

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতার চিত্র প্রতিফলিত রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গাঙ্গনা' কাব্যে। কাব্যটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 'ভারতী' পত্রিকায়[২২] প্রকাশিত একটি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। কাব্যটিতে জনৈক বিধবা পত্রাকারে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছে,

"নবীনা যোগিনী আমি হয়েছি সংসারে,
এ নবীন সুবয়সে ফেলিয়াছি দূরে
কঙ্কণ বলয়, কাঞ্চি অলঙ্কার যত!
মুছি সিন্দূরের বিন্দু! শঙ্খের বলয়া
ভাঙ্গি আহা প্রাণেশ সমাধি স্থলোপরে।
পরিছি ধবলবস্ত্র, লোহিত ত্যজিয়া।
একাহার নিরামিষ। কৃতাঞ্জলি পুটে
একমনে জপিতেছি মুদ্রিত নয়নে—
মহামন্ত্র 'রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর'।"

বঙ্গবিধবা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার আদর্শস্বরূপ। কাজেই পত্রটিতে প্রকাশিত আবেদন 'রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর' সমর্থনযোগ্য নয় বলে আমাদের বিচারে বিবেচিত। পত্রটির বাকি অংশ হল এই যে,

২২. রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গাঙ্গনা', ১ম খণ্ড (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা), 'ভারতী', শ্রাবণ ১২৮৫

"—হে বিদ্যাসাগর!
এক রত্ন যত্ন করি দিয়াছ মোদেরে—
বিধবাবিবাহ গ্রন্থ। বহ্বাশিনী মোরা।
পেয়ে সে দুর্ল্লভ বস্তু মন্থন বিহনে,
ভাবিলাম না জানি মথিলে লাভ কত?
তেঁই আরম্ভিনু দেব, মথিতে তোমারে
এত যত্নে মানস অনন্ত, সুরাসুর—
আশ্বাস বিষাদ, শৈল মৈনাক লেখনী ;
না হই বঞ্চিত যেন পতি রত্নলাভে।"

রূপক ভেঙে সাদাসিধা অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, বিদ্যাসাগররূপ সাগরগর্ভে, লেখনীরূপ, 'মৈনাক শৈল প্রোথিত করে মন্থন করলে পতিরত্ন' উৎপাদিত হলেও হতে পারে, অন্তত বিধবার আশা তাই। বিধবাবিবাহকে যাঁরা সমর্থন করেননি, তাঁদের আন্তরিক বিদ্বেষের জীবন্ত ছবি ছাড়া একে কি বলব!

উল্লিখিত কবিতাটি ছাড়া আরও একাধিক কবিতায় বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হল। বিরুদ্ধে লেখা কবিতাগুলির মূল বক্তব্য এই যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে নারী সমাজের পবিত্রতা নষ্ট হবে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, বিশেষ করে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিয়ে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হবে। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ ধরনের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

"দেশের সর্বনাশ এবারে
দেশের যত সাধ্বী সতী, সব হ'বে অসতী,
অসতী নারীর যদি হয় গতি,
পাপ পথে কেনা করবে গতি মতি, হাই কোর্টের নজীরে।
বিধি ছিল ধনী লোকের লোকান্তরে,
ধর্ম্মিণীর ধর্ম্মলোপ হলে পরে,
সে ধন পেতো জ্ঞাতি বন্ধু বংশধরে, পাবে না এর পরে।
কুলটা হ'লে এখন কোন মাগী,
আগে যদি থাকে বিষয়ের ভাগী,
আর সে হবে না বৈভবত্যাগী বাবাজীদের বিচারে
এ বিধি না হ'লে জ্ঞাতি করে কোপ,
সতীকে অসতী দেবে দোষারোপ,
সতীদের স্বত্ব হয়ে যাবে লোপ, হাকিমেরা চক্র করে।
....ইত্যাদি।"[২৩]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা কবিতাগুলির আলোচনা থেকে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ল তা হল এই যে, সাহিত্যের অন্য বিভাগে বিধবাবিবাহ

২৩. 'বিধবাবিবাহ', বৈষ্ণবচরণ বসাক, 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' (সং ১২৯৯), পৃ. ৪৯৪-৯৬

আন্দোলনের যে প্রবল বিরোধিতা করা হয়েছিল, কাব্যে তা ততটা প্রবল নয়। বালবিধবার দুঃখ বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে মর্মবেদনার তরঙ্গ তুলেছিল তা সে যুগে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার থেকে আরম্ভ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু প্রমুখ প্রতিভাবান কবিদের কাব্যে বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কবিতাগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও, সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই পাঠকের কাছ থেকে বিদায় নেয়নি, তাদের সাহিত্যমূল্যও বর্তমান।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫০-১৯০০)

বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাস হল ১৮৫৬ সালে। কিন্তু বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলনে প্রবল বাধা দেখা দিল, যেহেতু একে মেনে নেওয়ার মতো চিন্তাভাবনা, এককথায় সামগ্রিক প্রস্তুতি, সমাজে তখনও আসেনি। বিধবাদের বেদনা, তাদের জীবনের অপচয় জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরপন্থীরা উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হলেন—দেখলেন নাটক এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ বাহন; কাজেই তাঁরা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। একদল রক্ষণশীল মানুষ এর প্রবল পরিপন্থী হলেন। তাঁরাও নাটকের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরলেন। কাজেই বিধবাবিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা হল একাধিক নাটক। বিধবাবিবাহ সমাজে প্রবর্তনের প্রয়োজনের তাগিদে উমেশচন্দ্র মিত্র লিখলেন 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬)। 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, "to aid a good but not a very popular Cause."[১]

নাটকটিতে দু'টি কাহিনীর একটিতে বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী রক্ষণশীল সমাজপতি কীর্তিরাম ঘোষের বালবিধবা কন্যা সুলোচনার পদস্খলন ও পরিণতিতে শোচনীয় মৃত্যুজনিত পারিবারিক অশান্তি, ও অপরটিতে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যা প্রসন্নর দ্বিতীয়বার বিবাহে জটিলতর পারিবারিক সমস্যার সহজ সমাধান যুগপৎ চিত্রিত করে বিধবাবিবাহের সমর্থনে নাট্যকার নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েছে। বালবিধবা সুলোচনা বিভিন্ন সূত্র থেকে সে সংবাদ পায়। বিশেষ করে তারই সমবয়সী বিধবা প্রসন্নর দ্বিতীয়বার বিয়ের সংবাদে তার মানসিক চাঞ্চল্য ঘটে। সুলোচনার মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গুরুতর সামাজিক প্রশ্নের যে স্বরূপ নাট্যকার তাঁর নাটকে তুলে ধরলেন তা হল—"রাঁড়ের বে কি সর্বত্র চলবে? এই একটা বে হচ্ছে, দেখি্স দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্তা বলবেন এ বে'র পুরুত, বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত। তাই, সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা একবার ভুলেও ভাবেন না যে, বিধবা হয়ে কতলোক কত কি কচ্চে, যারা কিছু না করে ধর্মপথে আছে, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বলো দেখি?"

১. উমেশচন্দ্র মিত্র, 'বিধবাবিবাহ', ৪র্থ সং, ১২৮৫, পৃ. ৭—৮০

চিত্তসংযমে অসমর্থা পূর্ণযৌবনা সুলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবেশী যুবক মন্মথর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বিধবা বলে সহজ পথে তার বাসনার চরিতার্থতায় প্রবল সামাজিক বাধা থাকায় গোপনে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে বহুদিন পরে চুল বাঁধে, টিপ পরে, সে নব সজ্জায় সজ্জিত হয়। মূল নাটক থেকে সুখময়ী ও সুলোচনার বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে সুলোচনার বুভুক্ষু হৃদয়ের পরিচয় মিলবে,

"সুখময়ী। মা দেখতে পেলে গাল দিয়ে ভূত ছাড়া করবে। একে ত ও পাড়ায় রাঁড়ের বে হয়েছে শুনে কদিন আপনা আপনিই কত বক্‌তেছেন, তাতে তোর চুল বাঁধা টিপ পরা দেখলে কাকেও আস্ত রাখবেন না। কাল রেতে শুনতে পাচ্ছিলুম কর্তা বলতে ছিলেন, বিধবার বের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ, শুনতে লজ্জা করে, ভাবতে লজ্জা করে, এ কর্ম কি ভদ্রলোকে করবে।

সুলোচনা। অমন দেশাচারের মুখে আগুন। শুনতে লজ্জা করে, ভাবতে লজ্জা করে, এসব কথা বলা সহজ বটে কিন্তু যারা যন্ত্রনা সয় তারাই জানে, এ দেশে বিধবা হওয়া কি পাপের ভোগ। দাসীবৃত্তি ক'রে কাল কাটানো ভাল, দিনান্তে অর্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণধারণ করা ভাল, এ দেশে বিধবাবিবাহ হওয়া ভাল নয়। 'ভেবে দেখ আমাদের বেঁচে থাকবার ফল কি? পোড়া দেশের লোক এদিকে শাস্ত্র দেখান যে, স্ত্রীলোকের স্বামী বই গতি নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি ভুলেও ভাবে না? কথায় কথায় ধর্ম দেখায়, ধর্ম যে কিসে থাকে, তা দেখে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে। তা ভাই যে যা বলুক, আমাদের তো কিছু বলবার যো নাই। কথায় বলে বেঁধে মারে সয় ভাল। আমাদেরও তাই হয়েছে।"

গোপন প্রণয়ে সুলোচনা গর্ভবতী হয় এবং নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝতে পেরে লোকলজ্জায় বিষপান করে। কন্যার মৃত্যুতে মাতা পদ্মাবতী দুঃখ করে বলেন, "আমরা মেয়ে মানুষ শাস্ত্রের কিছু বুঝিনে, কিন্তু এ বেশ বুঝতে পারতেছি যে, ও পাড়ার প্রসন্নর মতো যদি মেয়েটার বে হত, তাহলে তো আর এ দায় ঘটত না।"

পদ্মাবতীর মাধ্যমে নাট্যকার রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজে বিধবাবিবাহ অনুমোদনের মনোভাব দেখেছেন।

সুলোচনার মৃত্যুতে কীর্তিরাম নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তাঁর খেদোক্তি :

"হায়। সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে এ বিপদ কদাচ ঘটিত না, ...আমি বিধবাবিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি এক্ষণে আমাকে এই স্ত্রী হত্যা পাপের অংশী হইতে হইল।"

চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় পাই। নাটকটিতে নাট্যকার কীর্তিরামের মুখে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে নিজ অভিপ্রেত প্রচার কার্য চালালেও তার মানসিক পরিবর্তনের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা একান্তই স্বাভাবিক।

সুলোচনা চরিত্রটিও যে কাল্পনিক নয়, সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত বক্তব্যের ভিত্তিতে তা জোর করে বলা যায়। সুলোচনার মতো অনেক বুভুক্ষু বিধবাই আইন পাসের সংবাদে নিজেদের লাঞ্ছিত বৈধব্য জীবনের অবসানের কম-বেশি স্বপ্ন দেখেছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে 'শ্রীবিদ্যা' নাম্নী জনৈক মহিলা লিখিত এ ধরনের একটি পত্রের

কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,

"আপনার দিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবাবিবাহ চলিত হইবেক বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে। আমার শরীরে স্বামী সুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিন যে বাঁচিয়া থাকিব এমত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে, মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব। কারণ যদি আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শতশত স্বামীহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব।"[২]

সুলোচনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোহিণী, কুন্দনন্দিনী, বিনোদিনী ও কিরণময়ীর অগ্রজা। আমরা যদি তাকে ভুলে যাই তাহলে কোন পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে যে এদের আবির্ভাব হয়েছে তা বুঝতে পারব না।

উদ্দেশ্যমূলক এ নাটকটিতে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশের সমকালীন বিধবাবিবাহ আন্দোলনে নাটকটি সমাজমনে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, মঞ্চসাফল্যই তার প্রমাণ। ১৮৫৯ সালের ২৩ এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর দলের যুবকগণ কর্তৃক মেট্রোপলিটান থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়ের পরিচয় দিয়ে 'বেঙ্গল হরকরা' মন্তব্য করে,[৩]

"অভিনয় রাত্রি আটটায় আরম্ভ হয় ও তিনটা পর্যন্ত চলে। ইহাতে প্রায় পাঁচশত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এরূপ একটি নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীরা যে চিরবৈধব্য ভোগ করে তাহার কুফল এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যথার্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।"

মঞ্চসাফল্য যদি কোনও নাটকের সাফল্য বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে 'বিধবাবিবাহ' নাটকটি সেদিক থেকে চরম স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার প্রমাণ ঐ বছরেই ৭ মে তারিখে 'বিধবাবিবাহ' নাটকের পুনরাভিনয়ে।

নাটকটির একাধিক সংস্করণও নাট্যকারের সাফল্যের পরিচায়ক। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২২ বছরে নাটকটির ৪টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যায়, নাট্যকারের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাই দীর্ঘ ২২ বছর পরও সমাজের একশ্রেণীর মানুষের কাছে নাটকটির চাহিদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

নাটকটির সর্বস্ব যে প্রচারধর্মিতাই নয়, তার একটা সাহিত্যের দিকও ছিল, 'সংবাদ প্রভাকরের' নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে তা অনুমান করা যায় :

"বাঙলাভাষায় এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এ নাট্যাভিনয় দেখে অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি।"[৪]

মাঝে মাঝে পদ্যপঙ্ক্তি থাকলেও নাটকটির ভাষা শক্তিশালী। এমনকি 'ভদ্র' চরিত্রগুলি যেখানে সাধুভাষায় কথা বলেছে, তাও প্রাণের স্পর্শশূন্য নয়। বিশেষ করে

২. 'সম্বাদ ভাস্কর', ২১ আগস্ট ১৮৫৬

৩. H.N. Dasgupta, 'Indian Stage', Vol.2 (1946), p. 88

৪. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৭ মে, ১৮৫৯

'কুলীনকুলসর্বস্ব'র কৃত্রিম ভাষার পাশে 'বিধবাবিবাহ' নাটকের সজীবতা নাট্যকারের উচ্চতর সৃজনী ক্ষমতার পরিচায়ক।

এসব কথা বিচার করে বলা যায় যে, ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের মধ্যে এটি বিশেষ গুরুত্ব দাবি করতে পারে। এককথায়, রসসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত এ নাটকটি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ফসল।

উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের পথ অনুসরণ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে (বেশি) ও বিরুদ্ধে (কম) যে সমস্ত নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম প্রকাশকাল সহ উল্লেখ করছি :

সমর্থনে	বিরুদ্ধে
'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৬), উমেশচন্দ্র মিত্র	'তরুবালা' (১২৯৭), অমৃতলাল বসু
'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	'বাবু' (১৩০০), অমৃতলাল বসু ইত্যাদি
'বিধবামনোরঞ্জন' (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্র	'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪), গোলাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি
'বিধবাপরিণয়োৎসব' (১৮৫৭), বিহারীলাল নন্দী	
'রামনবমী' (১৮৫৭), গুণভিরাম শর্মা	
'বিধবাবিরহ' (১৮৬০), শিমূয়েল পিরবক্স	
'চপলাচিত্ত চাপল্য' (১৮৬১), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	
'দলভঞ্জন' (১৮৬১), হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
'ম্যাও ধরবে কে' (১৮৬২), হরিশচন্দ্র মিত্র	
'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬২), হরিশচন্দ্র মিত্র	
'বিধবাবিলাস' (১৮৬৪), যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	
'বঙ্গকামিনী' (১৮৬৮), হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
'এ্যঙ্কসন্তাপিনী' (১৮৭৬), জনৈক ভদ্রমহিলা	
'বঙ্গবিধবা' (১৮৮২), বিরাজমোহন চৌধুরী	
'বিধবা' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	

সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে এদের অধিকাংশ ব্যর্থ হলেও, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নাটকগুলি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে যে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের আলোচনার সাহায্য নিয়ে আমরা সে বিষয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি।

বিধবাবিবাহ আইন পাসের চার বছর পর লেখা 'বিধবাবিরহ' (১৮৬০) নাটক।[৫] নাট্যকার শিমূয়েল পিরবক্স একজন খ্রিস্টধর্মান্তরিত মুসলমান। বিধবাসমস্যা থেকে ব্যভিচারের সৃষ্টি হয় এমত প্রচারের উদ্দেশ্যেই নাটকটি লিখিত।

কাহিনীতে দেখি, উমাচরণ বাঁড়ুজ্জের মেয়ে মনোমোহিনী বালবিধবা। বিধবা হয়ে

৫. নাটকটিকে মনোমোহিনী ও মনোহরীর কথোপকথনের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ায় ড. সুকুমার সেন নাটকটির রচনাকাল ১৮৫৭-৫৮ অনুমান করেন।— ড. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় সং, ১৩৬১, পৃ. ৪৬

অবধি পিতৃগৃহেই অবস্থান করে। প্রতিবেশী বিধবাদের চরিত্র স্খলনের সংবাদ তার কানে আসে, সে এতে অবাক হয়। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই সে পথ ধরে। নঙ্গরা নামে এক নীচ জাতীয় যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে সে গর্ভবতী হয়। প্রতিবেশীরা তার চালচলনে সন্দেহ প্রকাশ করলে, সে কিছু টাকা নিয়ে নঙ্গরার সঙ্গেই নিরুদ্দেশ হয়। রক্ষণশীল সমাজপতি উমাচরণ বাঁড়ুজ্জে তাঁর কন্যা মনোমোহিনীর গৃহত্যাগের ঘটনায় বিধবাবিবাহের গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এবং লোকলজ্জায় দেশত্যাগী হন। যাওয়ার সময় বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে সনাতনপন্থী স্বজাতীয় হিন্দুদের উদ্দেশ্যে কালীতলায় একটি পাঠ লিখে যান। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তা উদ্ধৃত করছি :

"হে দেববংশ হিন্দু লোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক, এই জন্য তোমাদের নিকট নিবেদন এই যদি কুলশীল জাতিমান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্র যাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।"

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ আইন তেমন কোনও সাড়া জাগায়নি। আইন পাসের চার বছর পরেও তাই বিধবাবিবাহ ব্যাপার একটি 'জনরব' মাত্র। বাস্তবে যে কখনও বিধবার বিবাহ সম্ভব হতে পারে তা অনেকেই চিন্তা করেননি। নাটকটির অন্যতম চরিত্র সুখদা তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে,

"সুখদা। হেঁগা মা, স্বামী মলে আর বিয়ে কত্তে নাই। তবে যে বাবা সেদিন বলছিলেন যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে মনোহারীর আরবার বিয়ে দিব, তবে মনোহারী দিদির আবার কেমন করে বিয়ে হবে তারো ত স্বামী মরেচে?

মাতা। সে একটা কথার কথা বিধবাদের বিয়ে হবে এমন একটা গুজব উঠেছিল তাই তোর বাবা বলেছিলেন—যদি বিধবাদের বিয়ে হয় তবে মনোহারীর আরবার বিয়ে দিব। কই তা ত আর হল না, তবে কি করে তার আর বিয়ে হবে?"

উদ্দেশ্যমূলক এ নাটকটিতে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। 'ভদ্র' চরিত্রের মুখে সাধু ভাষার প্রয়োগ, অশিক্ষিত অন্তঃপুরবাসিনী কুল ললনাদের মুখে চলতি ভাষা প্রয়োগ স্বাভাবিক। ভাষার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা বর্জন করার পূর্ব প্রস্তুতি নাট্যকারের মধ্যে ছিল, নাটকটির ভূমিকায় তা তিনি প্রকাশ করেছেন, "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, রচনা করিয়া ইহার নাম 'বিধবাবিরহ' নাটক রাখিলাম।" ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬৬।

নাটকটি উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকের ওপর অনেকাংশে ঋণী। বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা নিয়ে তর্কালঙ্কার ও ভট্টাচার্যের কথোপকথন থেকে তা অনুমান করা যায়।

বিধবাবিবাহ নিয়ে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন। রক্ষণশীলরা যুক্তি, তর্কে পরাভূত হলেও বিচলিত হননি। অপরপক্ষে সংস্কার-পন্থীরা মুখে বিধবাবিবাহ সমর্থন করলেও কাজে ততটা দেখাতে পারেননি। এই তথ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার মধ্যে নাট্যকারের বাস্তব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে লেখা তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিত্ত চাপল্য' (১৮৬১)। বিধবাবিবাহ আইন পাসের পাঁচ বৎসর পর নাটকটি লেখা হয়। এই পাঁচ বৎসর ব্যবধানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বিধবাবিবাহ কম-বেশি

সমর্থন লাভ করেছে, নাটকটিতে বর্ণিত জনদরদী উদারপন্থী জমিদার বাসব রায়, নিষ্ঠাবান, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভূদেব ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিধবার বিয়েতে সম্মতিদানের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাহিনীতে দেখি, জমিদার বাসব রায়ের কন্যা চপলা। সে বালবিধবা। বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ায় বাসব চপলার বিয়ে দেবেন মনস্থ করেন এবং এ বিষয়ে নাটকটিতে বর্ণিত অন্যতম চরিত্র সুদেবের পরমার্শ চান। সুদেব এতে সম্মত হন এবং ভূদেবের ছেলে চারুকে পাত্র নির্বাচন করে ভূদেবের মত চান। ভূদেব এতে সম্মত হন। বিয়ের সমস্ত আয়োজন গোপনে চলতে থাকে। তিনদিন পূর্বে দেওয়ান রাঘব মজুমদার ও কুলপুরোহিত তর্কালঙ্কারকে বাসব সেকথা জানান। মাত্র দু'দিন পরে বিয়ে, সুতরাং এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না। এ ছাড়া সুদেব ও ভূদেব দু'জনই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অথচ তাঁদের বিধবাবিবাহে আপত্তি নেই, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও এঁরা মত দেন এবং অধ্যাপকদের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে উদ্যোগী হন। বিবাহবাসরে চপলা বর দেখে অবাক! কামিনীকে দিয়ে গোপনে সে যার তত্ত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেছে সে-ই হয়ে গেল তার বর।

সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে অনেক বিধবাই বাধ্য হয়ে অবাঞ্ছিত বৈধব্য জীবনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও এতে তাদের মনের কোনও পরিবর্তন আসে না। নাটকে বর্ণিত বিধবা বিনোদা ও মোক্ষদার কথোপকথনের মধ্যে তা প্রকাশ করে নাট্যকারের দেশাচারের অন্ধ ভিতকে টলাতে চেয়েছেন।

বাল্‌বিধবা চপলার চালচলনে সমালোচনা করেছে পাড়ার অন্য বিধবারা। তথাপি ঐ সব বিধবাদের জীবনযন্ত্রণা ছিলই—তার স্বীকৃতি মেলে প্রতিবেশী বিধবা বিনোদা ও মোক্ষদার কথোপকথনে :

"বিনোদা। আমি ভাই পুজো করি বটে, কিন্তু মন্তর টন্তর সকল সময় মনে থাকে না। ফুলচন্দনই জলে ভাসাই।

মোক্ষদা। তুমি ভাই মনের কথা বল্লে, ভাই আমিও বলি, আমিও ত একদিন সব মন্তর পড়ি না, হোলো ধ্যান কল্লেম তো জপ সমাপন কল্লেম না, এমনি তো প্রায়ই হয়।"

বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যাসাগর যে সামাজিক ব্যভিচারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, নাটকে বর্ণিত মালিনীর বক্তব্যে তার সমর্থন পাই। বিধবাবিবাহ আইন পাসে মালিনী ভাবে, এবার তার ব্যবসা উঠ্‌লো। বিধবার বিয়ে প্রচলিত্ হলে "পেট বাঁধলে ওযুধ খাবেই বা কেন। তা যদ্দিন না হয়, আমার পক্ষেই ভাল।"

বিধবাবিবাহ আইন পাসে রক্ষণশীলদের কাল্পনিক আতঙ্কের প্রতি নাট্যকারের ব্যঙ্গও উপভোগ্য। নাটকে বর্ণিত অন্যতম স্ত্রী চরিত্র কামিনীর স্বামীর এ বিষয়ক বক্তব্য শোনা যাক। কামিনীর স্বামী নাকি বলেছে,

"পোড়া কি এক সাগর, তার জ্বালায় মাগনে নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার যো নেই। যে বিধবা বের বিধি দিয়েছে। এখন আবার মেয়েগুলোর মন যুগিয়ে চলতে হবে, তা না কল্লে বিষ খাইয়ে কি আর কোন রকমে মেরে ফেলে, আর একটা বে কর্বে।"

ছয় অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকটিতে নাট্যকার বিধবার দুঃখময় জীবনের চিত্র, অধিকন্তু নতুন দিকও তুলে ধরেছেন, তা হল বিধবার অনুরাগ বর্ণনা। ফলে করুণ রস তো বটেই, সেই সঙ্গে আদিরসেরও আধিপত্য ঘটেছে। তবে চপলা ও চারুর প্রেম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে বর্ণনা করায় বিদগ্ধ সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ নাটকটি 'অনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন।[৬] রসসাহিত্যের বিচারে উদ্দেশ্যমূলক[৭] এ নাটকটি ত্রুটিমুক্ত না হলেও এর মধ্যে অন্তঃপুর রমণীদের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বাস্তব। সেদিক থেকে বিচার করলে নাট্যকার আমাদের প্রশংসা লাভে বঞ্চিত নন।

বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গবিধবা' (১৮৮২) রূপক নাটকটির এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিধবার বিবাহ অপেক্ষা চিত্তসংযম শ্রেয়[৮] একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা অভ্রান্ত নন, যেহেতু মতটাকে ধারণ করার মতো পুরুষশক্তির সমাজে একান্তই অভাব। পুরুষের উত্তপ্ত কামনা বাসনার হাত থেকে অসহায় নারীদের উদ্ধারের একমাত্র পথ বিধবাবিবাহ প্রচলন। নাট্যকার রূপকের মাধ্যমে তা তুলে ধরে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন, যদিও বহু বিধবার চিত্রসংযমের দিকটি উপেক্ষা করেননি।

অধর্মের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যারম্ভ—

"অধর্ম। কি ছাড় নাশিতে
বিধবা সতীত্ব দহিতে তাদের প্রাণে
বিষম বৈদগ্ধ্য অগ্নি করি প্রজ্বলিত
যুঝুক আমার সনে, যে থাকে সে আসি।"

অধর্ম, শঠতা, স্বার্থপরতা, এরপর রতি ও কামকে আহ্বান করে রতি ও কামকে বলল, "শুন রতিকাম তোমাদের শরাঘাতে ঐ কামিনীর হৃদয় জরজর করবে, তা হলে সে সহজেই আমার বশে আসবে। তোমার ঐ শরের প্রভাবে ত্রিলোক উন্মত্ত হয়, একটা সামান্য বঙ্গকুমারীকে পরাজিত কর্তে পারবে না?"

পৃথিবীতে এসে কাম বলল—

"কাম। শুনেছি বঙ্গকামিনীরা বড় সতী। পতির বিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করে না। আজ তাদের সতীত্বরত্ন হরণ করব।" এরপর কাম অধর্ম, শঠতা ও স্বার্থপরতাকে নির্দেশ করল :

"প্রাচীন যে শাস্ত্র তাহা করি লণ্ডভণ্ড
সৃজিবে তাহার স্থানে নব নব বিধি
নবমত যাতে বঙ্গ যায় রসাতলে
আর দেখ প্রবেশিবে বঙ্গনারী হৃদে,
প্রতি তন্ত্রে থাকিবে তোমরা। সুকৌশলে যাবে।
বিচিত্র মোহিনী জাল বিস্তারিয়া
বধিবে জীবনে।"

৬. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের কথা', পৃ. ৬৩

৭. বিজ্ঞাপনে নাট্যকার বলেছেন—"এমত অবস্থায় ও / অসংলগ্ন অবস্থা / ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।"

৮. দ্রঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বৈধব্যব্রত', 'ভূদেব গ্রন্থাবলী', একাদশ সং, পৃ. ১৬০। দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য'।

এইভাবে অধর্ম, রতি, কাম ইত্যাদির প্রচেষ্টায় বঙ্গবিধবার মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, নাট্যকার মর্মস্পর্শী ভাষায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন,

"বিধবা। আবার আমার যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। জ্ঞান। তুমি বঙ্গের বিধবা যেন চিরদিনই উন্মাদিনী থাক।

বিধাতা। কেন তুমি ভারতে নারীজাতির সৃষ্টি করেছ? যদি সৃষ্টিই করলে তবে কেন পুরুষের ন্যায় কঠিন হৃদয় করলে না। তোমার দোষ নাই, আমাদেরই কর্ম দোষ। যত মহাপাপীদিগকে ভারতে নারীজাতি করেছ, আমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্চ নরকাগ্নিতে দগ্ধ কচ্ছ। স্বার্থপরতা! এ বঙ্গে এ ভারতে তুমিই আজ রাজা। সকলই তোমার দাস হয়ে রয়েছে। ধন্য তোমায়। ধন্য তোমার ক্ষমতার, তোমার মহিমায় কেহ পরের দুঃখ দেখতে পায় না, অনুভব কর্তে পারে না, বুঝতেও পারে না।"

"যত মহাপাপীদিগকে ভারতে নারীজাতি করেছ" —নাট্যকারের এ অভিযোগ বিদ্যাসাগরেরই অনুরূপ, "হা অবলাগণ। তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।"

নাটকটির পরিসমাপ্তিতে দেবকন্যাদের উক্তিতে বঙ্গবিধবাদের দুঃখের প্রতি নাট্যকার সমবেদনা জানিয়েছেন :

"উঠ রে দুখিনী বিধবাকামিনী
প্রভাত যামিনী।
অবসান দুখ, হল তব ধনী
চিরদিন তরে দেখ, উদে দিনমণি।
ঐ দেখ কত, বঙ্গ কুলনারী
বসনভূষণ অঙ্গে পরিহরি
নাবিক বিহনে, যেন কাষ্ঠতরী
ভীষণ সংসার সুগভীর বারি
দেখিয়ে ভয়েতে, কাঁপে থরথরি
ভাসিছে টলিছে, ডুবিছে সুন্দরী
দুলিছে গলায় সতীত্বের হার।
বঙ্গের বিধবা অবলা কামিনী
হেরিলে তাদের মুখ সরোজিনী
মুহূর্তের তরে গলিবে তখনি
অসুর হৃদয় পাষাণ তিনি ॥"

বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা নাটকগুলি আলোচনা করলে একটা দিক আমাদের চোখে পড়ে ; তা হল এই যে, বিধবাবিবাহের সমর্থনে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা কেবল বিধবাদের যৌন সমস্যার কথা ভেবেই বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন। অথচ এর একটা অর্থনৈতিক দিকও ছিল, যার জন্য বিধবাবিবাহ অনিবার্য। নাট্যকাররা একটু সচেতন হলে তা দেখাতে পারতেন। আন্দোলনের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্বও তাহলে অধিক বৃদ্ধি পেত।

॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগর-অনুরাগী নাট্যকাররা যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে কলম ধরেছিলেন তখন রক্ষণশীলরাও চুপ করে থাকেননি। তাঁরাও নাটক নকশার মাধ্যমে বিধবাবিবাহের সর্বনাশা অথবা হাস্যকর পরিণতি দেখিয়ে আন্দোলনকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হলেন। এ ধরনের একটি প্রয়োজনের তাগিদেই রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'বাবু' নাটকটি (১৮৯৪) লিখলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা নাটকগুলির মধ্যে এটিই সবদিক থেকে জোরালো। বিধবাবিবাহ ব্যাপারটাকে নাট্যকার মাত্রাতিরিক্ত বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। নাটকে বর্ণিত কন্দর্পকান্তির বৃদ্ধা আজিমাকে পুনরায় বিয়ে দেওয়ার হাস্যকর পরিস্থিতির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে তার পরিচয় মিলবে :

"কন্দর্প। আজিমা, আরে রোজ, তোমার কতই বিরহ আইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাজবানা। দ্যাহত কতদিন না অইল তুমি ইল্‌শা মাছের ঝোল মুহে দাও নাই। তোমার যে কি ক্যালেশ অইচে বুজতি পারছ না, সৈভ্যা অইলেই বোজবা।" (৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

কতিপয় সভ্য মহিলার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিতর্কিত প্রসঙ্গটিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

"বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি ওই রে।
স্বাধীনা ভগিনী মোরা, প্রেমরসে প্রাণ মোরা
আঁব যেন বর্ণচোরা বীরদর্পে আয় তোরা।
উদ্ধারিব ওরে রে।
ছুঁড়ি, বুড়ি বঙ্গে আর রাঁড়ী নাহি রবে রে।
উড়াব উন্নতিধ্বজা কত মজা পাব রে ॥"

কিংবা– "ঠানদি তোমায় সাজাব লো ক'নে...।"

বিধবাবিবাহকে ঠানদিদির বিবাহের প্রতীক ধরে অমৃতলাল ব্যঙ্গবিদ্রূপের আসর জমিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলতার জয় ঘোষণা করেছেন :

"ছি ছি ছি হবো না আর ঘরের বার।
কুলবালা কুলে রবে মুখে আগুন সভ্যতার ॥"

সমসাময়িক কালে অমৃতলালের 'বাবু' নাটকটি সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটির মঞ্চসাফল্যই তা প্রমাণ করে। 'বাবু' নাটকটির অভিনয় প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান'[৯] পত্রিকা লেখে,

"বসুজ মহাশয়ের ওস্তাদী হাত 'বাবু' চিত্রে প্রস্ফুটিত। দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়, ছবি না, যেন জীবন্ত সত্য দেখিতেছি বলিয়াই বোধ হয়।"

'বাবু' প্রহসনের মর্মবাণী সমাজে কতখানি প্রচারিত হয়েছিল, স্টার থিয়েটারে 'বাবু'-র পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে অভিনন্দন তা প্রমাণ করে।

'Indian Daily News'[১০] লেখে, "The Farcial play, Baboo the best of

৯. 'অনুসন্ধান', ১৫ ফাল্গুন, ১৩০০

১০. 'The Indian Daily News', 31. 12. 1895

its kind that has appeared on the Bengali stage occupied the board of the Star Theatre and drew a full house."

'বাবুর' অভিনয় সম্বন্ধে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লেখে,

"বাবু'র অভিনয় পূর্ব্বের ন্যায় সতেজে চলিতেছে।...এরূপ বর্ষার সময় স্টার রঙ্গমঞ্চে যে প্রতি অভিনয় রাত্রিতেই লোকারণ্য হয়, ইহা থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।" (১৫ ভাদ্র, ১৩০০)

মনীষী হরিনাথ দে ১৯০৯ সালে 'হেরাল্ড' পত্রে 'বাবু'র ইংরেজি অনুবাদ বের করতে থাকেন। ১৯১১ সালে বোর্ড অব একজামিনার্স-এর সুপারিনটেনডেণ্ট নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। অনুবাদটি পাঠ করে অযোধ্যার সীতাপুর থেকে পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তশর্মা হিন্দিতে 'বাবু' অনুবাদের অনুমতি চেয়ে একটি পত্র লেখেন। সমসাময়িক এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষ দশকেও বিধবাবিবাহের বিপক্ষে বড়রকমের সমর্থন ছিল, তাই একশ্রেণীর মানুষের কাছে এ-ধরনের নাটকের চাহিদা তখনও অক্ষুন্ন ছিল এবং এজন্যই তা সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা অমৃতলাল বসুর দ্বিতীয় নাটক 'তরুবালা' (১২৯৭)। বিধবার বিয়ে অপেক্ষা সংযমই শ্রেয়, 'তরুবালা' নাটকে বেণী শান্তার উপকাহিনীতে তা দেখিয়ে নাট্যকার বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, বিধবার আদর্শসমূহে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের নীতি-নির্দিষ্ট একটি দিকও উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপকাহিনীটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম :

"শান্তা। হিঁদুর ঘরে বিধবা বে করাই পাপ।

বেণী। শান্তা, এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন। তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা, দু'জনেই আবার বিবাহ করেছিল।

শান্তা। হা হা হা। বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন রাক্ষসী আর একজন বাঁদরী।" (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

"বেণী। যথার্থ বলছি, তোমায় না পেলে বাঁচ্‌বোনা, তবে দিন দিন একটু একটু করে মরা কেন যদি তুমি আমার হতে স্বীকার না কর, তবে তোমার সামনে এখনই মরবো— বল আমার হবে, না হয় এই দেখ ছুরি। এখনই তোমার সামনে বসিয়ে দিই।

শান্তা। তা যদি পারো, তাহলে ভগ্নীকে কুকথা বলবার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে।

বেণী। বল আমি মরি।

শান্তা। বুঝতে পেরেছ যা করেছ, তাতে তোমার মরাই ভালো। আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারি সহমরণ প্রথা নাই, নইলে যেদিন পতি মরলো, সেই দিনই হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম। এখনও প্রাণ সেই পতির পায়ে। শূন্য দেহখানা লয়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই, আর তুমি এই দেহের জন্য নরকে যেতে রাজী, তোমার সাধ্য কি যে তুমি মর।" (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

"বেণী। শান্তা শান্তা। তোমার মত সতী আমি দেখিনি। আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি, লম্পট নই—এবার আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলছি, তোমার মত স্ত্রী হলে আমি আর এক মানুষ হতেম, সংসারে একটা আদর্শ হতেম।" (চতুর্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

বিধবা শান্তার মুখে এই সংলাপ স্পষ্টতই নাট্যকারের বিধবাবিবাহ-বিরোধী নিজস্ব মতবাদ। যদিও এর কোনও শিল্পসঙ্গত অনিবার্য সংযোগ নাট্যমধ্যে নেই—তথাপি 'তরুবালা' নাটকের সামাজিক বক্তব্য রক্ষণশীল সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।[১১]

উনিশ শতকের শেষ দশকেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রবল বাধা ছিল, নাটকগুলির অভিনয়ে মঞ্চসাফল্য তা প্রমাণ করে।

১১. 'Indian Mirror', 19.12.1890

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস (১৮৫০-১৯০০)

উপন্যাস সাহিত্যে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন হয়েছিল নাটকের অনেক পরে। যেহেতু সাহিত্যের এ দুই শাখার প্রকৃতিগত ও শিল্পমূল্যগত বিভিন্নতা রয়েছে, তাই প্রচারধর্মী নাটকের পক্ষে যেভাবে আন্দোলনের উত্তাপ ও উত্তেজনাকে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব, সাহিত্যের অন্য কোনও শাখার পক্ষে তা সম্ভব নয়, উপন্যাসের পক্ষে তো নয়ই।

দ্বিতীয় কারণস্বরূপ অনেকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রক্ষণশীলতাকে দায়ী করেন। এমনকি "বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী।"[১] এ মন্তব্যও অনেকে করেছেন।

আমাদের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না। যেহেতু তৎকালীন সমাজমন এর অনুকূলে ছিল না, তাই সমাজ নিষিদ্ধ বিধবাবিবাহকে জোর করে সামাজিক স্বীকৃতি না দিয়ে, পরোক্ষভাবে সমাজমনকে এর অনুকূলে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বঙ্কিম যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সে সময়ে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয় (১৮৫৬)। আইন পাসকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে যে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল বঙ্কিম তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে তাঁর বক্তব্য, আইন পাস করে বিদ্যাসাগর এ দেশের শাস্ত্রজ্ঞান ও দেশাচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ভিতকে টলাতে যেরূপ ব্যস্ত ছিলেন, সমাজমনকে এর অনুকূলে প্রস্তুত করার দিকে ততখানি মনোনিবেশ করেন নি। সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বহিরঙ্গ চিকিৎসার থেকে অভ্যন্তরীণ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাই 'Hindu Widow Act'-এর ব্যস্তবতা স্বীকার করে বঙ্কিম লিখলেন :

"আইনের দ্বারা এ প্রথা কি ভাবে নিবারিত হওয়া সম্ভব?" বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের মত সমাজসংস্কার আন্দোলনের সাহায্যে জাতীয় জীবনে নতুন কীর্তিস্থাপনে "যাদৃশ ব্যগ্র সমাজের গতি পর্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।" বিদ্যাসাগরের উদ্যমের অপচয় সেজন্যই এত মর্মান্তিক।

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, সং ১৯৬১, পৃ. ১৪২

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটি জনমত ও বিচারবোধ মানুষের মনে যখন গড়ে উঠেছে ঠিক তখনই বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিতর্কিত বিধবাবিবাহকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু করলেন। সুতরাং এটি যে তাঁর উদ্দেশ্যমূলক রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেশাচারের সঙ্গে সন্ধি করে প্রথম 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৯) উপন্যাসে সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর লড়াই করেছেন দেশাচারের বিরুদ্ধে। সমবেদনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে মন্থন করেছেন শাস্ত্র। কিন্তু বঙ্কিম মানুষের হৃদয়ে ধীর স্থিরভাবে সে আবেদন পৌঁছে দিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে 'বিষবৃক্ষ'।[২] কিন্তু কেন? সে কি বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতা? অথবা সেদিনের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এর মধ্যে নিজেদের ধ্যানধারণার মূর্ত প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়েছিল? এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ "The Novel ...was to be found in the Baitak Khana of every Bengali Babu."

সেদিনের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বঙ্কিমকে যেভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, সমাজ নিষিদ্ধ বিধবাবিবাহের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক বৈধ আবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ'[৩] উপন্যাসে। বিধবার চিরবৈধব্য যাঁরা সমাজের স্বার্থে মঙ্গল বিবেচনা করেন, তাঁদের বক্তব্যের স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, সমকালীন প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে। উপন্যাসে যা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

"বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্যে পুরুষের চির পত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?" তৃতীয় নয়ন মেলে সমালোচক যদি হীরা, কুন্দ, রোহিণীকে দেখেন তাহলে অনুভব করতে পারবেন যে, এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবেদন নিয়ে বিচারের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। তাতেই বিবেকবান মানুষের আকুল আত্মজিজ্ঞাসা ও সন্দেহ, 'রোহিণীকে মারিলেন কেন?'

কুন্দ ও রোহিণীর বলি না হলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। বিধবাদের সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব সমাজে গড়ে উঠত না। কাজেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশেষ 'টেকনিকের' সাহায্য নিয়েছেন। সরাসরি নয়, পরোক্ষভাবে তিনি মানুষের হৃদয়ে এর আবেদন পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্যই তিনি কৌশলে কুন্দকে বিধবা করেছেন এবং তাঁর অকালমৃত্যুর মধ্যে একটা ইতিবাচক শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজে তখনও অনুকূল চিন্তাধারা গড়ে ওঠেনি। তাই বঙ্কিমের অভিযোগ—

"বিধবাবিবাহে অধিকারিণী বটে কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার ফলে অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্মের অনুরোধে ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারাই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়।...

...ইহা কাহারও অনিষ্টকর নহে এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।" (সাম্য)

২. 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩৮

৩. ড. দীপক চন্দ, 'বিধবাবিবাহ' 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র', 'স্ফুলিঙ্গ', নববর্ষ ১৩৮৫

'বিষবৃক্ষের' তাই প্রায় পাঁচ বছর পরে লিখলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৯)। বিধবা প্রেমের এক নবতর সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল উপন্যাসটিতে। রোহিণী এ উপন্যাসের নায়িকা, বঙ্কিমের ইতিবাচক শক্তির আধার সে। রোহিণী তাই অন্য চরিত্রগুলি থেকে একটু স্বতন্ত্র। পূর্বে আলোচিত বিষবৃক্ষের হীরা হিংসাপরায়ণ, নির্মম নিষ্ঠুর রূপে চিত্রিত। মানুষের বেশি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য সে নয়। কুন্দও সেখানে দুর্বল, ভীরু, সঙ্কুচিতা, নির্ভরশীল। অনুগ্রহের প্রত্যাশী বলেই সর্বসাধারণের দরদ ও সহানুভূতি উদ্রেক করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্কিমের অব্যক্ত অভিপ্রায়কে সার্থক করেছে রোহিণী। রোহিণী আত্মসচেতন নারী। গোবিন্দলালের কাছে সহজেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে প্রেমে চরিতার্থ হতে চেয়েছে। এর কারণ গোবিন্দলাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিধবাবিবাহের সমর্থক।

রোহিণী ভুল বুঝেছিল গোবিন্দলালকে। গোবিন্দলাল মূলত প্রগতিশীল নয়, সে ভণ্ড, কাপুরুষ। মুখে বিধবাবিবাহের সমর্থক হলেও, কাজে তা দেখানোর মতো চারিত্রিক বলের অভাব। যেহেতু বহুবিবাহকারীর সামাজিক অমর্যাদার কোনও কারণ তখনকার সমাজে ছিল না, কাজেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে অপরিচিত স্থানে অবৈধ সহবাসের প্রলোভন ত্যাগ করে, সামাজিক মর্যাদা দিয়ে বিবাহ করে ঘরসংসার করতে পারত। সেক্ষেত্রে হয়তো কোনও অমূলক সন্দেহের উদ্রেক হত না—রোহিণী হত্যার যা অনিবার্য কারণ। গোবিন্দলালের ন্যায় ভণ্ড সংস্কারকের চক্রান্তে ধরা দিয়ে অসহায় বুভুক্ষু বিধবারা অনিবার্যভাবে যে সামাজিক নির্যাতন ভোগ করেছিল, রোহিণী তাদের একজন মাত্র।

গোবিন্দলাল চরিত্রটি উপস্থাপনার পেছনে রয়েছে মানবদরদী বঙ্কিমের সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনার প্রকাশ।

রোহিণী যদি কলঙ্কিনী হয়, গোবিন্দলালও নিষ্কলুষ নয়। কিন্তু প্রসাদপুরে রোহিণী ও গোবিন্দলালের একত্র অবৈধ সহবাসের শাস্তি বিধানের জন্য সমাজ-উপেক্ষিতা রোহিণীকেই গুলিবিদ্ধ হতে হল। অথচ নিশাকরের সঙ্গে তার কয়েক মিনিটের সাক্ষাতের মধ্যে আপত্তিকর বা আসক্তির কোনও ঘটনা ছিল না। বরং বৃদ্ধ খুড়োর প্রতি মমত্ববোধই এর মূল কারণ।[৪] গোবিন্দলাল বিবেচক হলে তা বুঝতে পারত। এখানে বঙ্কিমের বক্তব্য,

"তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো।" (সাম্য)

শরৎচন্দ্র সেজন্য সখেদে বলেছেন, পাপের শাস্তিবিধানের জন্য এই যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, এর ফলে শুধু রোহিণী মরল না, তার সঙ্গে মরল "সত্য সুন্দর art।"

১৩৩০ সালে শ্রাবণ মাসে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,

"তাহার (রোহিণীর) মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আপত্তি আছে তাহা নয়, কিন্তু আগ্রহও নাই, বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন।"[৫]

তিনি সেখানে থামলেও হয়তো বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত সমর্থক কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনাকারীর পক্ষে কোনও উত্তর না দিয়ে উদাসীন থাকাও চলতে পারত।

---

৪. দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৫. 'বঙ্গবাণী', ২য় বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩০, 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', পৃ. ৬৮৪

কিন্তু ১৩৩১ সালে পৌষ মাসে পুনরায় শরৎচন্দ্র রোহিণী ও তার মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

"মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করি নে, কিন্তু তার অকারণ, অহেতুক অপমৃত্যুর জন্য আক্ষেপ! ...উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানীতে তার মরা চলে না।"[৬]

বঙ্কিমের সমাজজ্ঞান ছিল প্রখর, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সুনিবিড় সম্পর্কের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমকে বুঝতে ভুল করেছেন।

আমরা যদি একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব বঙ্কিম যা করেছেন, সেটাই সাহিত্যের মূল রীতি। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য চলতে পারে না, বঙ্কিম এ নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজের চাওয়া-পাওয়াকে সম্পূর্ণ বরণ করে নিয়ে সাহিত্যিকের কাজ হবে এর খাদগুলো মানুষের হৃদয়ের গোচরীভূত করা। বঙ্কিম তা করেছেন। যেটা সামাজিক সত্য সেটা দেখিয়েছেন।

তবে 'Art'-এর দাবি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ভুল মূল্যায়নের একটা সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বঙ্কিমের উদ্দেশ্যের চরিতার্থ।

"উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে...।"

শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য প্রকারান্তরে বঙ্কিমের জয় সূচিত করে। কারণ এ কাজ করতে বঙ্কিম বাধ্য হয়েছেন। কুন্দের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের অন্তরের সহানুভূতি এমনভাবে দেখা দিয়েছে যার ফলে সামাজিক আচার অপেক্ষা মানবের হৃদয়ের প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে, তথাপি বিধবা কুন্দের আইনসিদ্ধ বিবাহ সমাজের মানুষের মনে কোনও সাড়া জাগায়নি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' লেখক পুনরায় সে ভুল করলেন না। তাই 'art'-এর দাবি মেনে মানুষের মনে তার চূড়ান্ত আঘাত হানার নাটকীয় পরিকল্পনা করলেন। "তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।" (লেখকের স্বগতোক্তি)

অনেক সমালোচক রোহিণীর মৃত্যুর জন্য তার বৈধব্য অপেক্ষা ব্যক্তিচরিত্রকেই দায়ী করেন।[৭] তথাপি রোহিণীর মৃত্যুতে শতকণ্ঠে প্রশ্ন উঠেছে, "রোহিণীকে মারিলেন কেন?"

একাধিকবার এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে বঙ্কিমকে। শুধু স্পষ্ট করে মনের কথাটা খুলে বলেননি। কিন্তু অভিপ্রায় অব্যক্ত রইল না। মানুষের নিরন্তর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তার আবরণ উম্মোচন করল। সাফল্যের আত্মপ্রসাদ নিয়ে বঙ্কিম বললেন, "আমার ঘাট হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া অথবা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলে বাধ্য হই।"[৮]

এর অর্থ, যে সামাজিক পরিবেশের ছত্রছায়াতলে কুন্দ, নগেন্দ্র, রোহিণী, গোবিন্দলাল ইত্যাদি চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশ, সেখানে এদের ভালবাসার স্বতন্ত্র মূল্য আরোপ করার বিপত্তি অনেক। কারণ, সমাজকে বাদ দিয়ে চলা স্রষ্টা ও চরিত্রগুলির পক্ষে অসম্ভব।

৬. 'বঙ্গবাণী', ৩য় বর্ষ, পৌষ ১৩৩১, 'সাহিত্য ও নীতি', পৃ. ৫৩৫
৭. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনন ও সাহিত্য', পৃ. ১৭১
৮. শ্রী শিবানন্দ, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমালোচনা', সং ১৩৫৭, পৃ. ২৩২-৩৩

কাজেই, সমাজের যূপকাষ্ঠে চরিত্রে ব্যক্তিগত প্রেম ও ইচ্ছার বলি দিতে হয় এদের। আর সেই বলির নিষ্ঠুরতা মানুষকে করে বিচলিত। সমাজ সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে নতুন করে। ফলে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করলেন। জীবনের মূল্যকে নতুন চোখে দেখার, নতুন সত্যের আলোয় যাচাই করার এক দুর্মর আবেগ সৃষ্টি করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব পন্থা চরিত্রগুলিকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেয়নি। তাদের ব্যক্তিসত্তাকে মুক্ত করতে গিয়ে সমাজের নানা রীতিনীতি, প্রথা ও আচার কানুনের সঙ্গে এক অনিবার্য সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তিনি মানুষের মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রচনাকৌশলে এক্ষেত্রে নবচেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ফলে, এক নতুন প্রগতিশীল ভাবনার জন্ম হয়েছে সমাজে। শরৎচন্দ্রের আকুল জিজ্ঞাসাই তার প্রধান দৃষ্টান্ত। এ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম তাদের কাছে বঙ্কিমের আক্ষেপ : "যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন তবে বৃথাই এই আখ্যায়িকা লিখিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের লোকচরিত্র জ্ঞান ছিল প্রবল। তিনি জানতেন ট্র্যাজেডি যত কাঁদায়, ভাবায়, নাড়া দেয় —এত আর কিছু দিয়ে হয় না। তাই হীরা, কুন্দ ও রোহিণীর জীবনে 'ট্র্যাজিক এণ্ড'-এর বিশেষ প্রয়োজন। তাদের প্রতি সামাজিক সহানুভূতির এক ব্যাপক ক্ষেত্র, একমাত্র ট্র্যাজেডির ভেতর দিয়ে গড়ে উঠতেও পারে। কারণ, পাঠকের মনে সুতীব্র বেদনা জাগলেই সমাজ নাড়া খাবে। তাই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকরা বঙ্কিম-নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। বিধবাদের প্রতি সামাজিক সহানুভূতি জাগানো এবং তাদের দুঃখ ও অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটানো ছিল এইসব সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

বিধবার প্রণয়, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তার স্বাভাবিকতাকে সরাসরি স্বীকৃতি দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯১২) তাঁর 'শৈশব সহচরী' (১৮৭৮) উপন্যাসে। পূর্ণচন্দ্রের 'শৈশব সহচরী' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একই সময় ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) প্রকাশের মাত্র পাঁচ বছর পরে গ্রন্থটির প্রকাশ। কিন্তু কুন্দর মানসিকতার সঙ্গে 'শৈশব সহচরী'র কুমুদিনীর মানসিকতার তুলনা চলে না। কুন্দর প্রেম ছিল নিরুচ্চার, তার সমস্যাও ছিল ভিন্ন। কুন্দর বিবাহিত জীবনের পরিণতি বিষগ্রহণে আত্মহত্যা। কুমুদিনীর দাম্পত্যজীবন সার্থকতার গৌরবে দীপ্ত। কুমুদিনীর প্রণয়কে লেখক নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে বিধবা প্রণয়ের স্বাভাবিকতাকে এ উপন্যাসে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বিধবাবিবাহ বিষয়টির প্রতি সাধারণের সহানুভূতি উদ্রেকের প্রচেষ্টাও উপন্যাসটিতে বর্তমান। বিবাহ সভার বর্ণবিরল চিত্রের বর্ণনাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠকের অবগতির জন্য তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"বিধবার বিবাহ, বড় সমারোহ নাই। বালিকা কন্যা নহে বালক বর নহে—সুতরাং বাজনাবাদ্য রোশনা রোশনাই, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রের হুড়োহুড়ি নাই, লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই, উদ্‌যোগের বড় বাড়াবাড়ি নাই। বিশেষ বিধবার বিবাহ হিন্দুয়ানি ছাড়া কাজ, যে বরযাত্র বা কন্যাযাত্র আসিবে তাহারই জাতি যাইবে, লোকজনের বড় শব্দ নাই। সব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া—চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটি ঘরে একটি বিছানা হইল, লুকাইয়া

মালী একটা টোপর দিয়া গেল, লুকাইয়া নাপিত ও পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, লুকাইয়া স্ত্রী আচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী আচারে শাশুড়ির মন উঠে না। অন্ততঃ সাতটি এয়ো চাই নহিলে বরণ হয় না। বিধবার বিবাহ কেই বা আসে। কেহ আসিতে চায় না, হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন, সাতটি এয়ো জুটে নাই। তাঁহার মনটা চটিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন, পাড়ার মাগীদের ন্যাক্‌রা দেখে আর বাঁচি না। যা ত বিনোদিনী মাগীদের ডেকে আন্ গে ত। মাগীরা সে দিন কায়েতের ছেলের ভাতে লুচি মণ্ডা মেরে এলো আর আমার মেয়ের বিয়েতে আসতে পারে না। ...না আসে ত যা হবার তা হবে।” (সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃতিটিতে বিবাহসভার আড়ম্বরহীন চিত্র ছাড়া বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক দলাদলির ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এ দলাদলি উনিশ শতকে সমাজমনকে কিরূপ আলোড়িত করেছিল, আন্দোলন অংশে তার পরিচয় মিলবে। তবে এ শতকের আশির দশকে শিক্ষিত জনমানস যে এর অনুকূলে এসেছিল, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এমন দু-একটি দৃষ্টান্তের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিধবাবিবাহজনিত দোষে দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আহার বিহার বা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত কিনা। তা আলোচনার জন্য গ্রামে গঞ্জে একাধিক সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা এখানে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আলোচনা সভায় সভ্যগণের সিদ্ধান্তমূলক একটি ‘প্রতিজ্ঞাপত্র’[৯] উদ্ধৃত করছি :

“আমরা নিম্নের স্বাক্ষরকারিগণ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাদের জাতিমধ্যে শাস্ত্রসম্মত বিধবাগণের পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলন করিতে পারি সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিব। কোন কারণে অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ আমাদের উপর আরোপিত হইবেক এই নিয়মে ব্রাহ্মণ ও নিজ সমাজ সমক্ষে তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক আমরা নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।”

স্বাক্ষরকারীগণ— (১২৮৮, পৌষ, মালাপাঁতি)
শ্রীরামসুন্দর শীল (শিয়ালকোল)
শ্রীউদয়চন্দ্র শীল (ভট্টখাটা)
শ্রীবাঁশী শীল (ছোনগাছা)
শ্রীলুতীনচন্দ্র শীল (তেতুলিয়া) [প্রায় একশত স্বাক্ষরকারী]

উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থাপনে লেখক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। রজনীকান্তের প্রতি বিধবা কুমুদিনীর প্রেমের জাগরণ ও প্রতিযোগিতার ধাপগুলি মনস্তত্ত্বসম্মত। প্রথমে রজনীর প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান, পরে তার সত্যকার পরিচয় জেনে নিঃস্ব অবস্থাতেও তার প্রতি কুমুদিনীর সহানুভূতি ও প্রেমের জাগরণ ইত্যাদি বাস্তবসম্মত। তবে রজনীর সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহের দৃশ্যে পাঠকের চিত্তে কৌতূহল সৃষ্টির পরিকল্পনা অবাস্তব।

সামগ্রিক বিচারে ‘শৈশব সহচরী’ পূর্ণচন্দ্রের সৃজনীশক্তির স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে।

বিধবার প্রণয় ও বিবাহের সমর্থন রয়েছে প্রগতিশীল সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯), ‘মেজবউ’ (১৮৭৯) ও ‘যুগান্তর’ (১৮৯৫) উপন্যাসে।

৯. ‘বামাবোধিনী’, ১৫ আষাঢ় ১২৯৫

বামার অকালমৃত্যুজনিত দুর্ঘটনা, 'মেজবউ' উপন্যাসে বিধবাবিবাহ না ঘটার মূল কারণ।

'যুগান্তর' উপন্যাসে লেখক বিধবার বিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসটির ঘটনাকাল (১৮৫২-৫৯)।

১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচার করে সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। গ্রামে ও শহরে এ নিয়ে অনবরত জল্পনাকল্পনা চলতে থাকে। নসিপুরে তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে বিধবাবিবাহ নিয়ে মীমাংসা কালে তর্কভূষণ দেশাচারকেই প্রাধান্য দিলেন। প্রগতিশীল যুবক পঞ্চু বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পাণ্ডা হয়ে উঠল। 'শিবচন্দ্র' ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে পঞ্চু ও গোবিন্দকে বাড়ি আসতে নিষেধ করলেন।

১৮৫৬ সালের ২১ অগ্রহায়ণ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের মতানুসারে বিধবাবিবাহ করলেন। বৃদ্ধেরা বলতে লাগল, "এ হল কি। এ যে দেখি যুগান্তর উপস্থিত হল।"

বিধবাকে সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ও বিধবার জীবনাদর্শ সম্বন্ধে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে লেখক বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন। বিধবার অপরিতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি না হলে, তাকে কোনও মহত্তর গুণের অধিকারী করে তুলতে পারা সম্ভব নয়, উপন্যাসটিতে নবীন ও বিধবা কৃষ্ণকামিনীর আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রণয় ও পরিণতিতে বিবাহ সঙ্ঘটিত হওয়ার মধ্যে সেই সামাজিক কল্যাণের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগকামনা ও একমাত্র তা পরিতৃপ্তির জন্য যে বিবাহ, লেখক তার ঘোরতর বিবোধী। কাজেই বিধবা মাতঙ্গীর লালসাজাত প্রেমের ভয়ঙ্কর পরিণতির চিত্র উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত।

বিধবাবিবাহের মূল উদ্দেশ্য সমাজে অবহেলিত এ শ্রেণীর অসহায় নারীদের হৃদয়ের মহত্তর গুণের বিকাশ ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। বিবাহ ছাড়া অন্য উপায়েও যে তা সম্ভব, উপন্যাসটিতে লেখক তা দেখিয়েছেন। ব্রতচারিণী বিধবা বিন্ধ্যবাসিনী লেখকের এ উদ্দেশ্য সাধনে উপস্থাপিত।

বিধবা বিন্ধ্যবাসিনী গোবিন্দর প্রণয়ী। গোবিন্দ একমাত্র তাকেই বিয়ে করবে একথা স্পষ্টই জানায়। অথচ বিন্ধ্যবাসিনী গোবিন্দকে বিয়ে না করে 'কৃপাময়ী বিধবাশ্রমে' শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ ছাড়া স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে বিধবা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, এটাই লেখকের বক্তব্য।

বিধবার সংযম ও সতীত্বের প্রতি কীরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, উপন্যাসটিতে তার পরিচয় রয়েছে। বিধবা বিজয়ার চরিত্রটি উপস্থাপনার পেছনে এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়াস বর্তমান।

বিজয়ার শিক্ষাসংস্কার, চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বামীপ্রেম ও সতীত্ববোধ এবং পরবর্তীকালে নবরত্ন সভার সান্নিধ্য তার জীবনকে সংযম ও কর্তব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ব্যক্তিত্বদীপ্ত করে তুলেছে। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে নবরত্ন সভার অন্যতম উৎসাহী সমর্থক পঞ্চুর সঙ্গে বিজয়ার আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে এর পরিচয় মিলবে :

"বিজয়া। (পঞ্চুকে বললেন) তোমার কথা শুন্‌লে বোধ হয় যে বিধবার পক্ষে বিবাহ করাটা যেন পরমধর্ম।

পঞ্চু। ধর্ম বৈ কি! দেশাচারের যে অত্যাচার, তাতে দৃষ্টান্ত দেখান ত উচিত।

বিজয়া। (হাসিয়া) দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে বিবাহ্! এ কথা মন্দ নয়। বিবাহ্ করা বা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। বিধবারা বিবাহ না করে বৈরাগ্যধর্ম ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকে, সেই ত ভাল। দেশে বিবাহের কি অপ্রতুল আছে! বিবাহ্ করবার লোক ঢের আছে। বিধবাগণ পরসেবাতেই থাকুক।

পঞ্চু। আপনি এমন কথা বললেন? এ দেশের কোটি কোটি বিধবা কি দুঃখে দিন যাপন করছে একবার ভাবলেন না।

বিজয়া। দুঃখ দুঃখ করে রব তুললে হবে না, বিবাহ্ না করাটাই কি দুঃখ! বিধবারা বিবাহ্ করতে পারে না, এটা দুঃখের কারণ নয়, কিন্তু অধিকাংশ বিধবার করবার কিছুই নেই, সর্বদা পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন হয়ে থাকতে হয়। এটাই দুঃখের বিষয়। যারা আত্মীয়স্বজনের সেবাতে নিযুক্ত আছে, করবার কাজ যথেষ্ট আছে, আদর যত্ন আছে, তাদের বিবাহের দরকার কি? তোমরা স্ত্রীলোককে এত হীন মনে কর কেন যে তারা বিবাহের অভাবে দুঃখে মারা যায়। সুখান্বেষণ অপেক্ষা পরসেবা কি ভাল নয়?" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

একাধিক চরিত্র ও অজস্র ঘটনা উপন্যাসটিকে সংহতিহীন বৈচিত্র্য দান করেছে। গ্রন্থটিকে তাই উপন্যাস না বলে সামাজিক ঘটনাবলীর চিত্র বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। তবে লেখকের বাস্তববোধের,[১০] সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণবুদ্ধির ও গভীর মননশীলতার যে পরিচয় পাই তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

বিধবাবিবাহ নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের অকারণ ভীতিকে ব্যঙ্গ করে, আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাসে।

সামাজিক কুসংস্কারের হাস্যকর অসঙ্গতি আবিষ্কার করে তিনি এর অসারত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন, উপন্যাসটিতে তার প্রতিফলন বর্তমান।

বিধবাবিবাহের সংবাদে উপন্যাসটির অন্যতম নারী চরিত্র খেতুর মা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, বিষয়টিকে সে কোনওমতেই প্রশ্রয় দিতে চায় না। প্রতিবেশী তনু রায়ের স্ত্রীকে সে এ নিয়ে রীতিমত ধমকায়, "চুপ্ কর বোন। ...বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবরা যদি বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পারে না, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছিছি। ওমা। কি ঘৃণার কথা। এই বৃদ্ধবয়সে তাহা হইলে যাবা কোথায়? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়ে জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।" ('কঙ্কাবতী', সং ১২৯৯, পৃ. ৩৫)

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করে অনেকে বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। উপন্যাসটিতে বর্ণিত 'তনু রায়' এদের অন্যতন। মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির প্রতি লেখকের বিদ্বেষ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটেছে তনু রায়ের চরিত্রচিত্রণে।

'খেতুর মা' চরিত্রটিও বাস্তব। তবে পল্লীগৃহিণী খেতুর মার মুখে লেখক যে সাধুভাষা

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক সাহিত্য', সং ১৩৮৫, পৃ. ১১১

প্রযোগ করেছেন, তা অবাস্তব।

পত্রপত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা বের হয়। সমালোচকগণ লেখকের কল্পনাশক্তির[১১] বিশেষ প্রশংসা করেছেন। কেহ বা লেখকের নীতিবোধের দিক্‌টি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে বালক-বালিকার 'কৌতূহল উদ্দীপক' ও 'শিক্ষাপ্রদ' বলে অভিহিত করেছেন।[১২]

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, সে সময়ে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে[১৩] তার উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসটি লেখক নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

বিধবাবিবাহ আইনসম্মত, কিন্তু দেশাচার-বিরোধী। কাজেই হিন্দুসমাজ একে মেনে নেয়নি। মানবদরদী লেখকরা এগিয়ে এলেন। প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের সামাজিক জীবনকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করতে কলম ধরলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এঁদের একজন। স্বধর্ম ও স্বজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, অভাব ছিল না ধর্মের নামে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো সৎসাহসের। কাজেই বিধবার প্রণয় ও বিবাহ সঙ্ঘটনে কোনও বাধা দেখা দেয়নি উপন্যাসটিতে। বালবিধবা সুধার সঙ্গে শরতের প্রণয় ও পরিণতিতে বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়েছে। অবশ্য লেখক এ ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের দিকটি একেবারে এড়িয়ে না গেলেও ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শরতের মায়ের পুত্রের বিধবাবিবাহে মত দেওয়ার পেছনে দুটি ঘটনা বর্তমান, উপন্যাসটিতে তা সঙ্গতভাবেই চিত্রিত। প্রথমটি কন্যা কালীতারার অকাল বৈধব্য (কৌলীন্যপ্রথা যার জন্য দায়ী), দ্বিতীয়টি উমার অকালমৃত্যু। পল্লীবাসিনী মাতার হৃদয়ে যুগপৎ এ দুটি ঘটনা স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এর অব্যবহিত ফল গুরুদেবের পরামর্শ গ্রহণ ও পুত্রের মঙ্গল কামনায় বিধবাবিবাহে সম্মতিদান।

"বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।"—একথা তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের মুখে শোনাননি, শুনিয়েছেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতি লেখক কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় পাই।

বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তার দিকটি লেখক যুক্তিতর্কের অবতারণায় প্রতিষ্ঠিত করলেও, বিষয়টি সম্বন্ধে রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের বিদ্বেষের চিত্রও তুলে ধরেছেন, যা বাস্তব। শরৎ ও সুধার বিবাহের সংবাদে কালীতারার (শরতের ভগ্নী) খুড়শাশুড়ি রাগে গর্জে ওঠেন। কালীতারাকে শাসিয়ে বলেন, "বিয়ে হোক না, তোরই একদিন না আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোঁতা করে দেব না? তোর পিঠে মুড়ো খেংরা ভাঙবো না? মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে ঝাঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।" (একবিংশ পরিচ্ছেদ)

বিধবাবিয়ে সম্বন্ধে কালীতারার খুড়শাশুড়ির বক্তব্যকে আমরা যেভাবেই নিই না কেন,

১১. 'সাধনা', দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ভাগ, ফাল্গুন ১২৯৯

১২. 'অনুসন্ধান', ৬ পৌষ, ১৩০২ সাল, পৃ. ৮৫৫

১৩. প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার লেখক' (১ম ভাগ), পৃ. ৪৪

এ সম্পর্কে ঝিয়ের বক্তব্যকেও তখনকার হিন্দুসমাজ গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি। মূল উপন্যাস থেকে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি পাঠকের এ বিষয়ের কৌতূহল নিবৃত্ত করবে :

বিধবাবিবাহের সংবাদে ঝি বলে, "বিধবার আবার বিয়ে?... ওমা ছি! ছি! ছি! ভদ্দর নোককে দণ্ডবৎ, আমাদের ঘরে এমন কথাটা হলে তাকে একঘরে করে। ওমা ছি! ছি! ছি! এমন কলঙ্কের কথাটা কি কেউ কোথাও শুনেছে, এ ভদ্দরের ঘর? মুচি মুচুনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনেনি।" (একবিংশ পরিচ্ছেদ)

বিধবাবিবাহকারী সামাজিক অসম্মানের পাত্র। তাকে তাই সমাজচ্যুত করতে এবং যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে উনিশ শতকের আটের দশকেও সমাজপতিদের বিবেকে বাধত না।[১৪]

উপন্যাসটিতে লেখক বিধবাবিবাহকে প্রতিবাদহীন সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ায় আর্টের সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে। বিধবা সুধার সঙ্গে শরতের বিবাহ অতি সহজেই ঘটেছে উপন্যাসটিতে। এ ব্যাপারে লেখক কোনওরূপ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হননি। বিধবাবিবাহ তখনকার সমাজে অত সহজে ঘটা সম্ভব নয়। বিবাহের পর যখন সমাজে সমস্যাটি জটিল হয়ে ওঠার কথা, তখনই তিনি এর যবনিকাপাত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উভয়ে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, বিধবাবিবাহের সমর্থকও। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, বিধবাবিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি জানানোর ব্যাপারে এ দুই লেখকের মানসিকতার স্পষ্ট ব্যবধান চোখে পড়ে।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বহু নারীর ভাগ্যে এনেছিল অকাল বৈধব্য। নারীর এই বিড়ম্বিত জীবনকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন দামোদর মুখোপাধ্যায় 'দুই ভগ্নী' (১২৯১) উপন্যাসে। যদিও সংযতচিত্ত ব্রতচারিণী বিধবার প্রতি লেখক যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করেছেন।

কাহিনী অংশে দেখি, যোগেন্দ্র বিবাহিত। স্ত্রীর নাম বিনোদিনী। স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয়ে জটিলতা সৃষ্টি করল বিনোদিনীর ভগ্নী অষ্টাদশী বিধবা কমলিনী। বাড়ির ঝি মাধীর সহযোগিতা ও পরামর্শে কমলিনী বিনোদিনীকে অসতী প্রমাণ করে যোগেন্দ্রের মন বিষিয়ে দেয়। বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করলে যোগেন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী অভিমানে বিষপানে আত্মহত্যা করে। যোগেন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারে, ছুটে এসে বিনোদিনীর শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করে মৃত্যুবরণ করে।

বিধবা সমস্যার সহজ সমাধানের কথা চিন্তা করে লেখক বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন। তবে সব বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত কর্তব্য বিবেচনা করেননি। যোগেন্দ্রের মুখে লেখকের এ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে,

"বিধবার বিবাহের প্রধান প্রয়োজন, তাহার ক্লেশ নিবারণ, যাহার ক্লেশ নাই, তাহার বিবাহ না হইলেও চলে।"

উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থাপনে নাটকীয়তা উল্লেখযোগ্য। বিনোদিনীর স্বামীপ্রেম উজ্জ্বল। বালবিধবা কমলিনীর চরিত্রটিও বাস্তব। যৌবনের জোয়ারে সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। চারিত্রিক সংযম যে তার কখনও ছিল না তা নয়। "তুমি কোন ক্রমেই বিবাহে

১৪. 'বামাবোধিনী', আষাঢ় ১২৯৫

সম্মত হইলে না।" কমলিনীর প্রতি যোগেন্দ্রের এই উক্তি তার প্রমাণ। যাই হোক চিত্ত সংযমে অসমর্থা কমলিনী সহজ পথে অর্থাৎ সমাজনির্দেশিত পথে বাসনা পরিতৃপ্তির সুযোগ না পাওয়ার সে ছলনা, মিথ্যা ও কাপট্যের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। নিজের আচরণের সমর্থনে যুক্তি দেখায়, "কোন্ রমণী এ লোভ দমন করতে পেয়েছে? আমিও অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারব না।"

যোগেন্দ্রের চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব লক্ষণীয়। কাজেই বিবাহিত পত্নী থাকতে বিধবা যুবতীর সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব বা অসম্ভবত্ব কিছুই চোখে পড়ে না। বিনোদিনীর প্রতি অবিশ্বাস, ঝিয়ের কাছে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর, আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অন্তর্বেদনা থেকে মুক্তির পথ খোঁজা, অনেকটা মনস্তত্ত্বসম্মত।

'আর্যদর্শনে'[১৫] 'দুই ভগ্নী' সমালোচিত হয়। সমালোচক দামোদরবাবুর এই আখ্যানের ঘটনা যোজনার বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

বিধবা প্রণয় ও বিবাহ সমর্থন ছাড়া বিধবার গর্ভজাত অবৈধ সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 'বিরাজমোহন' (১৮৭৮) উপন্যাসে। বিধবার সামাজিক স্বীকৃতি বিষয়ে লেখকের এ ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সে যুগে এই প্রথম। উপন্যাসটিতে লেখক জন্ম অপেক্ষা কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপন্যাসের নায়ক বিরাজমোহন বিধবার গর্ভজাত অবৈধ সন্তান। বিধবা সৌদামিনী লোকলজ্জায় তার অবৈধ শিশুটিকে পরিত্যাগ করে এবং শিশুটি এক চাষীর কাছ থেকে কোনও অপুত্রক জমিদার ৫০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়ে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। মৃত্যুর পূর্বে জমিদার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিরাজমোহনের নামে উইল করে যান কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছায় উইলের শর্ত পরিবর্তিত হতে পারে, এমন শর্তও থাকে। জমিদারের মৃত্যুর পর গৃহিণী উজ্জ্বলাময়ী উইলের শর্ত পরিবর্তন করে ভাই গোবিন্দচন্দ্রকে সব সম্পত্তি লিখে দেন। পরের দিনই গোবিন্দচন্দ্র ভগ্নীকে খুন করেন। বিরাজমোহন, বিরাজের বন্ধু পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের হাজতবাস হয়। কিছুদিন পরে এরা জেল থেকে ছাড়া পায়। দৈবক্রমে এক গণকঠাকুরের কাছ থেকে বিরাজের পত্নী স্বর্ণ বিরাজের জন্ম বৃত্তান্ত জানতে পারে। ঘটনাক্রমে জানতে পারে গণকঠাকুর কালীনাথ চক্রবর্তীই পিতা।

উদ্দেশ্যমূলক এ উপন্যাসটিতে বিধবার গর্ভজাত অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে তাকে পরিত্যাগ করার যে চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন তা একাধারে যেমন বাস্তব, তেমনই করুণ। এ দৃশ্যের করুণতা পাঠকের হৃদয়কে আর্দ্র করে, পাঠককে সহানুভূতিশীল করে তোলে। মূল উপন্যাস থেকে এই বিশেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

"কার্য্যসমাধা হইল,—একটি নূতন হাঁড়ি, মুখ নূতন বস্ত্রে আবরিত, জলে ভাসিল। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। একটী একটী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল, পূর্ব্বদিকে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছিল, এমন সময় হাঁড়ি জলে ভাসিল,—হাঁড়ির ভিতরে একটী স্ত্রী লোকের প্রাণ, সেই প্রাণ জলে ভাসিল। বায়ু বহিল, হাঁড়ি স্রোতাভিমুখে অল্প অল্প চলিতে লাগিল। যখন হাঁড়ি স্রোতে ভাসিয়া চলিল, তখন পুরুষটী বলিল—চল, আর চিন্তা নাই, এখন ঘরে চল।" (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

---

১৫. 'আর্যদর্শন', কার্তিক ১২৮৮

সৌদামিনীর সন্তান বিসর্জনের পর পাঠককে সম্বোধন করে বিধবাবিবাহের অনিবার্য প্রয়োজনের দিকটির সমর্থনে লেখকের আকুল আবেদন উপন্যাসটির শৈল্পিক মর্যাদা দানের পরিপন্থী। তবে লেখকের বক্তব্য উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছিল, তা মনে না করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। লেখকের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বিধবার সন্তান জলে বিসর্জিত হইল, তোমরা হাসিতে চাও হাসিও। বিধবার কথা শুনিলেই তোমাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপস্থিত হয় ; তোমরা আর সকলের কথা শুনিতে ভালবাস, কিন্তু বিধবার সন্তানের কথা শুনিলে তোমাদের শোণিত উষ্ণ হয়, কি করিব বল...তোমরা বিধবার বিবাহ দিবে না, অথচ তাহাদের সন্তান হইলে পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিবে। কি অত্যাচার! তোমাদের রিপু আছে, তাহাদেরও আছে। তোমাদের ফুল হইতে যে ফলটী উৎপন্ন হইল, সেটীকে যত্নসহকারে সংসারে পালন করিবে, আর অবলাবিধবাদের সন্তান হইলে মারিয়া ফেলিবে? কি অবিচার ; এই মহাপাতকের হাত হইতে একদিন এদেশ মুক্ত হইবেক হইবে। আমরা আজ বিধবার সন্তানের বিসর্জন দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, তোমরা হাসিতে চাও, হাসিও।" (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও অনেকে এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ শ্রেণীর মানুষের নীরবতার কারণ লেখক উপন্যাসটির অন্যতম চরিত্র গোবিন্দচন্দ্রের মুখে প্রকাশ করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র "ভাবিলেন আমার ত আর মেয়ে নাই, আমি নিশ্চয় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে চলিব। মেয়ে থাকিলে কি মত হইত, কি প্রকারে জানিব।"

বিধবার সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে লেখক আদর্শবাদ দ্বারা চালিত হয়েছেন। একাধিক অপ্রয়োজনীয় ঘটনাও কাহিনীকে শিথিলবদ্ধ করেছে। তবে পাঠককে সম্বোধন করে একাধিকবার লেখকের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সাহিত্যের বিচারে ক্লান্তিকর মনে হলেও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক।

সামাজিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ব্রহ্মচারিণী বিধবার প্রতি লেখক আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। 'দুখানি ছবি' (১২৯৫) উপন্যাসটিতে এই উভয় বিষয়ের প্রতিফলন।

উদ্দেশ্যমূলক এ উপন্যাসটির 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলেছেন,

"বিধবার ব্রহ্মচর্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা থাকিলে কোন শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত তাহাই দেখান এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" (বিজ্ঞাপন, সং ১২৯৫)

উপন্যাসটিতে ব্রহ্মচারিণী বিধবা 'প্রেমমালা' ও ষোড়শী বিধবা 'মনোরমা' যুগপৎ এ দুটি চরিত্র লেখকের সে উদ্দেশ্য সাধনে উপস্থাপিত।

উপন্যাসটি লেখক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়[১৬] সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক, বিধবা প্রেমমালার ব্রহ্মচর্যের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তার

১৬. 'বামাবোধিনী', কার্তিক ১২৯৫

সবিশেষ প্রশংসা করে গ্রন্থটিকে নির্দোষ এবং সুপাঠ্য বলেছেন।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা লেখকের অপর দুটি উপন্যাস 'মনোরমার গৃহ' (১২৯৯) ও 'কমলকুমার' (১৩০৪)।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে ছাড়া 'মনোরমার গৃহ' উপন্যাসটির কোনও বিশেষ মূল্য নেই।

"বর্তমান পুস্তকখানি আমার পূর্বপ্রণীত 'দুখানি ছবি'র অনুক্রম।" 'বিজ্ঞাপনে'[১৭] প্রকাশিত লেখকের এ মন্তব্য এর পরিচায়ক। বাহুল্যবোধে গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

'কমলকুমার' (১৩০৪) উপন্যাসে কমলকুমার কর্তৃক জলমগ্ন বিধবা সুন্দরীকে উদ্ধার ও তাকে বিবাহ অর্থাৎ বিধবাবিবাহের সমর্থন রয়েছে। সেদিক থেকে গ্রন্থটির নতুনত্ব না থাকলেও বৈধব্য সঙ্ঘটনের পর বালবিধবা সুন্দরীর পিতৃগৃহে আগমনকে কেন্দ্র করে লেখক বিধবাবিবাহের সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, পাঠকের অবগতির জন্য তা তুলে ধরছি এবং গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারধর্মিতা সম্বন্ধেও পাঠককে অবহিত করছি।

পিতামাতা একটু সংস্কারমুক্ত হলে সন্তানকে অবাঞ্ছিত বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, লেখকের এরূপ ধারণার অভিব্যক্তি উপন্যাসটিতে বর্তমান। মূল উপন্যাস থেকে এ ধরনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"পিতামাতা বালিকাবিধবা কন্যার যৌবনসুলভ জীবনসংগ্রামের মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস ও হাহাকারে অশ্রুপাত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার জীবনব্যাপী একাকিত্বের গুরুভার হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সে জীবনের সংগ্রামে সহকারিতা করিতে অগ্রসর, এরূপ পিতামাতা সংসারে অল্প। অল্প বলিয়াই বিধবার জীবনযাত্রা দুঃসহ ও শতবিধ বিপদ জড়িত।" (অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যতম চরিত্র গঙ্গাধর দুঃখ করে বলেছে,

"শাস্ত্রে যাহা আছে, লোক যদি তাহাই পালন করিত, তাহা হইলে এ দেশের এই দুর্দশা কেন হইবে?"

গঙ্গাধর যা বলতে চেয়েছিল তা হল এই যে, শাস্ত্রবিচারের পথ ধরে সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ আমাদের সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের প্রাধান্য অধিক। বিধবাবিবাহ দেশাচার বিরুদ্ধ, তাই শাস্ত্রসম্মত প্রমাণিত হলেও সমাজে তা প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে কম।

উপন্যাসটির আখ্যানাংশ বেশ আকর্ষণীয়। দীর্ঘ বক্তৃতা, অনাবশ্যক ঘটনার অহেতুক বিস্তৃতি মূল ঘটনার গতিপথে মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি করলেও, লেখকের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছিল। সমকালীন মনীষীদের লেখা দু-একটি 'প্রশংসাপত্র'[১৮] আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'কমলকুমার' পাঠে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,

"বলা বাহুল্য আপনার কমলকুমার আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাষা

১৭. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনোরমার গৃহ', সং ১৯০০, 'বিজ্ঞাপন'

১৮. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কমলকুমার', ১৩২০ সং গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত

সর্বত্রই সরল ও অনেকস্থলে অতি সুন্দর হইয়াছে। ....কমলকুমার আপনার আদরের জিনিস এবং যাহার হাতে পড়িবে বোধ হয় তাহারই আদরের হইবে।”

বিদ্যাসাগরের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন লেখেন,

“কমলকুমার পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশে এখানি নূতন ধরনের নভেল। আখ্যায়িকাতে নায়ক নায়িকাগুলির সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। রচনাপ্রণালী ও ভাষা উত্তম হইয়াছে। আমি খ্যাতনামা ডিকেন্সের দুই একখানি নভেল পড়িয়াছি, কমলকুমার পড়িতে পড়িতে কেবল ঐ দিকেই মন আকৃষ্ট হইয়াছে। আপনার রচিত গল্পগুলিও ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে ঐরূপ ডিকেন্সের মত আদৃত হইবে।”

বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তার দিকটি যুক্তিতর্কের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন নগেন্দ্রনাথ বসু ‘একটী চিত্র’ (১৮৮৬) উপন্যাসে।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত জেনেও যারা কঠোর ব্রহ্মচর্যই বিধবার একমাত্র পালনীয় বলে বিধান দেন, সে সমস্ত অপরিণামদর্শী ভ্রান্ত সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে লেখকের প্রশ্নের মধ্যে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমাধানের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, পাঠকের অবগতির জন্য উপন্যাস থেকে তা উদ্ধৃত করছি :

“সমাজপতিগণ তোমরা যে বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও, সেই শিক্ষার পদ্ধতিটা কি প্রকার আমায় বলিয়া দিতে পার? আর ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষকই বা তোমাদের সমাজে কয়জন আছেন, দেখাইয়া দিতে পার?...কথায় কথায় তোমরা যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাক, সেই শাস্ত্রেই ত আবার বিধবার বিবাহ করিবারও বিধি রহিয়াছে দেখিতেছি। তবে কেন একমাত্র তাহাদের ব্রহ্মচর্যই অবলম্বনীয় বল বুঝাইয়া দিতে পার।” (দশম পরিচ্ছেদ)

বিধবাকে স্বাভাবিক সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই বিধবাবিবাহের মূল উদ্দেশ্য। বিধবার আত্মবিকাশের অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে কমে আসবে। যতদিন তা সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন বিধবাবিবাহ সমর্থন করা ছাড়া এ সমস্যার আশু সমাধানের অন্য কোনও সহজ পথ আপাতত নেই। উদ্ধৃতিটিতে লেখকের উল্লিখিত চিন্তাধারার অভিব্যক্তি হয়েছে।

বিধবাবিবাহের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে লেখক বালবিধবার কঠোর একাদশী ব্রত পালনের চিত্রও মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যা পাঠককে বিষয়টি সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল করে তোলে।

“পাঠক। অদ্য চৈত্র মাসিক একাদশী তিথি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালবিধবার পক্ষে যে কি ভয়ানক দিন, তাহা একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন। লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। আর যদি আপনার পাপ গৃহে কোন হতভাগিনী বালবিধবা থাকে, তাহা হইলে আপনিও কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন যে, আজ তাহাদের পক্ষে কি ভয়ানক দিন!” ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপন্যাসটির সমাপ্তিতে লেখক বলেন, “আমরা একটি চিত্র সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে সমাজপতিগণের চক্ষু খুলিবে।”

লেখকের এ উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও উপন্যাসটিতে বিধবাবিবাহ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হওয়ায় আখ্যানভাগ

শিথিল হয়ে পড়েছে। পাঠককে সম্বোধন করে লেখকের ভাষা সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম, বিধবাবিবাহ সমর্থন ছাড়াও মানব-দরদী সাহিত্যিকরা বিধবার ব্রহ্মচর্যবিধান, বিধবার আত্মবিকাশ ও অসহায়তা দূরীকরণে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে সামগ্রিকভাবে বিধবাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান ও সমাজ মনের পরিবর্তন আনার পক্ষে যে প্রয়াস পেয়েছেন, আন্দোলনাশ্রয়ী সাহিত্য হিসাবে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তবে প্রচারধর্মিতাই এসব রচনার মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় অধিকাংশেরই উল্লেখযোগ্য কোনও সাহিত্যমূল্য নেই।

॥ ২ ॥

বিধবাবিবাহ সে সময় অনেকেই সমর্থন করেননি। বিধবার প্রণয় ও বিবাহের মধ্যে যে কোনওরূপ কল্যাণকর দিক থাকতে পারে, তা ভেবে দেখার মতো মানসিক উদারতার অভাব অনেকেরই ছিল। দীনেশচরণ সেনের 'কুলকলঙ্কিনী' (১৮৮৩) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

উপন্যাসটির কাহিনীতে দেখি, অতিথিবৎসল বিবেকবান দেওয়ান মহেন্দ্র চৌধুরীর আশ্রিত চতুর্দশী বিধবা বসন্ত। মহেন্দ্রের পালিত এক জমিদারপুত্র কিরণ, বসন্তের প্রণয়প্রার্থী। ভাগ্যবিড়ম্বনায় মহেন্দ্র চৌধুরীর চাকরি যায় ও মিথ্যা অভিযোগে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করে কিরণ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। চৌধুরাণী কর্তৃত্ব পেয়ে বসন্তকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে। বসন্ত বিশ্বাস হারিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে গৃহত্যাগ করে এবং কিরণের আশ্রয় পায়।

মহেন্দ্র কারামুক্ত হয়ে ফিরে এলে কিরণ মহেন্দ্রকে জানায় সে বসন্তকে বিয়ে করবে। মহেন্দ্র কিরণকে নিষেধ করে এবং বসন্তকে ডেকে শাসন করে। মৃত্যুর পূর্বে মহেন্দ্র উইল করে কিরণ ও বসন্তকে ১০ হাজার করে টাকা দান করে যায়। কিরণ অন্যত্র বিয়ে করে, বসন্ত নিজের পিত্রালয়ে চলে যায়।

বসন্তের সঙ্গে কিরণের বিয়ে না হওয়ার পশ্চাতে লেখকের রক্ষণশীল মনোভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী বসন্তের সঙ্গে চরিত্রবান কিরণের বিয়ে না হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। মহেন্দ্র চৌধুরীও উদার মানুষ। অথচ তিনি এ বিবাহে সম্মত হননি। কিরণকে অকারণে নিষেধ করেন, বসন্তকেও বিনা কারণে তিরস্কার করেন। ঔপন্যাসিক যেন গায়ে পড়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। মহেন্দ্র বা কিরণের মধ্যেও এ নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যেন ব্যাপারটা এমনিই মিটে গেল।

বিধবা প্রণয় ও বিবাহের মধ্যে কোনও পবিত্রতা নেই, বরং তা লালসাসঞ্জাত, এজন্য পরিবর্তনশীল ও অকল্যাণকর। সত্যচরণ মিত্রের 'অবলাবালা' (১৮৮৭) উপন্যাসে তা
ঁ।

এ উপন্যাসটির বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হয়ে, সামাজিক আলোড়নের দিকটি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করছি।

পুস্তকটি পাঠ করে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলেন, "আমরা এই পুস্তক

পাঠে মোহিত হইয়াছি। পরিবার মধ্যে এরূপ উপন্যাস পঠিত হইতে দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দিত হই।"

তৎকালীন বাংলার প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় লিখেছেন, "We have great pleasure in introducing and recommending to our readers, Babu Satyacharan Mitra, He is a Bengali writer of superior talents and great originality."[১৯]

পুস্তকটির প্রচারধর্মিতাই এর শেষ কথা নয়, সাহিত্যের দিকও ছিল, যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Indian Government'.... এর রিপোর্টে অবলাবালার চরিত্রচিত্রণের বিশেষ প্রশংসা[২০] করা হয়। 'নব্যভারত' পত্রিকাও[২১] এর সাহিত্যের দিকটির বিশেষ প্রশংসা করে।

বিধবাবিবাহ অহিতকর, সরাসরি একথা না বললেও, অনেকে একে সমাজ ও সংসারের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৭-১৯৩২) 'স্নেহলতা' (১২৯৯) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৫৮-১৯০৯) 'আমাদের ঝি'[২২] (১৩০২) উপন্যাসে এক লালসাময়ী বিধবা নারীর লালসা চরিতার্থতার চেষ্টা ও ব্যর্থতাজনিত চরম প্রতিশোধ গ্রহণের পর ভিখারিণীতে রূপান্তরিত হওয়ার চিত্র প্রতিফলিত।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির আলোচনা শেষ করলাম। আলোচ্য উপন্যাসগুলি ছাড়া বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে এমন কয়েকটি উপন্যাসের একটি তালিকা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরছি। উদ্দেশ্য, জনমানসে আন্দোলনটির ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের অভাবে এদের স্বতন্ত্র বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

দামোদর মুখোপাধ্যায়	'বিমলা' (১৮৭৭)
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	'ভিখারী' (১৮৮১), 'মুরলী' (১৮৯২)
তারকনাথ বিশ্বাস	'কমলা' (১৮৮৩)
কুসুমকুমারী দেবী	'প্রেমলতা' (১৮৮৫)
চণ্ডীচরণ সেন	'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫)
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	'শান্তিমঠ' (১৮৮৭)
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	'কনকপ্রতিমা' (১৮৯০)
প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়	'কুমারী না বিধবা' (১৮৯১)
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	'লীলা' (১৮৯২) ইত্যাদি।

১৯. সত্যচরণ মিত্র, 'অবলাবালা', তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত।
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের ঝি', ১৩০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৭)

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা প্রবন্ধ (১৮৫০-১৯০০)

উনিশ শতকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিদ্যাসাগর—তা আমরা আগেই বলে এসেছি। আধুনিক যুগে আন্দোলন সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জনমত গঠনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই জনমত গঠন করবার জন্য ১৮৫৪-য় বিদ্যাসাগর রচনা করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। বিধবাবিবাহের সমর্থনে এটিই সম্ভবত প্রথম বাংলা পুস্তিকা। কিন্তু বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের আগেই দু-একটি পুস্তিকা প্রকাশ পেয়েছিল। যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটিতে লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একাধিক শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করলেও শেষ পর্যন্ত মানবিক আবেদনকেই বড় করে দেখিয়েছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় কি কি অনিষ্ট হচ্ছে, অসহায় বিধবারা কিরূপ অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর তা তুলে ধরে সমাজের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে ও ব্যক্তিস্বার্থে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হতে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবন্ধটির শেষ ছত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বিদ্যাসাগরের মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে :

"বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে, এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাবরণ হইতে পারে।"[১]

বিদ্যাসাগরের এ পুস্তিকাটির সবিশেষ প্রশংসা করে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখে, "ঐ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয়।"

ঐ বছরের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর পুনরায় এর সমর্থনে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয়) প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', সমাজ (১৩৪৫), পৃ. ৩৬

বিষয় এ প্রবন্ধ পুস্তিকাটিতে আরও স্পষ্ট। বক্তা নিজের বক্তব্যে আরও আস্থাবান। প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতি ছাড়া বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু অংশ মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি :

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় কুফল ভোগ করিতেছ! হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।"[২]

উদ্ধৃত অংশে বিদ্যাসাগরের দরদী মন ছাড়া শিল্পীমনেরও পরিচয় পাই। তাই প্রবন্ধটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও লেখক আবেগ দ্বারা চালিত হননি, যুক্তি ও তথ্যের প্রাধান্য ছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা প্রবন্ধটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা আলোচ্য প্রবন্ধ পুস্তিকা দুটি প্রকাশের দীর্ঘ ২০ বছর পর বিদ্যাসাগর বেনামীতে পরিহাসতরল ও ব্যঙ্গবক্রোক্তিপূর্ণ ভাষায় আরও কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের জ্ঞানবুদ্ধিকে হাস্যকর করে তোলা, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদের ভণ্ডামির কড়া জবাব দেওয়া। নাম না থাকলেও বাচনভঙ্গি, বক্তব্য বিষয় ও আরও দু-একটি সঙ্গত কারণে[৩] পণ্ডিতরা লেখাগুলি বিদ্যাসাগরের বলে অনুমান করেন। এ ধরনের লেখাগুলি হল : ১) 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩, মে), ২) 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর), ৩) 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪, নভেম্বর), ৪) কস্যচিৎ তত্ত্বন্বেষিণঃ রচিত 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বা বিনয়পত্রিকা' (১৮৮৪, নভেম্বর), ৫) কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬, আগস্ট)। এর মধ্যে প্রথম দু'খানি বহুবিবাহ আন্দোলনের বিরোধী তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের সমালোচনা। শেষ তিনখানিতে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয়টি অর্থাৎ 'ব্রজবিলাস' রচনার উদ্দেশ্য নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে আক্রমণ করা, যাকে তিনি নদীয়ার চাঁদ বিদ্যারত্ন খুড়ো মহাশয় বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এর কারণ বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণে ইনি যত্নবান হয়েছিলেন।

'বিনয়পত্রিকা'তে ব্যঙ্গ করেছেন পূর্বোক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও রামধন তর্কপঞ্চাননকে। এঁরা যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণের মনোরঞ্জনের জন্য বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিধান দেন। পণ্ডিতদের সহায়তায় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে সভাপতি মহাশয়ের এ প্রয়াসকে বিদ্যাসাগর 'ছাগদ্বারা যবমর্দ্দন চেষ্টা' অথবা 'সারমেয় পুচ্ছ ধরিয়া সাগরপারের প্রয়াস' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', সমাজ (১৩৪৫), পৃ. ১৮৭
৩. দেবকুমার বসু (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪৩

'রত্নপরীক্ষা' রচনার উদ্দেশ্যও অনুরূপ।

বিদ্যাসাগরের লেখা এ জাতীয় রচনাগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, ব্যঙ্গ সাহিত্যের নমুনা হিসাবে যা উল্লেখযোগ্য[৪]।

১) "ফাজিল চালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মত বিজ্ঞ, বোদ্ধা, যোদ্ধা, ভূমণ্ডলে আর নাই।" ('ব্রজবিলাস', পৃ. ৫২৯)

২) "একগণ্ডামাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতিবিদ্কুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই।"

৩) "আমি পূর্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে। অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব।"

৪) "যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধরিতে চাও।" ('ব্রজবিলাস', পৃ. ৫৩৪)

৫) "নবদ্বীপ এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজ, বিদ্যারত্ন সেই সর্বপ্রধান সমাজের সর্ব প্রধান স্মার্ত বলিয়া মান্য, তাঁহার চাঁদমুখে স্বকর্ণে শুনিলার্ম, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা হয় না।" ('ব্রজবিলাস', পৃ. ৪৪২)

৬) "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়া সর্বসাধারণের উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র। ইহাকেই ছাগ দ্বারা যবমর্দ্দন চেষ্টা, অথবা সারমেয় পুচ্ছ ধরিয়া সাগর পারের প্রয়াস বলে।" ('বিনয়পত্রিকা', পৃ. ৫৮২)

দেশীয় পরিভাষা প্রয়োগে বক্তব্যবিষয় যে ঝাঁঝালো হয়েছিল, 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাওয়া', 'ছাগদ্বারা যবমর্দ্দন চেষ্টা', 'সারমেয় পুচ্ছ ধরিয়া সাগর পারের প্রয়াস' ইত্যাদি প্রচলিত বাগরীতির প্রয়োগ থেকে তা অনুমান করা যায়। 'বচন ফচন', 'ফাজিল চালাক', 'জানোয়ার', 'লেজ নাড়িতেছেন' ইত্যাদি গ্রাম্য এবং লঘু শব্দ প্রয়োগ তাঁর দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। শব্দগুলির ধার বা অন্তর্নিহিত সরস পরিহাস চিন্তাভারক্লিষ্ট বাঙালির মুখে একসময় হাসি এনেছিল তা নয়, আজ প্রায় শত-বৎসর পর বিগতদিনের সামাজিক উত্তেজনার ঢেউ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ সামাজিক পরিবেশে খোলা কলমে সাধু ক্রিয়ায় চলতি ছাঁদে লেখা এ জাতীয় রচনার রসাস্বাদনে পাঠকের কোনও বাধা সৃষ্টি হয় না।

বক্তব্যবিষয়কে সরস করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে দু-একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। আমরা এখানে একটি গল্প উদ্ধৃত[৫] করে অন্তর্নিহিত সাহিত্যরস আলোচনা করছি।

"এক বিদ্যাবাগীশ কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', সমাজ (১৩৪৫), পৃ. ৬১৭-১৮

৫. ঐ, ঐ (১৩৪৫), পৃ. ৬১৭-১৮

সর্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না। এখনই কেহ বুঝাইয়া সর্বস্ব লইয়া যাইবে, ছেলেগুলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি, তুই সে জন্যে ভাবিস কেন, আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, আমায় বোঝায়।"

বিদ্যাসাগর গল্পটিতে আক্রমণ করেছেন মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতদের। তাঁরা বুঝিয়াও বোঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় তাঁহাদের 'বুদ্ধিও স্বতন্ত্র', 'বিদ্যাও স্বতন্ত্র', 'ব্যবহারও স্বতন্ত্র'। তাঁহাদের অলৌকিক লীলা বুঝিয়া ওঠা ভার!

সময়োপযোগী সরস গল্পের অবতারণায় বিদ্যাসাগর কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন আলোচ্য অংশে তার পরিচয় মেলে। গল্পটির অন্তর্নিহিত তীব্র ব্যঙ্গে প্রতিপক্ষীয়েরা যে বেকায়দায় পড়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। পারিবারিক চাপে জর্জরিত বিদ্যাসাগরের মনটি যে বার্ধক্যেও সতেজ ছিল, গল্পটির অবতারণায় তা স্পষ্টই অনুভূত হয়। সাহিত্যে হাস্যরসের প্রয়োগে বিদ্যাসাগরের দক্ষতারও নিদর্শন মেলে।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে আরও কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ লেখা হয়, তবে অধিকাংশ প্রবন্ধের কোনও সাহিত্যমূল্য নেই। কাজেই আমাদের আলোচনায় সেগুলি স্বাভাবিকভাবে বাদ পড়ছে। তবে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'সাম্য' প্রবন্ধটিতে একাধিক সামাজিক বৈষম্যের আলোচনার মধ্যে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিধবাবিবাহও স্থান পেয়েছে। বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে, বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে এটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মনে করে পাঠককে এ বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্যবন্ধনে, হিন্দুমহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এ জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি এক তরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?"[৬]

বিধবাবিবাহ যাঁরা সমাজ ও সংসারের পরিপন্থী বলে মনে করেন, তাঁরা যে অভ্রান্ত নন লেখক এখানে তাঁদের মতকে খণ্ডন করে তা দেখিয়েছেন। এ খণ্ডনের দ্বারা বোঝা যায় তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থক। প্রবন্ধটির ভাষা সরল, শব্দচয়নের নিপুণতা লেখকের সাহিত্য প্রতিভার পরিচায়ক।

॥ ২ ॥

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ সংখ্যায় অধিক। আলোচ্য পর্বে এ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকাটির পরিচয় পাই 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'[৭] প্রকাশিত একটি সংবাদে।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য' (১৮৮০) 'বঙ্কিম রচনাবলী', (১৩৬১), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০২
৭. 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ২২৮০ সংখ্যা, ২৪.১০.১৮৫০

'হিন্দু বিধবার বিবাহ' উক্ত বিষয়ে 'যুবালোকেরা এক্ষণে মনোযোগী হইয়াছেন দৃষ্টে' 'চন্দ্রিকা' যন্ত্রাধ্যক্ষ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তদ্বিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাপকদিগের মত ঘটিত এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় ধর্মসভার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যেই চন্দ্রিকা যন্ত্রাধ্যক্ষ পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন।

১৮৫৫-এর জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশের পর নামী-বেনামী বহু লেখক নিজ নিজ মত সমর্থন করে এক-একটি প্রতিবাদ পুস্তিকা নিয়ে সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করলেন। ১৮৫৫-এ মার্চ মাস পর্যন্ত এ ধরনের ৭-৮টি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশের সংবাদ পাই[৮]। ঐ বছরের মধ্যে এ ধরনের পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ৩০টিতে দাঁড়ায়[৯]। বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এ ধরনের একাধিক পুস্তিকার নাম লেখকের নাম সহ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল : "বিধবাবিবাহের নিষেধক বিচার : শ্রীউমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত, আঁটপুরনিবাসি দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীতঃ পুনঃ প্রকাশিতশ্চ।" "বিধবাবিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী (দ্বিতীয়)।" "কুশীপুরবাসী শ্রীশশিজীবন তর্করত্ন, শ্রীজানকীজীবন ন্যায়রত্ন সংগৃহীতা। সপ্তক্ষীরাবাসি শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতীনাথ রায় চতুর্ধুরীণাদেশতঃ।" "পৌনভব খণ্ডনম্ অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বর বিদ্যাসাগরেণ কলৌ বিধবাবিবাহ প্রচলিতার্থনির্ম্মিত নিবন্ধস্য প্রত্যুত্তরম। শ্রীমৎ কালিদাস মৈত্র বিরচিতম্।" "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবাবিবাহ ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহবারকঃ। শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের মতানুসারে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত।" "বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্তৃক সঙ্কলিত।" "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক ভ্রমসূচক পত্রাবলীর কাশীস্থ খণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর।" "ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিত সভা হইতে বিধবাবিবাহবাদ প্রথম খণ্ড।" "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর।" "শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ কর্তৃক শ্রুতি স্মৃত্যাদি প্রমাণাবলী সংকলনপূর্বক লিখিত।" "বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত নহে।" "বিচিত্র স্বপ্নবিবরণম্। শ্রীপীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিতম।" "বিধবাবিবাহ নিষেধবিষয়িনী ব্যবস্থা।"[১০]

দেশীয় মন যে এ সংস্কারের সমর্থনে ছিল না, বিরুদ্ধে লেখা পুস্তিকাগুলো তার প্রমাণ।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকাটির প্রতিবাদ পুস্তকগুলিতে মোটামুটি দুটি রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমটি শাস্ত্রবিচারের, দ্বিতীয়টি নিছক কটূক্তি ও গালিগালাজের।

শাস্ত্রবিচারের পথ ধরে লেখা পুস্তকগুলির মধ্যে পদ্মলোচন ন্যায়রত্নের 'বিধবাবিবাহ নিষেধক' নামে পুস্তিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা প্রথম পুস্তিকাটির প্রতিবাদে এটি লেখা। তবে পুস্তিকাটি বিদ্যাসাগরের হাতে আসে দ্বিতীয় পুস্তক রচনার পর। বিদ্যাসাগরের পুস্তকের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় সমালোচনা করেছেন তিনি।

৮. 'The Hindu Intelligencer', 2.4.1855, p. 107
৯. 'The Calcutta Review', Vol. XXV, 1885, p. 860
১০. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং, ১৩২১), পৃ. ২৮৩-৮৪

স্বয়ং বিদ্যাসাগর এ সমালোচনার প্রশংসা করেছেন, আক্ষেপ করেছেন একথা চিন্তা করে যে, "যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়, যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধির কৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত বলিতে পারা যায় না।"

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে'—ভবানীপুরের অধিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ পুস্তিকাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে লাভ অপেক্ষা বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। প্রসন্নকুমারের এটাই বক্তব্য। তবে তিনি এখানেই থেমে যাননি, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্বামী মনের মতো না হলে হয়তো তাকে হত্যা করেই বসবে। তাই তাঁর বক্তব্য, "এতদ্দেশে বহুবিবাহ ও অল্পবয়সে বিবাহ ইত্যাদি যে সব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাহা নিবারিত হইলে বিধবাবিবাহের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।"[১১] সেসব চিন্তা না করে লজ্জাকর ও হাস্যকর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রতিবাদ পুস্তিকাগুলির মধ্যে সবদিক বিচারে ১৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা'র অবৈতনিক সম্পাদক দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের লেখা 'বিধবাবিবাহ বাদ' (১ম খণ্ড, ১২৬১)। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখক কোনও কটূক্তি বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি।

'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ' নামে পুস্তিকায় পীতাম্বর কবিরত্ন অশাস্ত্রীয় বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হলে সমূহ যে সর্বনাশের কথা চিন্তা করলেন তা হল এই যে, বিধবাবিবাহ চালু হলে যাদের স্বামী 'নির্গুণ' বা 'নির্ধন' বা যাদের স্বামী পছন্দসই নয়, তারা তো স্বামীকে হত্যাই করবে। পথের কাঁটা হয়ে যদি কোনও লোক থাকে, তাকেও মারতে তাদের হাত কাঁপবে না। আর ছেলেকে যদি না-ও মারে, তাহলেও ছেলে মার কাণ্ড দেখে লজ্জায় প্রাণত্যাগী কিংবা দেশত্যাগী হবে। এতসব পণ্ডিতি বিশ্লেষণ সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে চিনল না, এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন লিখলেন, 'বৈধব্যধর্মোদয়' (প্রথম পুস্তক)। পুস্তকটি দেখার সুযোগ না পেলেও রাধাকান্ত-অনুরাগী নন্দকুমার বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে যে ভাল চোখে দেখেননি, তা আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

শাস্ত্রবিচারের পথ বাদ দিয়ে গালিগালাজের পথ ধরলেন একদল। ১২৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অজ্ঞাতনামার লেখা এজাতীয় একটি পুস্তিকায় বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়। গ্রন্থকারের সরাসরি অভিযোগ সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হবে। "ইহা যদি বিদ্যাসাগর নিশ্চয় করিয়া জানিয়া থাকেন তবে তিনি এই প্রথা স্বগৃহে প্রচলিত করিয়া নিজ শিষ্যানুচর-বর্গকে কেন পথপ্রদর্শন না করান।"[১২] এ ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্যাসাগর দুঃখিত হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে তা উল্লেখ করেছেন।

১১. প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে' (১৮৫৫), পৃ. ১৫

১২. 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক কুলপঞ্জি, কার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর', ১২৬১ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৭

একই পথ অনুসরণ করলেন বেলঘরিয়ার গোবিন্দচন্দ্র শর্মা (মুখোপাধ্যায়)। তাঁর মতে 'মহাম্লেচ্ছ মত' বিধবাবিবাহ পক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে আছে 'গেঁজেল', 'গুলিখোর', অল্প কিছু 'অর্থপিচাশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ও 'ম্লেচ্ছমত কুসংস্কারিত মহোদয়গণ'। অন্য অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটির সঙ্গে 'শ্রীমহেশ্বরাদিত্য বিদ্যামহার্ণব' এই কাল্পনিক নামে 'বিধবাবিবাহ প্রথা অপ্রচলিত হওয়া উচিত' নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কয়েকটি অভিনব যুক্তি দেখিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন। শালীনতার অভাব, বিদ্যাসাগরের প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ, অমার্জিত রুচি, সব মিলিয়ে পুস্তিকাটির আর যাই থাক, সাহিত্যমূল্য নেই।

এসব অশালীন মন্তব্যগুলির কথা বাদ দিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রসম্মত প্রতিবাদ করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্য মোটামুটি এইগুলি :

বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়, বিধবাবিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচার বিরুদ্ধ, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ ইত্যাদি।

১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত এ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের এসব মত খণ্ডন করেন।

বইটিতে বিদ্যাসাগর যেসব পণ্ডিতের মত খণ্ডন করেন তাঁরা হলেন আগড়পাড়া নিবাসী মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোন্নগর নিবাসী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, কাশীপুর নিবাসী শশীভূষণ তর্করত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, আড়িয়াদহ নিবাসী রাম তর্কালঙ্কার প্রমুখ ২৫ জন পণ্ডিত।[১৩]

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের বিরুদ্ধে লেখা পুস্তকগুলির মাত্র দু'টি আমাদের চোখে পড়েছে। প্রথমটি পূর্বোক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্নের লেখা ৬৮ পৃষ্ঠার 'বৈধব্যধর্মোদয়' (২য়) পুস্তক। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদে আক্রমণাত্মক এই লেখাটিতে সাধারণ সৌজন্যের রীতি লঙ্ঘিত। শাস্ত্রবিচারমূলক এই বইটিতে দেশাচার ও শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ নয়, ব্রহ্মচর্যই বিধবাদের একমাত্র উপায় বলা হয়েছে। এ বইটিরও কোনও সাহিত্যমূল্য নেই।

কোঁড়কাদি নিবাসী রামধন দেবশর্মার 'বিধবাবেদন নিষেধক পুস্তক' এ ধরনের অপর একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য "কলিযুগে বিধবাবিবাহ বিধি নাই নিষেধই আছে।" বিদ্যাসাগরের 'ধন্য রে দেশাচার', 'হা অবলাগণ।' ইত্যাদি আক্ষেপোক্তিও লেখকের মতে অতি অযোগ্য। কারণ বিধবা তো মেয়েরা অদৃষ্টানুসারে হয়। অন্যান্য প্রতিবাদ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিরও কোনও সাহিত্যমুল্য নেই। এছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল ভাষার কাছে, সংস্কৃত শব্দ কণ্টকিত নীরস পণ্ডিতি ভাষায় লেখা প্রতিবাদ গ্রন্থসমূহ একান্তই হাস্যকর।

এসব লেখাগুলির কথা বাদ দিলেও উনিশ শতকে বিধবাবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে যেসব লেখা বেরিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

পক্ষে—

১) 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা', 'আর্যদর্শন' কার্তিক-চৈত্র (১২৮২), শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী।

১৩. বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', (৪র্থ সং), পৃ. ২৮৯

২) 'হিন্দু বিধবাবিবাহ সমালোচনা' (১৮৮২), শ্রীযাদবচন্দ্র রায়।
৩) 'বিধবাবিবাহ', 'আর্যদর্শন', চৈত্র (১৮৮৩), শ্রীশ।
৪) 'বিধবাবিবাহ', 'আর্যদর্শন', চৈত্র (১৮৮৪), অজ্ঞাত।
৫) 'নবজীবন ও বিধবাবিবাহ', 'নব্যভারত' (১৮৮৫), শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
৬) 'বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে চালিত কেন হইতেছে না'? 'পূর্ণিমা', বৈশাখ (১৮৯৬), অজ্ঞাত।

বিপক্ষে—

১) 'হিন্দুবিধবা', 'পরিচারিকা' ভাদ্র (১৮৭৯), অজ্ঞাত।
২) 'বৈধব্যব্রত', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'ভূদেব গ্রন্থাবলী', (একাদশ সং), পৃ. ১৬০
৩) 'হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা', 'নবজীবন' জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৫), অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৪) 'বিধবাবিবাহ', 'ধর্মপ্রচারক', বৈশাখ-পূর্ণিমা (১৮৮৫), অজ্ঞাত।
৫) 'বিধবাবিবাহের অশুভফল', 'ধর্মপ্রচারক' বৈশাখ (১৮৮৬), অজ্ঞাত।
৬) 'বিধবাবিবাহ', 'নবজীবন' শ্রাবণ (১৮৮৬), অজ্ঞাত।
৭) 'হিন্দুবিধবা', 'ধর্মপ্রচারক', শ্রাবণ পূর্ণিমা (১৮৮৬), কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য, ইত্যাদি।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে লেখা প্রবন্ধসমূহের আলোচনা থেকে দেখলাম, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এ আন্দোলনের বিরোধিতার চিত্রটিই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। এ থেকে বোঝা যায়, এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলনটির প্রতি জনসমর্থন অপেক্ষা জনবিদ্বেষই প্রবল ছিল। এ বিদ্বেষ যে কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধগুলির আলোচনায় তা আমরা লক্ষ্য করেছি। সংস্কারবিমুখ সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সে যুগের খ্যাতনামা মনীষীদের অনেকেই বিধবার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যবিধানই শ্রেয় বিবেচনা করেছেন। বিধবাবিবাহ যে অন্তত অল্পদিনে সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না, প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনা থেকে আমরা তা মোটামুটি অনুমান করতে পারি।

বহুবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা কাব্য (১৮৫০-১৯০০)

উনিশ শতকে বাঙালি কবিরা ঘৃণ্য বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কৌলীন্যপ্রথার কুফল রক্ষণশীল পাঁচালীকার দাশরথি রায়কেও ভাবিয়ে তুলেছিল। কাব্যাকারে তিনি এর কদর্য রূপটি তুলে ধরলেন। স্থূলরুচির পরিচায়ক এ ধরনের একটি কবিতায় কৌলীন্যকবলিত নারীসমাজের দুঃখকষ্টের বর্ণনার মধ্যে যৌনাকাঙক্ষা, অ-পরিতৃপ্তিজনিত ব্যর্থতা ও হতাশার সুরটি প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"কুলীনের যুবতীগণ তারা যমের জন্য যৌবন
ধারণ করেন হৃদয় কমলে।
মিথ্যা নারীর কাল গত চিনির বলদের মত
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম।
অন্যকে দান করলে পরে কলঙ্ক হয় ঘরে পরে
রয়ে কুলকলঙ্কিনী নাম।"[১]

বিষয়টি যে কবিকে কতদূর ভাবিয়ে তুলেছিল এ সম্পর্কে লেখা কবিতাগুলি[২] তার প্রমাণ।

কৌলীন্যপ্রথার অন্তঃসারশূন্যতা, ভয়াবহতা, বীভৎসতা ও অমানবিকতা অপূর্বভাবে তুলে ধরলেন ঈশ্বর গুপ্ত 'কৌলীন্য' নামে ছোট্ট একটি কবিতায়। "শতেক বিধবা হয় একের মরণে।"[৩] বিধবা সমস্যার মূল কারণ ও তা সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী এই ক্লাসিক লাইনটি যে অতিশয়োক্তি নয়, সমকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস তার সাক্ষ্য

---

১. ড. হরিপদ চক্রবর্তী, 'দাশরথি ও তাঁর পাঁচালী', পরিশিষ্ট 'ক', পৃ. ৪২৭ (সং ১৩৬৭)

২. ১) কুলীনপতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টের কথা
২) বংশজের ঘরের এক বিরহিণী নারীর বিরহজ্বালার কথা
৩) কুলীন কাকে বলি—
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পদিত) 'দাশরথি রায়'। 'পাঁচালী' (৩য় সং), পৃ. ৬২৫-৩৫

৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী' (সং ১২৮৭), পৃ. ১২৭

দেবে। কৌলীন্যের কল্যাণে বৃদ্ধের বালিকা বধূ, প্রৌঢ়ার বালক স্বামী গল্পকথা নয় বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিকল্পনাও নয়, উনিশ শতকের বাস্তব সমাজচিত্র। পরিহাসপটু ঈশ্বর গুপ্ত তাই পরিহাসের ছলে লিখলেন,

"বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই ॥
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সমনারী দারা হয় তার ॥" (কৌলীন্য)

এর ফলে সমাজ যে ব্যভিচারে ভরে উঠছিল, সমাজ-সচেতন ঈশ্বর গুপ্তের তা দৃষ্টি এড়ায়নি।

"নরনারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে।
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে ॥" (ঐ)

এই আচারসর্বস্ব গোঁড়ামি সমাজকে যে কলুষিত করছিল, তাকে তিনি ক্ষমা করেননি। তাই কৌলীন্যের তথাকথিত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কবির তীব্র বিদ্রূপ,

"এ যে কুল, কুল নয় সার মাত্র আঁটি ॥" (ঐ)

কৌলীন্যপ্রথাজনিত ব্যভিচারের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য কবি করুণাময় ঈশ্বরের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়েছেন,

"এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার ॥" (ঐ)

এককথায়, কবিতাটিতে কৌলীন্যপ্রথা থেকে উদ্ভূত বহুবিবাহের কুফল প্রতিফলনে কবি সমাজ-সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের পথ অনুসরণ করে বহুবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু প্রমুখ কবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুলীন সমাজের ব্যভিচারের চিত্র তুলে ধরে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ কৌলীন্যপ্রথার বিরোধিতা করলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁর 'মহিলা' কাব্যে।

কুলীন পাত্রের অভাবে কুলীন কন্যাদের অনেকেই সারাজীবন অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থান করত, বিবাহিত কুলীন কন্যাদেরও একই অবস্থা ঘটত। স্বামী সহবাস তাদের ভাগ্যে হয়ে উঠত না। এর বাস্তব পরিণতিতে সমাজ যে কিরূপ কলুষিত হচ্ছিল, নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তার পরিচয় মিলবে,

"যত দোষ আছে আরো বিবাহ প্রথায়
শুন গিয়া শুধাইয়া কুলীন কন্যায়
প্রৌঢ়া নারী অনূঢ়া—আবার ব্যভিচার
বিবাহের পরে আর
নাহি স্বামী সমাচার,
সধবার কারো বা অবস্থা বিধবার,
কোন বিধবার বা আচার সধবার।" (১১০)

বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, যুক্তিসম্মতও নয়। বিশেষ সামাজিক একসময় এর উদ্ভব হয়েছিল। যেহেতু তা সমাজ ও সংসারের পরিপন্থী, তাই বর্তমানে তার

পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এ পরিবর্তনকে মেনে না নিলে সমাজদেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং এক সময়ে তা পঙ্গু হয়ে যাবে। অথচ এই স্বাভাবিক সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার কোনও ইচ্ছা সমাজের মানুষের নেই। কবির তাই খেদ,

"না পাই যুক্তিতে, নাই শাস্ত্রের আদেশ,
করেছিল কবে কোন্ রাজায় নির্দেশ,
প্রজাহানি ভ্রূণহত্যা হেয় ব্যভিচার
এ সকল দোষাধার,
দেশ হলো ছারখার,
তথাপি না শেষ হয় কৌলীন্য প্রথার,
কি প্রবল প্রমাণ হিন্দুর মূঢ়তার?" (১১১)

"করেছিল কবে কোন্ রাজায় নির্দেশ" উদ্ধৃতিটির মূল বক্তব্য এই যে, কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তক রাজা বল্লালসেন। স্বাভাবিক কারণে তাঁকেই এর কুফলের জন্য দায়ী করা হয়। যদিও তা সঙ্গত নয়।[৪]

বিদ্যাসাগর যে সময়ে বহুবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করানোর জন্য উদ্যোগ করেন, সে সময় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুলীন মহিলা বিলাপ'[৫] কবিতাটি লিখলেন।

উদ্দেশ্যমূলক এ কবিতাটিতে কুলীন পত্নীদের অসহায়তার বাস্তব-চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তিতে,

"বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—"

দেশাচারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ কবিকে উচ্চকণ্ঠ ও কবিতাটিকে প্রচারধর্মী করলেও পঙ্‌ক্তিগুলি কবির সমাজ-সচেতন মনের স্পর্শে সজীব ও উজ্জ্বল। মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কুলীন কন্যাদের হৃদয়বেদনা মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে :

"কি জানাব জননী গো, হৃদয়ের ব্যথা,
দাসীর(ও) হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা।
কী ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।

"কৌলীন্যপ্রথার জন্য মহারাজ বল্লালসেনকে দায়ী করা হলেও এখন যে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মহারাজ বল্লালসেন প্রবর্তিত নহে। মহারাজ বল্লালসেন যে নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা যদি প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কুলীনসমাজের কিছুমাত্র অধঃপতন ঘটিত না। ....দেবীবরের 'মেল' হইবার পর হইতেই সেন রাজগণের প্রবর্তিত কুলবিধি লুপ্ত হইয়াছে।"
—নগেন্দ্রনাথ বসু, 'জন্মভূমি', বৈশাখ, ১৩০০

কবিতাটির নামকরণ অংশে * চিহ্নিত স্থানে কবি বলেছেন, "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।"—সজনীকান্ত দাশ (সম্পাদিত) 'কবি হেমচন্দ্রের কবিতাবলী' (সং ১৩৬০), পৃ. ৬২

কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে করে।
কত পাপ স্রোত মাতা প্রবাহিত হয়।
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়,
হা নৃশংস অভিমান, কৌলীন্য আশ্রিত।
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস পালিত।
আমাদের যা হবার হয়েছে জননী
কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী।"

কুলীন পত্নীদের হতাশাময় দীর্ঘশ্বাস ভাষা পেয়েছে কবিতাটির শেষ দুই ছত্রে :

"আমাদের যা হবার হয়েছে জননী
কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী।"

এ দীর্ঘশ্বাস যে নিছক কবিকল্পনা নয়, সমকালীন পত্রপত্রিকা আজও তার সাক্ষ্য বহন করে।[৬]

সময়ের পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। পুরাতনের দাবিকে অগ্রাহ্য করে নতুন তার স্থান দখন করে, এটাই জগতের চিরন্তন রীতি। কুলীন কন্যারা কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম। দুঃখের অগ্নিশিখা তাদের চিরদিনই অনির্বাণ রইল। নিম্নোদ্ধৃত স্তবকে কুলীন কন্যাদের আক্ষেপের মধ্যে এই অভিযোগই ভাষা পেয়েছে :

"সাতশত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে,
এইরূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে
কত রাজ্য হলো গেলো, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারত ভূমে, হইল পতন
আমাদের দুঃখ আর হল না মোচন।"

"আমাদের দুঃখ আর হল না মোচন"—কুলীন কন্যাদের অসহায়তা সমকালীন সমাজমানসে কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সমকালীন পত্রিকায় তার পরিচয় মিলবে।[৭] বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কবি যে কীরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, প্রখ্যাত সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য[৮] থেকে তা অনুধাবন করা যাবে, উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় মিলবে।

৬. "নতুন নিয়মে আমাদের কি হইতে পারে অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে কিন্তু আমাদের হৃষ্টের বিষয় এই যে তদ্দ্বারা আমাদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না।" নিবেদন ইতি 'সংবাদ কৌমুদী', ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১.—শ্রীমতী অমুকদেবী

৭. 'বামাবোধিনী', কার্তিক ১২৭৮, পৃ. ২১০

৮. "হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, যে মধুরতা আছে, তাহা অবর্ণনীয়, এমন কি তেমন মাধুর্য্য মাইকেলেও নাই।"—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'কবি হেমচন্দ্র', (সং ১৩১৮), পৃ. ২৪৯

উদ্দেশ্যমূলক এ কবিতাটির শাশ্বত সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও সমকালীন আন্দোলনকে সমর্থন করে পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। কাজেই কবিতাটি যুগপ্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক।

অবহেলিত কুলীন কন্যাদের চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকটি তুলে ধরে, জঘন্য কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'লজ্জাবতী লতা'[৯] নামক কবিতাটিতে। কুলীন কন্যাদের সামাজিক মর্যাদা দানে কবির এ প্রয়াস অভিনব। নিজেকে চিরদিন রূপের পূজারী বলে অভিহিত করলেও সমকালীন সামাজিক সমস্যাকে যে বিস্মৃত হননি, কবিতাটিতে কবির সে অনুভূতিময় সচেতনতার পরিচয় রয়েছে।

বহুপত্নীক স্বামীর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে, দেহ ও মন গোবিন্দের চরণে সমর্পণ করে, ভ্রাতার সংসারে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও সম্বলহীনভাবে অবস্থানরত কুলীন কন্যাদের কবি রূপহীন, বৈচিত্র্যহীন, মৌন লজ্জাবতী লতা বলে অভিহিত করেছেন। কবিতাটির প্রতি ছত্রে কবিহৃদয়ের দরদ অনুভব করা যায় :

"নাহি ভূষা, নাহি সাজ, চলনে কথনে লাজ,
প্রফুল্ল নবযৌবন, তবুও ঝিয়ারী।
পতির আসার আশা নাহি আর! ভালবাসা
অর্পিয়াছে কায়মনে গোবিন্দ চরণে।"

কুলীন পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন কন্যা অনূঢ়া অবস্থায় চিতারোহণ করতেন। যেহেতু অকুলীনে কন্যা সম্প্রদান করে কোনও পিতামাতাই সামাজিক অসম্মানের ভাগী হতে চাইতেন না। বৃদ্ধ বয়সে ভাগ্যক্রমে বর জুটলেও পিতৃগৃহেই কন্যাকে অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাতে হত। যেহেতু বর বিবাহব্যবসায়ী। কৌলীন্যের কল্যাণে স্ত্রীর ভরণপোষণ ইত্যাদি যাবতীয় দায়দায়িত্ব থেকেও মুক্ত। এ ঔদাসীন্য শুধু কি তাঁর? পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলের নিকট পৌরাণিক শিবের ঔদাসীন্য সর্বজন বিদিত। শিব শ্মশানবাসী বৃদ্ধ অকর্মণ্য। বহুবিবাহকারী শিবপত্নী মেনকার তাই দুঃখের অন্ত নেই। শিবপত্নী মেনকার সঙ্গে তুলনীয়া, স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা, অনাদরে পিতৃগৃহে পালিতা কুলীন কন্যাদের অসহায়তার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে :

"পিতা শিব, মাতা শিব, সোদর সোদরা শিব,
কি স্বজন, পরজন সবাই মহেশ।"

কুলীন রমণীদের চারিত্রিক উৎকর্ষের সুন্দর পরিচয় কবিতাটিতে বর্তমান :

"মুখ বুজি কাজ করে, যাহা করে শিববরে,
সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় ভুবনে অতুল।"

উদাসীন স্বামীর প্রতি কুলীন রমণীদের আনুগত্যের পরিচয়ও একাধিক ছত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকারান্তরে চারিত্রিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক।

এককথায় কবিতাটিতে কবি কুলীন রমণীদের চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকটি তুলে ধরে, সামাজিক সম্মানে ভূষিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা-দানের প্রয়াস পেয়েছেন। সুস্থ সমাজগঠনে

৯. দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'অশোকগুচ্ছ' (সং ১৩১৯)

এসব সেবাপরায়ণা নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলন পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে কবি মানকুমারী বসু কুলীন কন্যাগণকে লক্ষ্য করে গাইলেন,[১০]

"অই শুকানো মুকুল।
বিধাতা ঘুমের ঘোরে
পাঠিয়ে দিয়েছে ওরে,
কপালে লিখিতে 'সুখ' হয়েছিল ভুল।
ও'র বুকে শুধু জ্বালা
শুধুই আগুন ঢালা
সরমে মরমে মরা, বিষাদে আকুল,
কি দেখিবি, ও তো ভাই, শুকানো মুকুল।"

নারীর প্রাণ নারীর বেদনায় স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতিতে কেঁদে ওঠে, তাই কুলীন কুমারীগণের মর্মবেদনায় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

"এ জনমে ফুটিল না তবু ছিন্নমূল,
'কুলীনের মেয়ে' হায়! শুকানো মুকুল।"

তাই শুনতে পাই—

"কাঁদ তোরা অভাগিনী! আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি,
ক' ফোঁটা নয়ন বারি—
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।
যখন দেখিব চেয়ে
অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে"
কপালে জোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব।

যখন দেখিব বালা
সহিছে সতিনী জ্বালা,
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব।
সধবা বিধবা প্রায়
পরান্ন মাগিয়া খায়
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব।
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ
দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব!
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

এ অশ্রুজল বিসর্জন, এ আকুল আবেদন ব্যর্থ হয়নি। সমকালীন সমাজমানসকে

১০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি' (সং ১৩৬০), পৃ. ১৬০-৬৩

প্রভাবিত করেছিল এবং কুলীন কন্যাদের দুঃখাবসানও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সে সময় পত্রপত্রিকাতেও একাধিক কবিতা লেখা হয়েছিল। সেকালের এক অজ্ঞাতনামা মহিলার লেখা 'কুলীনপত্নী' নামক কবিতাটিতে কুলীন কন্যাদের অসহায় অবস্থায় কথা বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটির শেষে * তারকা চিহ্নিত স্থানে কবির বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১]

সমাজানুমোদিত ও ধর্মানুমোদিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ, উপেক্ষিতা কুলীন পত্নীর অভিযোগ ভাষা পেয়েছে দ্বাদশ ছত্র বিশিষ্ট এই দীর্ঘ কবিতাটিতে।

শুধু অশ্রুজল বিসর্জন নয়, কাকুতি মিনতিও নয়, মৃদু তিরস্কারও নয়, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নির্লজ্জ পৈতা-সর্বস্ব কুলীন ব্রাহ্মণের নিকট কুলীন পত্নীর সরাসরি অভিযোগ—

"পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী আমি যে তোমার,
একথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার,
স্বচক্ষে দেখিয়ে তবে মোর 'এ সময়',
একটুও হয় না কি হে সম্ভ্রমের ভয়?
প্রকাশ্য জিজ্ঞাসি তাই নয়ন খুলিয়ে
কোন পথে যাব আমি দেও দেখাইয়ে।
বার বার শতবার জিজ্ঞাসি তোমায়
কোন পথে দাঁড়াইব বল হে আমায়।"

এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি তৎকালীন সমাজে মেলেনি। ভাবতে অবাক লাগে, এতসব অভিযোগের পরও যুগসঞ্চিত সংস্কারের বশ্যতা স্বীকার করে সে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য স্বামীর করুণা ভিক্ষা করেছে। কবিতাটির সমাপ্তিতে সে সুরই বর্তমান :

"মর্মান্তিক দুঃখে নাথ উন্মাদিনী প্রায়
বলেছি অনেক কথা আজ গো তোমায়
দাসী বলে ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার
পরলোকে হয় যেন পাপীর উদ্ধার।"

বহুবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে 'হালিশহর পত্রিকা'য়[১২] এক দীর্ঘ কবিতা লেখা হয়। কবিতাটিতে কবি একাধারে পিতৃগৃহে অবস্থানরত কুলীন কন্যাদের মর্মান্তিক দুঃখকষ্টের বর্ণনা, অপদার্থ কুলীনদের নিন্দা, এ প্রথার প্রবর্তক বল্লালের প্রতি সহানুভূতি মিশ্রিত মৃদু তিরস্কার, বিদ্যাশূন্য 'দেবীবর'-কে এ সর্বনাশা পরিণতির জন্য দোষী সাব্যস্ত ও কটূক্তিবর্ষণ এবং সমাপ্তিতে 'যথা ধর্ম তথা জয়'—এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসীকে এ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। এককথায় দীর্ঘ এ কবিতাটিতে কৌলীন্যপ্রথার উদ্ভব, প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিপরীত সামাজিক প্রতিক্রিয়া, ক্ষয়িষ্ণু

১১. "* কুলীনপত্নীর যে কয়েকটি উক্তি এই পদ্যে প্রকাশিত হইল তাহা প্রকৃত ও বিশেষ ঘটনামূলক।"—'কুলীনপত্নী', 'নবজীবন', আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৯১-৯২

১২. 'হালিশহর পত্রিকা', মাহ অগ্রহায়ণ, সন ১২৭৮, ৮ম সংখ্যা

সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা এবং কুলীন কন্যাদের দুঃখ নিবারণ-বিষয়ে কবির তৎপরতা, সর্বোপরি জনসাধারণকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য কবির আহ্বানবাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন কটূক্তিমূলক কবিতাটির কাব্যমূল্য না থাকলেও, একশত বছর আগের সামাজিক দলিল হিসাবে প্রয়োজন, পরিচিতি হিসাবেও মূল্যবান। কবিতাটির কিছু অংশ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উদ্ধৃত করছি :

"হায় রে! বল্লাল তুই, কি কুক্ষণে আসি।
কুলগাছে টাঙ্গাইলি, পরিণয় ফাঁসি ॥
তোমার গুণের কথা কহিতে না পারি।
কুলগাছে বেঁধে মার কুলীনের নারী ॥
তাহাদের হাহাকার, যাও যদি শুনে।
দহিবে তোমার মন, বিষাদ আগুনে ॥
সত্য বটে ইচ্ছা তব ছিল হে সরল।
সুধা না উঠিয়া তায়, উঠেছে গরল ॥
চুলে চুলে নয় গুণে, করেছিলে কুল।
তার কোন মূল নাই, সেটা তব ভুল ॥
নয় গুণে নয় দোষ, হয়েছে এখন।
সেই দোষে কুলকন্যা করিছে রোদন ॥
তাহাদের আঁখি নীরে, ভাসে বঙ্গভূমি।
রাজা হয়ে অবিচার করিয়াছ তুমি ॥
তোমার পরেতে আসি, "তব সহচর"।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য, নাম 'দেবীবর' ॥
তাহার প্রসাদে দেখি, থাকে থাকে কুল।
মেল বাঁধিলেন তিনি, না করি নির্মূল ॥
দেবীবর। তুমিও কি বুদ্ধিহীন ছিলে।
ভালরূপে আমাদের প্রতিফল দিলে ॥
যখন দেখিলে দোষ, বাধিয়াছে কুলে।
একেবারে কেন তুমি, নাহি দিলে তুলে ॥

* * *

যদি বল তা হলেই হইবে কেমনে।
সহমরণের কথা, পড়ে নাকি মনে ॥
যে উপায়ে পার কর, কুলের সংহার।
কুলীন কন্যার খেদ, নাহি সহে আর ॥"

বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণদের অনাচারে সমাজজীবন যে কলুষিত হচ্ছিল তার পরিচয় রয়েছে 'ভারত সংস্কারক'[১৩] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায়। দশটি স্তবক বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি কুলীন কন্যাদের দুঃখময় জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন

১৩. হরিবংশ বসু, 'ভারত সংস্কারক', ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৮০

এবং এ আন্দোলনের কর্ণধার বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বহুবিবাহের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে কবিতাটির প্রথম স্তবকে,

"বঙ্গের সন্তোষ হরি বহুবিভা নিশাচরী
ক্রমশ ব্যাপিল দেশময় ;"

দেশাচারের কবলে পড়ে বহু নারী জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে সারাজীবন শুধু অশ্রুবিসর্জন করেছে। তাদের দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করতে কবির লেখনী সরব :

"কতশত সতী নারী, ফেলিছে নয়ন বারি,
বহু বিভা রাক্ষসিনী দায়ে ;
কোমল কমল মুখ শুষ্ক দীন প্রায়,
হেরিলে কাহার বুক বিদারি না যায়।"

বৃন্তহীন পুষ্পের ন্যায় শোক-তাপ-দগ্ধা ভূলুণ্ঠিতা কুলীন রমণীর দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটানোই কবির একমাত্র চিন্তা :

"ছিন্ন বৃন্ত পুষ্পরাজি, হায় রে যেমতি।
সেরূপ মলিনা কত সতী গুণবতী ;
কনক বরণী হায়! সেই অবলায়,
ভারত কি চিরতরে বিসর্জিবে পায়?
হৃদয় বিদীর্ণ কর কতদিনে দুঃখ ঘর,
ধরা হতে হবে অন্তর্হিত।"

নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে বহুবিবাহকারী কুলীনদের প্রতি কবির সংযত ও রুচিপূর্ণ কঠোর মন্তব্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে :

"ধিক্ সে পামরগণে, যাহারা অবলা প্রাণে,
নিরন্তর শোক বরিষয়,
এ কি দুর্নিবার জ্বালা। শুনি দেহ জ্বলে,
এক পতি ভুঞ্জিবেক শতনারীদলে।"

'এক পতি ভুঞ্জিবেক শতনারীদলে', কাব্যপঙ্ক্তিটি নিছক কবিকল্পনা নয়—একান্তই বাস্তব। 'বামাবোধিনী' লেখে,

"এক এক কুলীন মহাত্মারা শত শত কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিরহরূপ হুতাশনে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা বিবাহের পর মালবারস্থ নায়রদিগের ন্যায় স্ত্রীর সহিত প্রায় কোন সম্পর্ক রাখেন না এবং যখন ইহকাল হইতে অপসৃত হন তখন তাহাদের সকলকে এককালে বৈধব্যরূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া যান।"[১৪]

বহুবিবাহ নিবারণের জন্য যাঁরা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন, সে সমস্ত মহাত্মাদের কথাও কবি বিস্মিত হননি। বিশেষ করে এ আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। কবিতাটি থেকে তা উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

১৪. 'বামাবোধিনী', কার্তিক ১২৭৮, পৃ. ২৯০

"সুধীর ঈশ্বরচন্দ্র, ভারত লোচন,
করেছেন ভারতের শিব সম্পাদন,
যতদিন রবে রবি, তাঁহার করুণা ছবি,
রমণী রাখিবে হৃদয়াগারে।"

আমরা বাংলা কাব্যে বহুবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করলাম। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা কোনও কবিতা আলোচ্যপর্বে আমাদের চোখে পড়েনি। কাজেই সমকালীন কবিরা এ আন্দোলনকে যে প্রতিবাদহীন স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তা সহজে বোধগম্য। সামাজিক অবিচারের বলি কুলীন পত্নীদের অসহায়তার দিকটি কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে সমাজ-সমর্থিত এ কু-প্রথার বিরুদ্ধে জনসমর্থন আদায়ের গতানুগতিক প্রয়াস ছাড়া সেবাপরায়ণা কুলীন রমণীদের চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকটিও সমকালীন কবিরা তাঁদের কাব্যে চিত্রিত করেছেন, যা সাহিত্যের অন্য বিভাগে আমাদের চোখে পড়ে না। কুলীন পত্নীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান ও সামাজিক সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে সমকালীন কবিদের এ প্রয়াস অভিনব।

বহুবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫০-১৯০০)

নাটকের মাধ্যমে কৌলীন্যপ্রথার কদর্যরূপ চিত্রিত করার প্রথম কৃতিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নের। বিবাহের নামে কুলীন কন্যাদের ওপর যে নির্যাতন চলত, নাটকের মাধ্যমে তা তুলে ধরার জন্য রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫৪-তে 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রংপুর বার্তাবহ' ইত্যাদি পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করে এক বিজ্ঞাপন দেন। রামনারায়ণ দ্রুত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকটি লিখে ঘোষিত ৫০্ টাকা পুরস্কার জিতে নেন। নাটকটি আপাতত বাইরের তাগিদে লেখা হয়েছিল বলে মনে হলেও এ ধরনের একটি নাটক লেখার ইচ্ছা রামনারায়ণের বহু আগে থেকেই ছিল, কুলীনকুলসর্বস্বের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার তার উল্লেখ করেছেন। এটি রামনারায়ণের মৌলিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, সমাজ সংস্কারকে বিষয়বস্তু করে লেখা প্রথম বাংলা নাটকের গৌরবও তা দাবি করে।

নাটকটিতে জনৈক কুলীনের ৮ থেকে ৩২-৩৩ বছরের চারটি মেয়েকে কৌলীন্যের অনুরোধে এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে সমর্পণের মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ পরিকল্পনা নাট্যকারের নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, সমসাময়িক বাঙালি সমাজে এ ধরনের নাটক রচনার বাস্তব উপাদানের অভাব ছিল না।[১] নাট্যকারের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাও[২] তাঁকে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। নারীত্বের বেদনাকে নাট্যকার কতদূর তলিয়ে দেখিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই বিয়ের সংবাদ শুনে কুলপালকের মেয়েদের বয়স অনুযায়ী মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনার মধ্যে।

বিয়ের সংবাদ শুনে বিগতযৌবনা জ্যেষ্ঠাকন্যা জাহ্নবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "আর কেন? এইবার যমের সঙ্গে মিলন হলে মানায়। বুড়ো বয়সে এই ধেড়ে রোগ কেন? দ্বিতীয়া কন্যা শাম্ভবী, বয়স ২৬/২৭। কুলীন কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারটা সে ভালভাবেই বোঝে। নির্লজ্জের মত মাকে জিজ্ঞাসা করে, ও মা তুই কি কুলরক্ষা কর্ব্যি, তবে কে জাতি রক্ষা কর্ব্যে মা? কন্যার নিকট নীরবে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া তাঁর কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা কামিনী পূর্ণযৌবনা। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল। বিয়ের

১. 'Anti Polygamy Tracts, No I' (1856), P. 10

২. অশ্বিনীকুমার সেন, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন', 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২২

সংবাদে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, –'কি বল্লি কি বল্লি মাগো, সত্য করি বল। শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল।'"

কামিনীর এই উক্তি স্বভাবোচিত। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা কিশোরী বিয়ের সংবাদে সুখাদ্য পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তার ধারণা এ একটা উৎসব। মাকে প্রশ্ন করে, "তবে তোর বিয়ে হবে না?"

কামিনী ও কিশোরী মহা উৎসাহে বর দেখতে ছোটে, কিন্তু বৃদ্ধ বর দেখে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। বর শুধু বৃদ্ধই নন, তিনি অকাট মূর্খ ও বধির। আর রূপ? সর্বাঙ্গে দাদের দাগ, মুখে বসন্তের চিহ্ন। কিন্তু তাতে কী হবে, তিনি যে বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, ফুলের মুখটি। এই অতি সৎ পাত্রের হস্তেই তাঁর চারিটি কন্যাকে সম্প্রদান করে কুলপালক কুলরক্ষা করলেন।

কদর্য এই কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্বন্ধে নিজ অভিমত নাট্যকার ব্রাহ্মণীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন :

"আমি বলেছিলাম গো, বলেছিলাম, সে মিন্‌সেরে, বলি হে দে ভাল বর দেখে মেয়েগুলোর বে দিস্, তা বাছা, আমি বল্যে কি হবে সে যে কুল খোঁজে, বলে 'কুল থাকলেও সব থাকে।' আরো দেক্, মেয়েদের জাত রক্ষা, প্রথমে মা বাপ করে, মা বাপ না করিলে, রাজা, রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোদের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে, এখানকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্মে হাত দেন না, অভাগ্য আর কি।

পূর্বে এক রাজা ছিল, তার নাম বল্লাল। সে মিন্‌সে সকলের জাত নষ্ট কত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেচে, আর আমাদের জাত যায় বিধাতারও এই ইচ্ছে, সেই ত ঐ জন্যে বল্লাল মিন্‌সেকে রাজ্য দেয়। তবে মা, বাপ, রাজা ও বিধাতা এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেছে, তখন জাত রক্ষা আর কে করবে মা?" (৩য় অঙ্ক)

কৌলীন্যের বেদনা নাট্যকারের হৃদয়ের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল, নাটকটিতে বর্ণিত ফুলকুমারী নামে স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা এক নারীর রূপায়ণে তার পরিচয় মেলে। ফুলকুমারী তার ঠান্‌দিদির কাছে দুঃখকষ্টের বর্ণনা করেছে :

"একদিন ঘাটে বসিয়া কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম তোমাদের জামাই আসিতেছে। কাপড় কাচা পড়িয়া রহিল, মনের আনন্দ মনে চাপিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলাম, আশা করিয়া রহিলাম বহুদিন পর তাহার সহিত আমার সুখের মিলন হইবে। এতদিন পর কি ভাবে তাহার সঙ্গে আমি ব্যবহার করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, বাড়ির সকলেই জামাতাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা জানাইতে গেল, কিন্তু জামাতা বলিল, ব্যাভার না পাইলে এখানে আর পা ধুইব না। শুনিয়া মাতা খাড়ু বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিয়া আনিলেন, সেই টাকা হাতে লইয়া জামাতা পা ধুইল। তথাপি টাকা অল্প বলিয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাত্রে জামাতার আহারের আয়োজন করা হইল। আহারে বসিয়া 'ইহা খায়, উহা ফেলে নবাবী করিয়া।' রাত্রিতে শয়নগৃহে নিদ্রার ভান করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বিছানায় শুইয়া আছি। এমন সময় সেই পাষণ্ড গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বলিল, 'শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।' নতুবা তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কাটনা কাটিয়া যে কিছু কড়ি

সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা সবই আনিয়া তখন তাহার হাতে দিলাম। তথাপি 'অধিক দেও' কহিল পাগল। কিন্তু আর অধিক দিতে পারিলাম না। সেই ক্রোধে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বাবার টোলে দর্মা পাতিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইল। তারপর প্রভাতে উঠিয়া কখন চলিয়া গেল। আর তাহার দেখা পাওয়া গেল না। আর এদিকে আমি, 'একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া'—

এই বিবরণ শুনে ঠান্‌দিদি বলেছিলেন, 'আর বলিস্‌নে বলিস্‌নে বুক ফেটে যায়।'

কিন্তু আমাদের আর একটু শুনতে হয়েছে। ফুলকুমারী বলেছিল, 'ঠান্‌দিদি এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল।'"

বাক্যটি বলেছিল ফুলকুমারী কাঁদতে কাঁদতে। যদি শুকনো গলায় শুকনো চোখেও বলত, তবু এ ভাষণের অশ্রুময়তা গোপন থাকত না।

কৌলীন্যপ্রথার করুণ দিকটি নাটকে যেমন ফুটেছে তেমনি এতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের রসনাও কম নেই। ফলে অভিনয়ও খুব জমে উঠে।[৩] মূল নাটক থেকে ধর্মশীলের সঙ্গে অধর্মরুচির কথোপকথনের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

"ধর্মশীল। আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়?

অধর্মরুচি। শ্বশুর বাড়ি।

ধর্ম। শ্বশুর বাটী নিবাস, ইহা কেমন কহিলেন? অ! যেখানে থাক্তে হয়, সেই নিবাস।

ধ। আপনি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন?

অ। (সক্রোধে)। আঃ আমি কি ডোম যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?

ধ। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি? বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন?

অ। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?

ধ। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয়?

অ। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজা শুকো নাই। তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেঠেরও খাতক নই।" (৪র্থ খণ্ড)

কৌলীন্যপ্রথা থেকে উদ্ভুত বহুবিবাহের কুফল বর্ণনা নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও নাটকটিতে তিনি এক ঢিলে অনেকগুলি পাখি মেরেছেন। কুলীনদের বহুবিবাহ, বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহপ্রথা, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কন্যাবিক্রয়প্রথা ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এর ফলে প্লটে সংহতির অভাব ঘটায় নাটকটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নক্‌শার সমষ্টি বলে মনে হয়। নাটকের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন না হওয়ায় নাটকটিতে ভাবসংহতি ঘটেনি। সমাজের একটি বাস্তব সমস্যা নিয়ে লেখা নাটকটিতে উচ্চতর ট্র্যাজেডির বীজ থাকলেও নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাস্তব চরিত্র রূপায়ণের প্রথম প্রয়াস এর মধ্যে পাই। নাটকে বর্ণিত পুরুষ চরিত্রগুলির ভাষা এবং আচরণে কৃত্রিমতা রয়েছে, তবে স্ত্রীচরিত্র রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাই। বিশেষ করে স্ত্রীচরিত্রগুলির মুখে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা জীবনধর্মী।

৩. অশ্বিনীকুমার সেন, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন', 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ. ৩৮

নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর ভাষা নির্মাতা। নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখে, "গৌড়ীয় ভাষায় এতাদৃশ মনোহর নাটক প্রকাশে দেশের অনেক দুর্নীতি নির্ম্মূল হইবে।"[৪]

নাটকটির মঞ্চসাফল্যও ঘটেছিল। কলকাতা ও মফঃস্বলের বহু বিত্তবান নাট্যামোদীর গৃহে নাটকটি অভিনীত হয়েছে ও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। যুবকদের ওপর এ নাটকের প্রভাব পড়েছিল, অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'পিতা ও পুত্র' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। এর কারণ উৎকৃষ্ট রচনা বলে নয়, সমাজের অনাচারের রূঢ় সমালোচনা। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে, নতুনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে। ১৮৫৮ সালে চুঁচুড়াতে নরোত্তম পালের বাড়িতে নাটকটির অভিনয় হয়। স্থানীয় কুলীনবর্গ এ নাটকের অভিনয়ে কিরূপ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তার পরিচয় দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে[৫]—"The acting of the koolin koolsharbasow Natak at chinsurah has, it appears given, great offence to the koolins of the locality."

'কুলীনকুলসর্বস্ব' ছাড়া রামনারায়ণ বিষয়টিকে নিয়ে আরও দুটি নাটক লেখেন। রামনারায়ণের লেখা দ্বিতীয় নাটকটির নাম 'নবনাটক' (১৮৬৬)। জোড়াসাঁকোর নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ বহুবিবাহের কুফল দেখিয়ে নাটক রচনার জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে 'Indian Daily News' পত্রিকায় ২২.৮.১৮৬৫ তারিখে এক বিজ্ঞাপন দেন। পরে অবশ্য রামনারায়ণের ওপর নাটক রচনার দায়িত্ব দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করেন। রামনারায়ণ নাটকটি লিখে ঘোষিত পুরস্কার জিতে নেন।

নাটকটির কাহিনীতে দেখি, প্রৌঢ় জমিদার গবেশবাবু বিবাহিত। স্ত্রী সাবিত্রী ও দুটি ছেলে বর্তমান। বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকলেও তিনি একাধিক বিবাহ পছন্দ করেন না। স্ত্রী সাবিত্রীও এক স্ত্রী থাকতে আর একটি বিবাহকে 'বে নয় যেন বেহাল' বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু চাটুকারদের পরামর্শে গবেশবাবুর মন বিগড়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে বাধা পেলেও তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না। পঞ্চাশ বছর বয়সে আর একটি বিয়ে করে আনলেন, স্ত্রীর নাম চন্দ্রলেখা। সাবিত্রী নিজের দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখে মেনে নিলেও চন্দ্রলেখা কিন্তু সাবিত্রী ও তার পুত্রদের ওপর অকারণে নির্যাতন আরম্ভ করল। বিমাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাবিত্রীর বড় ছেলে সুবোধ নিরুদ্দেশ হয়। এর ফলে সাবিত্রীর মর্মবেদনার সীমা নেই, তখন চন্দ্রলেখা অধিকন্তু খবর দেয় যে, সুবোধ মারা গেছে। এ সংবাদে সাবিত্রীও মারা যায়। সংবাদটি কিন্তু আসলে মিথ্যা। ইতিমধ্যে গবেশবাবুর ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে। ছোটবউ চন্দ্রলেখার নামে বিষয়সম্পত্তি বেনামী করতে গিয়ে প্রতিবেশী রমেশ রায়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হন, শেষে আকস্মিক পীড়ায় মৃত্যু। অনেকের ধারণা, চন্দ্রলেখা বশীকরণের ওষুধ খাইয়ে তাঁকে মেরেছে। নিরুদ্দিষ্ট পুত্র সুবোধ দুঃস্বপ্ন দেখে দেশে ফিরে এসে সবকিছু শুনে আক্ষেপ করে। গবেশবাবুর অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী সুধীন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "বৎস কি আর করবে বল! দেখ বহুবিবাহ দুষ্প্রথার অনুমোদনই মূল, সুহৃদ্বাক্য না শোনাই

৪. 'সম্বাদ ভাস্কর', ১১০ সংখ্যা, ২৩. ১২. ১৮৫৪

৫. 'Hindoo Patriot', 15. 7. 1858

বৃক্ষ, সতী স্ত্রীর অবমাননাই পুষ্প, সময়ে তারই এ সকল ফল ফললো।”

চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গবেশবাবুর মধ্য দিয়ে অলস নিষ্কর্মা অপরিণামদর্শী বিলাসপ্রিয় জমিদারদিগের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম পত্নীর জন্য তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে তিনি রীতিমত ভয় করতেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের পক্ষে তা একান্তই স্বাভাবিক। নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেন। দুঃখ করে বলেন, “তা এমন শোচনীয় অবস্থা আমার ঘটেছে তার কারণই তো আমি।...যার প্রণয় পিপাসায় এই প্রবীণ বয়সেও আমি নবীনজনসেব্য পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকি, যার জন্য বিসদৃশ সামান্য আলাপ, সামান্য কথালয়ে বালকের মত এখন রহস্য করতে হচ্ছে, এমনকি এ অবস্থায় নিধুর টপ্পার বই পর্যন্ত কিনেছি, আর আপনার পূজা আহ্নিকের সময়কেও সঙ্কোচ করে সেই অসার ঘৃণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করেছি, যার জন্য এত দূর পর্যন্ত হলো, সেই বৌ আমার প্রতি প্রসন্ন কৈ?” এসব দিক দিয়ে বিচার করলে নাট্যকার তাঁকে রক্তমাংসের মানুষরূপেই চিত্রিত করেছেন।

চন্দ্রলেখার চরিত্রটিও জীবন্ত। চন্দ্রলেখা চতুরা, শিক্ষা বা সৎসংস্কার তার মধ্যে নেই, কামনা-বাসনাই প্রবল। সে মুখরা ও কলহপ্রিয়া। বৃদ্ধ গবেশবাবু তার কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করলেও সমর্থ নন। চন্দ্রলেখা জানে তার জীবন ব্যর্থ করার জন্য এ বৃদ্ধ স্বামীই দায়ী। তাই তাঁর প্রতি চন্দ্রলেখার আক্রোশের সীমা নেই। অথচ বন্ধু চপলা ও চন্দ্রকলার কাছে সে একেবারেই স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। হাস্যময়ী চন্দ্রলেখা সেখানে প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর। অর্থাৎ তার আচরণের সঙ্গে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাট্যকার তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। নিজের চারিত্রিক অবনতিকে সে সমর্থন করে বলে, “আমরা চাঁদের জাত, কলঙ্কে আমাদের ভয় কি? চন্দ্রে কলঙ্ক না থাকলে কি তার শোভা থাকে!”

দুই স্ত্রী পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়, দাসীর উক্তিতে তা প্রতিফলিত। এদিক থেকে এ চরিত্রটি উপস্থাপনার পেছনে নাট্যকারের উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবের পরিচয় পাই। বহুবিবাহকারী গবেশবাবুর পারিবারিক বিশৃঙ্খলার পরিচয় প্রসঙ্গে দাসী বলে, “পণ্ডিত মহাশয়, বলবো কি মাথামুণ্ডু, যেমন সংসার ছিল তেমনি ছারখার হয়ে গেল, তখনও আমরা ছিলুম দেখিচি আবার এখনও দেখচি সংসার তো নয় রাবণের চুলো, দিবানিশিই জ্বলছে, চালে আর কাগ্ বসতে পায় না, কি কুক্ষণে যে ছোট মাঠাকরুন ঘরে ঢুকেছে তা বলা যায় না।”

চিন্তাতোষের মুখে চোরের বিবরণের মধ্যেও নাট্যকারের প্রচারধর্মিতা প্রকট হয়েছে। নাট্যকার যেন গায়ে পড়ে প্রথম অঙ্কেই চোরের মুখে বহুবিবাহের কুফল সম্বন্ধে সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন—

“চোর বল্যে কুকর্ম করেছি, যদি ফাঁসি দেন আচ্ছা হয়, পোড়া পেটের ভাবনা একেবারেই ঘুচে যায় ; আর যাবজ্জীবন ম্যাদ দেন সেও মন্দ নয়, জেলে বস্যে মজা কর্যে জামাই আদরে ভূজ্যি উচ্ছুগ্য কর্‌বো কিন্তু আমায় দুটো বিয়ে দেবেন না, এই আমার প্রার্থনা।”

নাটকটির শেষে সূত্রধরের উক্তির মধ্যেও নাট্যকারের উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবের

পরিচয় বর্তমান,

"আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ্ প্রথা অনুমোদন করবেন? এ দুষ্প্রথা আর রাখ্তে চাবেন? যাতে ঐ নানাদোষকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ থেকে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি যত্ন করবেন না! যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্তা কৃতার্থ হন এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক অভিনীত হল তাঁরাও কৃতার্থ হন।"[৬]

উদ্দেশ্যমূলক এ নাটকটির শিরোনামে নাট্যকার যে কথা বলেছিলেন, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নবনাটক' নাটকের মধ্যে তা প্রকট করার অতিচেষ্টা থাকায় প্লটের ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা স্বাভাবিকতা বজায় থাকেনি।[৭] তবে নাটকটির ভাষা 'কুলীনকুলসর্বস্বের' ভাষা অপেক্ষা উন্নত। শিক্ষিত চরিত্রের মুখে সাধুভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল, স্ত্রী ও অন্যান্য চরিত্রগুলির ভাষা গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে সাহিত্যিক প্রচ্ছন্নতা লাভ করেছে। নবনাটকের মধ্যে নাট্যকার ইংরেজি নাটকের অনুকরণে 'scene' ব্যবহার[৮] করেছেন, যা 'কুলীনকুলসর্বস্বে' ছিল না। এ বিষয়ে তিনি দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নাট্যকারকে অনুসরণ করেছেন।

নাটকটি যে মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্মৃতিকথা'[৯]তে তা উল্লেখ করেছেন। নববঙ্গের নেতাদের মনেও নাটকটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ১৮৭৩ সালে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে[১০] তার পরিচয় পাই।

বহুবিবাহের কুফল দেখিয়ে রামনারায়ণ শুধু গভীর ভাবাত্মক নাটক রচনা করলেন না, তার হাস্যকর দিকও তুলে ধরলেন 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯) প্রহসনে।

দাম্পত্য অংশীদারদের মধ্যে সদিচ্ছার প্রাবল্য কীভাবে দাম্পত্য অশান্তি সৃষ্টি করে, নাট্যকার এই প্রহসনটিতে তা দেখিয়েছেন। কাহিনী অংশে দেখি,

এক ব্যক্তি দু'টি বিয়ে করেছেন। উভয় স্ত্রীর প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করেন। স্বামীকে পরিতুষ্ট করার জন্যও চলে উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশেষ করে রন্ধনকালে তা চরমে ওঠে। স্বামীকে ভাল করে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য বড়বউ কুটনো কেটে রেখে জল আনতে যায়। কর্তার জন্য পাড়া থেকে তেঁতুল চেয়ে এনে ছোটবউ বড়বউয়ের কাটা কুট্নো মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে রান্না চাপিয়ে অন্য কাজে বাইরে যায়। বড়বউ জল নিয়ে এসে নিজের কাটা কুটনোর অবস্থা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ছোটবউয়ের চাপানো হাঁড়ি নামিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে ছোটবউ ফিরে এসে তুমুল

৬. রামনারায়ণ তর্করত্ন, 'নবনাটক', সং ১২৭৩, পৃ. ১৫৭-৫৮

৭. অজিত ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃ. ৬৮

৮. P. R. Sen, 'Western Influence in Bengali Literature', P. 171

৯. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা', পৃ. ২১২

১০. Kissory Chund Mitra, 'Modern Hindu Drama', 'Calcutta Review' 1873. "The acting was infinitely better than the writing of the play."

কলহ শুরু করে।

দ্বিপ্রহরে কর্তা ক্ষুধায় কাতর হয়ে উঠোনে পা দিতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি দোষারোপ করে। কাটা তরকারি ও ভাতের অবস্থা দেখে কর্তা চিঁড়ে মুড়ি খাওয়ার সঙ্কল্প করতেই উভয় স্ত্রীর মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শেষপর্যন্ত কর্তা আহারের আশা ত্যাগ করে বিশ্রামের আশায় বিছানায় শুয়ে পড়লে উভয় স্ত্রীই হাত-পা টেপার কাজে লেগে যায়। সেবার আতিশয্যে কর্তার কাতরোক্তি,

"ওরে ছেড়ে দে, প্রাণ যায়, একবার ছাড়, আমি সভ্য মহাশয়দিগের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; হাত ছাড়ে না যে, কৃতাঞ্জলি হতে পেলেম না, কি করি সভ্য মহাশয়েরা, একটা কথা বলি, ওরে একটু স্থির হ, অগো মহাশয়েরা, আমার দুর্গতি আপনারা দেখ্‌চেন, আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ যেই থাকেন তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এরূপ উভয় সঙ্কট।" (যবনিকা পতন)[১১]

কলহতিক্ত, বহুবিবাহ পীড়িত কর্তার কাতরোক্তির মধ্যে নাট্যকারের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারধর্মী মনোভাবেরই পরিচয় পাই। "হা ভগবান, আমার অদৃষ্টে এতদূর লিখেছিলে!" নবনাটকের মতো এখানে স্ত্রী চরিত্রগুলির ভাষা গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে প্রচ্ছন্নতা লাভ করেছে—"বড়বৌ। কিন্তু দেখ দিদি, আমার এমনি কপাল আমি সংসারে, নরক ভোগ কচ্চি তাও আবার ভাগে। তাও মরুকগে যা হোক, স্বামীর ভাগ দেওয়া বড় কঠিন, দিদি আমার ভাগ্যে তাও ঘটেছে।"

সবদিক বিচার করে বলা যায়, প্রহসনটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও উৎকর্ষের দিক থেকে ক্ষুদ্র নয়। অহেতুক অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশে প্রহসনটি ভারাক্রান্ত হয়নি।

রামনারায়ণের পথ অনুসরণ করে বহুবিবাহের কুফল দেখিয়ে যে সমস্ত নাটক ও প্রহসন লেখা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, 'কলিকৌতুক' (১৮৫৮) শ্রীশ্রী নারায়ণ চট্টরাজ, 'কুলীন কায়স্থ নাটক' (১৮৬১) অম্বিকাচরণ বসু, 'কামিনী নাটক' (১৮৬১) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'লীলাবতী' (১৮৬৭।) দীনবন্ধু মিত্র, 'বল্লালীঘাত নাটক' (১৮৬৭) জনৈক হিন্দু মহিলা, 'অসুরোদ্বাহ নাটক' (১৮৬৯) লেখক অজ্ঞাত, 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) মনোমোহন বসু, 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৯) মুনস্যী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়), 'সপত্নী কলহ' (১৮৭২) হরিশচন্দ্র মিত্র, 'অনূঢ়া যুবতী নাটক' (১৮৭২) শ্রীমতী নিতম্বিনী, 'সুশীলা সরলা সুন্দরী' (১৮৭৩) দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী' (১৮৭৪) লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, 'কলির দশ দশা' (১৮৭৫) কানাইলাল সেন, ইত্যাদি।

আমাদের সংগৃহীত তালিকা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, বিষয়টি বাংলা নাটক ও প্রহসনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা এরপর বিশিষ্ট কয়েকটি রচনার সাহায্য নিয়ে বহুবিবাহ আন্দোলন কিভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করব।

১১. রামনারায়ণ তর্করত্ন, 'উভয় সঙ্কট', সং ১২৭৯, পৃ. ২৬-২৭

কৌলীন্যপ্রথা থেকে উদ্ভূত বহুবিবাহ, সপত্নী বিদ্বেষ, পারিবারিক অনাচার, বশীকরণ ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদির কলঙ্কময় ইতিহাস চিহ্নিত হয়েছে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটকে' (১৮৫৮)। নাটকটির প্রথমভাগের 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন,

"বর্তমানকালে, বাংলাদেশে যে সকল কদাচার ও কুপ্রথা চলিতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার চলিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।"

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগে নাটকটি রচিত হয়।

বহুবিবাহের কুফল আলোচনার উদ্দেশ্য নাট্যকার 'বিজ্ঞাপনে' ঘোষণা করলেও নাটকটিতে তা সবিশেষ দেখাতে পারেননি। প্রথমা স্ত্রী সৌদামিনী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রমাকান্ত হরমোহিনীকে বিয়ে করেন। স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ের সংবাদে সৌদামিনী নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে কাতর হয়, "এমন কন্দর্পের মত পতিরত্ন দিয়াও পুনর্বার পথের ভিখারিণী করিলে।" রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুরচিত্রণে নাট্যকার অবশ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা ঘরে রাখার অর্থ পারিবারিক অনাচার বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। রমাকান্তের প্রতি হরমোহিনীর বক্তব্যে তার পরিচয় পাই। গঙ্গাতীরে থেকে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে রমাকান্ত বাড়ি এসে জল চায়, কিন্তু কন্যাদের দেখতে না পেয়ে সরাসরি ওপরের ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হলে গৃহিণী হরমোহিনী তাকে বাধা দিয়ে বলেন, "আর্‌রে ওদিকে যাচ্ছ কোথা? আ মরণ। দেখ্যে দেখ্যে যে হাড় কালী হলো। জ্বল্যে জ্বল্যে মলেম, আর বাঁচিনে। পড়ো পণ্ডিত লোক হলেই কি এই একটা রকম হাবা গোবা হয় গা! রোজ রোজই কি এই এক পোড়া, জ্যেনেও কি জান না গা। না বল্যে না কল্যে একটা ঢং করেও উপরে যাচ্ছ কেন? এই এদিকে এসো ঘরকন্না কত্তে গেলেই সবদিকে একটুক চক্ষে আঁধার কর্যে চলতে হয়, বিশেষ আমাদের কুলীনের ঘর।" (প্রথম অঙ্ক)

বলা বাহুল্য, রমাকান্তের কন্যারা ওপরে 'পড়ো দাদাকে' নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় মত্ত।

নাটকটিতে সপত্নী বিদ্বেষের যে চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা একান্তই বাস্তব। শ্মশানে বটবৃক্ষে রজ্জুবদ্ধ করে হরমোহিনীর বিলাপের জন্য নাট্যকারকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি, সপত্নীজ্বালা কুলীন সমাজে সর্বত্রই ছিল।

বহুবিবাহকারী রমাকান্তের মনে বহুবিবাহজনিত কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। নাটকটিতে তা দেখানোর সুযোগ থাকলেও নাট্যকার এর সদ্ব্যবহার করেননি।

নাটকটিতে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি নাট্যকার দৃষ্টি দেওয়ায় প্লটের ক্ষেত্রে নাটকোচিত সংহতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে নাটকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র নয়। একটি কেন্দ্রস্থানীয় ঘটনাসূত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমা পত্নী সৌদামিনী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ এবং সেই হেতু সৌদামিনীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা লেখকের প্রখর বাস্তবদৃষ্টির পরিচয়। স্ত্রীলোকদের সংলাপের ভাষা বেশ স্বাভাবিক। পণ্ডিতদের কথাবার্তা বিশুদ্ধ ও সরল। সাধু ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ নাটকটিতে চোখে পড়ে।

বহুবিবাহকারীকে অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন মনোমোহন বসু তাঁর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নাটকে।

প্রথমা পত্নী মহামায়ার সন্তান না থাকায় শান্তবাবু সরলাকে বিয়ে করেন। উভয় স্ত্রীর প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করতেন, তবে শিক্ষিতা সরলার প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। স্বামীর ভালবাসা পরীক্ষা করার জন্য মহামায়া শান্তবাবুকে বেদেনির ওষুধ খাওয়ায়। ওষুধের প্রভাবে শান্তবাবুকে রাতে সরলার ঘরের দিকে পা বাড়াতে দেখে এবং সরলা গর্ভবতী জেনে মহামায়ার পত্নীবিদ্বেষ জ্বলে ওঠে। সে কৌশলে সরলাকে অসতী প্রমাণ করে। ক্ষোভে সরলা গৃহত্যাগী হয়।

ভগিনীপতি নটবরের প্রচেষ্টায় মহামায়ার চক্রান্তের কথা জানতে পেরে শান্তবাবু সরলার অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। নটবরও তাঁর অনুসরণ করে। মহামায়া লজ্জায় ও ভয়ে গৃহত্যাগী হয়। শান্তবাবুর সুখের সংসার বহুবিবাহের ফলে শ্মশানে পরিণত হয়। গভীর দুঃখের পর শান্তবাবু ও সরলার পুনর্মিলন হয়।

সরলাকে হারিয়ে শান্তবাবুর খেদোক্তির মধ্যে নাট্যকার যুগপৎ বহুবিবাহকারীর চৈতন্যোদয় এবং সপত্নীবিদ্বেষ হেতু সতী নারীর দুঃখকষ্টের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

"শান্ত। আঃ এই স্থানে এই পবিত্রস্থানে এই শ্বেতমর্মরের একটি সুদীর্ঘ মন্দির নির্মাণ করবেন। সেই মন্দিরের নাম 'সতীমন্দির' রাখবেন। দুর্ভাগা ভারতবর্ষের যে সমস্ত সচ্চরিত্রা রমণী স্বামীর বহুবিবাহজনিত বিষদগ্ধ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যারা সপত্নীর তাড়নায় অশন বসনেও বঞ্চিতা, তাদের যত্ন করে এনে এই 'সতীমন্দিরে' আশ্রয়দান ও ভরণপোষণ করবেন। (সকলের রোদন) সমষ্টিমুদ্রার অপরাংশ দ্বারা বহুদোষকর বহুবিবাহ রীতি যাতে দেশ হ'তে দূর হয়, সতত পরত তার চেষ্টা পাবেন। সভাস্থাপন, গ্রন্থপ্রকাশ, অসার অভাগ্য জীবনের ইতিহাস প্রচার এবং রাজধানীস্থ বিজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শে যা কিছু সদুপায় বলে অবধারিত হবে, সর্ব প্রযত্নে এ সেই সকল উপায় অবলম্বন কর্ব্বেন। এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অন্তিম কালের প্রার্থনা, এই আমার শেষ দিনের বিষয়ভাগ পত্রিকা।" (পঞ্চম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

নাটকটিতে একাধারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামনারায়ণের 'নবনাটকে' যেরূপ সপত্নীবিদ্বেষের ভয়াবহ চিত্র আঁকা হয়েছে, এখানেও তা বর্তমান। সপত্নী কলহের সরস ব্যঙ্গপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'জামাই বারিক' প্রহসনে। রামনারায়ণ এবং মনোমোহন উভয়েই এই একান্ত বাস্তব সমস্যাটিকে হাসিঠাট্টায় উড়িয়ে না দিয়ে দুঃখ ও মৃত্যুর গাম্ভীর্যে একে ভারী করতে চেয়েছেন। নাটকটির গোড়ার দিকে সরলার বিরুদ্ধে মহামায়া ও দাসী কাজলা যে ষড়যন্ত্রের জালবিস্তার করেছেন তা একান্তই বাস্তব। কিন্তু যখন শান্তবাবু মহামায়ার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে নিরপরাধী সরলার শোকে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন হতেই নাটকীয় ঘটনা এক অবাস্তব রোমান্টিক জগতে প্রবেশ করেছে। সরলা দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'র ন্যায় শিক্ষিতা, মার্জিতরুচি, একটু কৃত্রিমও বটে। মহামায়া দাসী কাজলার সহায়তায় সরলাকে অসতী প্রমাণ করতে গেলেও প্রণয় পরীক্ষায় সরলাই উত্তীর্ণ হয়। শান্তবাবুর ভগ্নীপতি নটবর দীনবন্ধুর নদেরচাঁদের মতোই অশিক্ষিত ও নেশাখোর। তবে এ নাটকে চরিত্রগুলি দীনবন্ধুর নাটকে বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা নীরস। প্লটের মধ্যে নাটকীয় সংহতির অভাব থাকলেও কেন্দ্রীয় ঘটনাসূত্রের প্রভাব পূর্বাপর পরিব্যাপ্ত। সপত্নীবিদ্বেষের জ্বালা ছাড়াও নাট্যকার কুলীন কন্যাদের অধঃপতনের চিত্র অঙ্কন করে এ প্রথার প্রতি

কটাক্ষপাত করেছেন।

কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের হাস্যকর চিত্র তুলে ধরলেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'জামাই বারিক' (১৮৭৮) প্রহসনে। প্রহসনের দু'টি কাহিনীর একটিতে ধনী পরিবারের কুলীন ঘরজামাই পোষার কৌতুককর চিত্র, অপরটিতে দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করার ফলে উদ্ভূত পারিবারিক সমস্যার হাস্যকর চিত্র প্রতিফলিত। প্রহসনটির দ্বিতীয় অংশে নাট্যকার সপত্নী সমস্যার যে বাস্তবচিত্র প্রদর্শন করেছেন তা বহুবিবাহপীড়িত সমাজের চিরকলঙ্ক। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে অনুকরণ করেছেন। দ্বিপত্নীক এক গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে কোনও এক চোর কীরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল তার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে 'নবনাটকে'। দীনবন্ধুর এ নাটকটিতেও অনুরূপ চিত্র পাই। কাজেই এ ব্যাপারে কোনও নতুনত্ব নেই। তবে দীনবন্ধুর ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীর হাতে পড়ে চোরের যে অবস্থা হয়েছিল, চোরের মুখে নাট্যকার তার বর্ণনা করেছেন।

"চোর। আমি বিশ বছর চুরি করছি, এমন বিপদে কখন পড়িনি, বাপ্ যেন চরকি ঘুরিয়ে দিলে। জানতেম, ভালমানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের নত নরম ; ওমা। কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফাল পেটা হাতুড়ী।"

'নবনাটকে'র দ্বিপত্নীর গৃহস্থই এখানে বগলা ও বিন্দুবাসিনী। কিন্তু স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর যেরকম আয়ত্ত ছিল, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কারও ছিল না।

"বগলা। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর বেদে চোর যাচ্ছ কোথায়, এদিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করেচিস। ওকেও যেমন দেখিস্ আমাকেও তেমনি দেখতে হয়। আমি ত আর তোর মার পেটের বোন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় করতে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়, (পৃষ্ঠে কিল) আয় ডেক্‌রা ঘরে আয়।

বিন্দু। আরে পোড়ার মুখ, কোথায় যাও, আজ তোমারে যমে ধরেছে, যমের হাত ছাড়াতে পারবে না। তবে যে যান্। হ্যাঁ রা বেহায়া, বেইমান, (ঝাঁটা প্রহার) পোড়ার মুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েচেন। (নাসিকার উপর কিল)" (দ্বিতীয় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

নারীকোন্দলের যেন এমন রূপ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। পদ্মলোচনের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ যেমন দুই নারী ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, পাঠকেরও দুটি কান দুই নারী তেমনি ভাগ করে নেয়। একটি বগী অবাগী, অপরটি বিন্দি পোড়ারমুখী। নাটক শেষ হয়ে গেলেও তাদের খর রসনার জ্বালায় যেন পাঠকের দুটি চোখই বহুক্ষণ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। এই দুটি সপত্নী চরিত্রের মতো জীবন্ত নারীচরিত্র দীনবন্ধুর রচনাতে বুঝি বেশি নেই।

'জামাই বারিকে'র রসিকতার প্রশংসা করলেও তার রুচিতে আপত্তি করেছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'।[১২]

১২. 'Hindoo Patriot', 1st. April, 1872

"There are some very graphic and Powerful descriptions in this work, and there is a vein of Comic humour running throughout the piece.

But the humour, we are sorry to say, is at times of an offensive kind, and it is how we blame the author."

বহুবিবাহের দোষ সম্বন্ধে লেখা অপর একটি নাটক দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সুশীলা সরলা সুন্দরী' (১৮৭৩)। নাটকটির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন : "স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করা এবং স্ত্রৈণ হওয়া অতিশয় অবিধেয় এই উদ্দেশ্যগুলি ভাল বলিয়া বোধ হয় বিজ্ঞসমাজে আদরণীয় হইবে।"

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকার বহুবিবাহের ক্ষতিকারকতা দেখিয়েছেন। বহুবিবাহ শুধুমাত্র আর্থিক অনটন ও পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে না, মাঝে মাঝে প্রাণসংশয়, এমনকি প্রাণনাশও ঘটায়। নাটকটিতে বর্ণিত চন্দ্রবাবুর বন্ধু দীননাথবাবুর মুখে নাট্যকার সে কথা প্রকাশ করেছেন। কাহিনীতে দেখি, পুত্রবধূ সুশীলার সন্তান না হওয়ায় চন্দ্রবাবুর স্ত্রী নিত্য পুনরায় পুত্র শ্যামাচরণের বিয়ের প্রস্তাব করেন। চন্দ্রবাবু বহুবিবাহ নিবারণী সভার একজন প্রধান অধ্যাক্ষ। তাই এ প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হননি। পরে অবশ্য পত্নীর অনুনয় বিনয়ে সম্মত হন এবং শ্যামাচরণের পুনরায় বিয়ে দেন। স্বামীকে বশে রাখার জন্য শ্যামাচরণকে সুশীলা পানের মধ্যে বশীকরণের ওষুধ খাওয়ালে, শ্যামাচরণের মৃত্যু ঘটে। পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূর ক্রন্দনে চন্দ্রবাবু বহুবিবাহের কুফল হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন।

শ্যামাচরণের মৃত্যুর পর চন্দ্রবাবুর বিলাপ,

"এই বুদ্ধি আমার কেন ঘটলো? আমি বহবিবাহ নিবারণী সভার একজন অধ্যক্ষ হয়ে কেন স্বয়ং এ পাপকার্যে প্রবৃত্ত হলেম! হায় স্ত্রৈণ হওয়া কি দোষের বিষয়। স্ত্রীর কথার বশবর্তী হয়ে কত যে অসৎ কার্য করেছি, তার সংখ্যা নাই।"[১৩]

চন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে বন্ধু দীননাথবাবুর কাছে বহুবিবাহের কুফল বর্ণনার মধ্যে নাট্যকারের প্রচারধর্মী মনোভাবেরই পরিচয় রয়েছে।

"ভাই! বহুবিবাহ যে এরূপ সাংঘাতিক তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমার মনে এই পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, বহুবিবাহ করলে কষ্টেই জীবনযাপন করতে হয়, কিন্তু জীবনের কোন অমঙ্গল হয় না। কিন্তু ভাই এখন জানলাম যে, এই ভয়ানক পিশাচরূপী উদ্বাহ কেবল মনুষ্যের দুঃখজনক ও উন্নতিনাশক এমন নহে। এ যা মনে করে তাই করতে পারে। যতদিন এই পিশাচ ভারতভূমি পরিত্যাগ না করবে, ততদিন ভারতবাসী মানব ও মহিলারা উদ্বাহরূপ অমৃত স্বাদে ও স্ব স্ব জীবন নিরাপদে যাপন করতে সমর্থ হইবে না। অতএব যাতে এই ঘোর পিশাচ বঙ্গভূমি হইতে সমূলে দূর হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা কর ও যাঁহারা ইহার নিবারণে চেষ্টিত থাকিবেন তাঁহারা যে ভারতবাসীদিগের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু ও ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।" (পৃ. ১২৮)

১৩. দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সুশীলা সরলা সুন্দরী', সং ১২৮০, পৃ. ১২৫-২৬

নাটকটির সমাপ্তিতে একটি ইংরেজি কবিতার উদ্ধৃতি আছে :

"of all the miseries on earth which suffers life
Worst of them is a pair of wife."
–Doyal Krishna Chatterjee

কৌলীন্যপ্রথা বাংলার ঘরে ঘরে কোন্ আগুন জ্বালিয়েছিল, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী তা 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী' (১৮৭৪) নাটকে দেখাতে চেয়েছেন। গ্রন্থটির 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার বলেছেন, "কুলীনকন্যা সজ্জনগণের মনোরঞ্জন করিবে এমন ভরসা করি না, তবে তাঁহারা ইহাকে অনুকূল নয়নে নিরীক্ষণ করিলে, আমার প্রভূত পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

কৌলীন্যের অত্যাচারে জর্জরিত নারীসমাজ যে কৌলীন্য সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল, নাটকটিতে তার পরিচয় মেলে।

জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী হৈমবতী কন্যা কমলিনীকে অযোগ্য কুলীন বরে সম্প্রদান না করে একটু নিচু ঘর হলেও উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেয়। জয়রাম পত্নীর এ প্রস্তাবে কান দেন না, তাঁর বক্তব্য, "কি, একটা কন্যার সামান্য ঐহিক সুখের জন্য আমি কৌলীন্য মর্যাদায় খাট হব? প্রাণ থাকতে তা হবে না।"

জয়রামের মানসিক পরিবর্তন হতে দেরি হয়নি। কন্যার দুঃখে জয়রাম কৌলীন্যের অসারতা বুঝতে পারেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হন। তবে সমাজের ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। বেচারাম ও জয়রামের কথোপকথনের মধ্যে তা প্রতিফলিত :

"জয়রাম। চাটুয্যা মহাশয়! দিনুর মত সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি এটি কি আমার ইচ্ছা ছিল না?

বেচারাম। তবে তা করেন নাই কেন?

জয়রাম। সাহস হয় নাই, অপরিণামদর্শী বল্লালই যে আমাদের সর্বনাশ করে রেখেছে।

বেচারাম। বল্লালের বুদ্ধি দোষে আমরা নির্বোধ হই কেন?

জয়রাম। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলেছেন, সকলের ঐক্য হলে কি না হয়, অনায়াসেই আমাদের দেশের কুরীতির সংশোধন হতে পারে। কৌলীন্যের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মের কি সংস্রব আছে বলুন দেখি? বরং দেশাচার বশবর্তী হয়ে, সেই অভিমানের অনুরোধে, অনেক সময় আমাদিগকে ধর্ম্ম বিরুদ্ধে কার্য্য করতে হচ্ছে। মহাশয়, কেউ দেখে শিখে, আর কেউ বা ঠেকে শিখে, আমি নির্ব্বোধ, তাই ঠেকে শিখলাম্।"[১৪]

কানাইলাল সেনের 'কলির দশ দশা' (১৮৭৫) প্রহসনে সাধারণভাবে সামাজিক অনাচারের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখকের বক্তব্যই প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রহসনটির অন্যতম চরিত্র দিগম্বর সুখের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে, "যে হতভাগ্য অপেক্ষা করতে না পেরে ইহলোকে সুখে থাকতে চায়, ইহলোক সুখের স্থান ভেবে ইন্দ্রিয়সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা কোরে আমোদে মত্ত হয়, সে ভ্রান্ত জীব আত্ম অনন্ত সুখের পথে আপনিই কন্টক বিস্তার করে।"

১৪. লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী', সং ১৮৭৪, পৃ. ১১৩

কাহিনীতে দেখি, বৌবাজারের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হরিহর দত্তের তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষে সাবিত্রী, দ্বিতীয় পক্ষে তরঙ্গিনী, তৃতীয় পক্ষে কালিন্দী। প্রথম পক্ষের এক কন্যা উমাকালী এবং দ্বিতীয় পক্ষের এক পুত্র নবকুমার। সকলে জানে, হরিহর তরঙ্গিনীকে যখন বিয়ে করতে যান তখন সাবিত্রী দশমাস অন্তঃসত্ত্বা। ফিরে এসে শোনেন এক কন্যা প্রসব করে সাবিত্রী মারা গেছে। তখন খোঁজ করে দুগ্ধবতী ধাইকে জোগাড় করে তার ওপর মেয়েকে মানুষ করার ভার দেন। আসল ঘটনা, সাবিত্রী মরেনি, সে নিজের পরিচয় গোপন করে স্বামীর গৃহে ঝিয়ের কাজ করতে থাকে।

দাম্পত্য জীবনে অসন্তুষ্ট তরঙ্গিনী আন্দির মা'র সহায়তায় হরিহরের বন্ধু নবীনকিশোরের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করে এবং তার কাছে যৌবন সমর্পণ করে। একদিন নবীনকিশোর তরঙ্গিনীর ঘরে ধরা পড়ে হরিহরের ভাই দিগম্বরের হাতে। পরে অবশ্য হরিহরের পুত্র নবকুমারের সহায়তায় পালাতে সমর্থ হলেও হরিহরের তৃতীয় স্ত্রী কালিন্দীর হাতে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়। কালিন্দী ভাবে স্বামী বুঝি এতক্ষণ তরঙ্গিনীর ঘরে ছিল। স্বামী মনে করে নবীনকে ধরে গালাগালি ও প্রহার করে। ইতিমধ্যে আসল স্বামী এসে পড়ায় লজ্জায় নবীনকে ছেড়ে দেয়। নবীন মুক্তি পায়।

হরিহর মনমরা হয়ে যান, তরঙ্গিনী ভ্রষ্টা, কালিন্দীর পরিচয়ও পাওয়া গেল প্রত্যক্ষ। সে একজন পরপুরুষকে নিয়ে কী যেন করছিল। যতই চেপে থাকুক সাবিত্রীর কথা তাঁর বারবার মনে পড়ে।

কালিন্দীও ইতিমধ্যে এক সর্বনাশ করে বসেছে। সতীনকে দুর্নামের ভাগী করার উদ্দেশ্যে সতীনের মেয়ে অবিবাহিতা উমাকালীকে এক যুবকের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দিয়ে গর্ভবতী করিয়েছে। প্রলোভন জয় করা যুবতী মেয়েটির পক্ষে সহজ ছিল না, বলা বাহুল্য। কালিন্দীর মতলব, সতীনের ঝাড়েবংশে নির্মূল করা। রসময়ী নামে এক স্ত্রীলোককে দিয়ে স্বামীবশের জন্য টোট্‌কা প্রস্তুত করে রাখে। সুযোগ মতো স্বামীকে খাওয়াবে। এদিকে নবকুমারও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

কালিন্দীর টোট্‌কা ওষুধ খেয়ে হরিহর মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে নবকুমারের লেখা এক পত্রে জানতে পারে মেমের সঙ্গ ও সুরাপান তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। চিঠিটা তার শেষ চিঠি, কারণ তারপরই নবকুমার মারা যায়। ইতিমধ্যে তরঙ্গিনী নবীনকিশোরকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তরঙ্গিনীর গৃহত্যাগের পর হরিহরের খেদোক্তির মধ্যে নাট্যকার বহুবিবাহকারীদের চৈতন্য ফেরাতে চেয়েছেন, "ওরে শিকলকাটা টিয়া ও সর্বনাশী তরঙ্গিনী তোকে এত কোরে খাইয়ে পরিয়ে যত্ন কোরে হৃদয়পিঞ্জরে রেখেছিলুম, তুই তার প্রতিফল এই হাতে হাতে দিলি। আঃ পাপীয়সি পতিঘাতিনী! আঃ কুলের কলঙ্কিনী। তো হতেই আমি ধনেপ্রাণে সারা হলেম। তুই-ই আমার যত বিপদের মূলীভূত কারণ। ধন, মান, কুল-শীল তো হতেই আমি সব হারালেম। এখন নিজে বাঁচলে চোদ্দ পুরুষের নাম থাকে তা আমার সে সাধেও সর্বনাশী কলিন্দী ওষুধ খাইয়ে প্রমাদ ঘটালে। কোথায় মনে কোল্লেম, উমাকালীর বিয়েটা দিয়ে সেই স্বর্গবাসিনী পতিপ্রাণা সাবিত্রীর ধার শুধ্‌বো, এ পোড়া অদৃষ্টে তা ঘটে উঠ্‌লো না।" (পঞ্চম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

চক্রান্তকারী কালিন্দীও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে যে, সে পরের সর্বনাশ করতে গিয়ে

নিজেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সে মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায় এবং এই অবস্থাতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই দুঃসংবাদ শুনে অসুস্থ অবস্থায় ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে হরিহর মারা যায়। সাবিত্রী নিজের আত্মপরিচয় আর গোপন রাখতে পারে না, সেও পাগল হয়ে যায়।পাগল অবস্থায় সে বলে, এতদিনে সে স্বামীর পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। ঝুলন্ত কালিন্দীকে সে টানাটানি করে বলে, এবার দোলা থেকে নামুক, সাবিত্রী চড়বে। টানাটানি করতে গিয়ে মৃতদেহ সাবিত্রীর ঘাড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীরও মৃত্যু হয়। ডোমরা কালিন্দীর লাশ আলাদা করে নিয়ে চলে। সাবিত্রী ও হরিহরের লাশ একসঙ্গে বাঁশে বেঁধে নিয়ে যায়। এইভাবে কলির দশ দশা সবাই প্রত্যক্ষ করল।

নাট্যকার এখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটকের' চিত্র অবলম্বন করে কালিন্দীর হাতে পড়ে নবীনকিশোরের লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

নাটকটির সমাপ্তিতে আকস্মিক মৃত্যুর বাড়াবাড়ি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া বশীকরণ ওষুধ প্রয়োগে হরিহরের অসুস্থ হয়ে পড়া বহুবিবাহপীড়িত সমাজের বাস্তব পরিণতি। এককথায় নাটকটিতে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীকোন্দলের ভাষা স্বাভাবিক হলেও, দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকে' নারীকোন্দলের ভাষা প্রকাশের পর এ ভাষার মধ্যে আর কোনও নতুনত্ব নেই।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (ভট্টাচার্য) রচিত 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' নাটকটি কলকাতা থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার বলেছেন, "বঙ্গকুলচূড়ামণি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক এত দিবস পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া বল্লালসেন প্রচলিত বঙ্গোন্নতি অবনতিকারিণী যে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ স্রোত নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াও প্রতিহত করিতে পারেন নাই ; আমি অদ্য সেই প্রবল প্রবাহ মুখে বালিবন্ধ দিতে উদ্যত হইয়াছি।"[১৫]

সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সুরেশের স্ত্রী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন থেকেই তিনি ছেলে নাতি নাতনি থাকা সত্ত্বেও বিবাহ উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর বৃদ্ধ কর্তা বন্ধুদের নিকট তাঁর মনোবাসনা নিবেদন করলেন। "কর্তা। তা হউক। কুল দেখে কত বেটা আসবে। আমি ফুলের মুখুটি। নৈকষ্য কুলীনঠাকুর-বলরাম ঠাকুরের সন্তান। তোমাদের, তোমার বাবাদের, বিয়ে দিয়ে কত টাকা আবার উল্টে পেয়েছি, কত বামুনের ৫০০ টাকা পোণ দিয়ে মেয়ে পায় না, আমার দুয়োরে গড়াগড়ি।" (পৃ. ৫)

পুত্রেরা জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে শুনে বিরক্ত হয়, কন্যা তীব্র কটূক্তি করে। বিবাহে বাদ সাধলে কর্তা অপঘাতে ফাঁসি লাগিয়ে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাই হোক, পুত্রেরা শেষ পর্যন্ত বিবাহ সংগঠনে বাধা দিলেন না। সোনারপুর থেকে একটি সম্বন্ধ এলে কর্তা অধীর হয়ে ওঠেন।

"কর্তা। কন্যাটির রূপগুণ কহিয়া ঘটক।
খুলে দাও দেখি মোর মনের ফটক ॥"

১৫. অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (ভট্টাচার্য), 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে', 'বিজ্ঞাপন', সং ১২৯১

এদিকে মেয়ের বাড়িতে সুরেশবাবুর বড়ঘরের সংবাদে সকলে বাজি পুড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বিবাহবাসরে বৃদ্ধ বর দেখে সকলেই তামাশা করে। বাসরঘরে নারীর হাতের কোমল চড়চাপড়ে কাতর হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করে। পরিশেষে নাটকের সমাপ্তিতে জনৈক গ্রাম্য কবির মুখ দিয়ে কৌলীন্য তত্ত্বের সামাজিক অসার ও ক্ষতিকর প্রতিফল বিষয়ে নাট্যকার নান্দীপাঠ করেছেন :

"বঙ্গবাসী। এখনও দেখ হে চাহিয়ে।
কত বঙ্গনারী মরে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥
শৈশবে স্থবির পতি, বৈধব্য যৌবনে।
অবলা রমণী বল সহিবে কেমনে ॥
একাহ্নে আতপ অন্নে অঙ্গ দগ্ধ হবে।
বল্লালী কৌলীন্য কি তখন স্বর্গ দেবে?"

বৃদ্ধের এই অসমবিবাহ উন্মাদনা ও কৌলীন্যের বিষময় পরিণতি তখনকার সমাজে স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ঘটনা, উনিশ শতকের বাংলার বাস্তবচিত্র।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা এই নাটকগুলির সাহিত্যমূল্য তেমন কিছু না হলেও সমাজের কুপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে নাট্যকারদের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। নাটকগুলির আলোচনা থেকে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্বন্ধে পুরুষ সমাজের ঔদাসীন্য থাকলেও রক্ষণশীল বলে কথিত নারীসমাজ কৌলীন্য সংস্কার অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছিল। তার কারণ অবশ্য কৌলীন্যপ্রথার দুর্ভাগ্যের ভার নারীকেই প্রধানত বহন করতে হত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহু অনুসন্ধানেও আমরা আমাদের আলোচ্য পর্বে কৌলীন্যপ্রথা বা বহুবিবাহের সমর্থনে লেখা কোনও নাটকের সন্ধান পাইনি। এ থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহুবিবাহ সমাজে কম-বেশি প্রচলিত থাকলেও এর পক্ষে জনসমর্থনের অভাব ছিল।

বহুবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস (১৮৫০-১৯০০)

বহুবিবাহ আন্দোলনের ছাপ পড়েছিল বাংলা উপন্যাসে। সমাজ সমর্থিত এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসে। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর জীবনে বিপর্যয়ের মূল কারণ সমাজ নিষিদ্ধ বিধবাবিবাহ নয়, সমাজ সমর্থিত বহুবিবাহ। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সূর্যমুখীর নীরব প্রতিবাদ,

"কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব. কেননা আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না।" (অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ)

একই সময়ে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বঙ্কিম স্পষ্টই বলেছেন,

"বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, যিনি বিরোধী তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন।"

সমস্যাটির বাস্তবতা সম্বন্ধে তৎকালীন বঙ্কিমের মনোভাব এই,

"বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে, অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।" (বহুবিবাহ, 'বঙ্গদর্শন', দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২৮০)

প্রবন্ধটি প্রকাশের পরেই নিশ্চয় বহুবিবাহ সমাজ থেকে উঠে যায়নি। পরবর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'তে (১৮৮৪) পুনরায় বঙ্কিম সে প্রসঙ্গ তুললেন। তবে এ উপন্যাসে বহুবিবাহরূপ সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার যে কৌশল অবলম্বন করলেন, তা অভিনব। আর এজন্যই উপন্যাসটি পাঠ করে, বহুবিবাহের প্রতি বঙ্কিমের নীরব সমর্থন ছিল, আপাতত মনে হয়।

উপন্যাসটির আখ্যানবস্তু হল, সেকালের এক পিতৃভক্ত বহুপত্নীকের পিতার আদেশে প্রথমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ ও পুনর্মিলন।

কৌলীন্যের অনুরোধে পিতা হরবল্লভ পুত্র ব্রজেশ্বরকে বহুবিবাহে অনুমতি ও উৎসাহ দেন। এর সমর্থনে তাঁর যুক্তি, "কুলীনের কুল রক্ষা কুলীনেরই কাজ, মুটে মজুরের ত কাজ নয়।" হরবল্লভের এ উক্তি বংশকৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার পরিচয়। তবে হরবল্লভ কুলীনের কুলরক্ষার আগ্রহ দেখিয়ে কর্তব্য শেষ করেননি, কুলীনের পাওনাগণ্ডা বিষয়েও বোঝাপড়া করেছিলেন।

"আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনাগণ্ডা, তাও ত জান?" (৩য় খণ্ড দশম পরিচ্ছেদ)

বিবাহ উপলক্ষে প্রাপ্তিযোগ, কৌলীন্য মর্যাদারই একটা দিক। কাজেই ধনী হরবল্লভের তা জানাতে বিবেকে বাধে না।

ব্রজেশ্বর পিতার কথামতো বিনা অপরাধে প্রথমা পত্নী 'প্রফুল্ল'কে ত্যাগ করেছেন এবং পিতার আদেশেই একটি নয়, পর-পর দু'টি বিয়ে করেছেন। আর প্রফুল্ল, সুপণ্ডিত শক্তিধর ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে দশ বৎসরব্যাপী ব্যায়াম ও সংযমশিক্ষা, তত্ত্বোপদেশ ও নিষ্কাম কর্মে দীক্ষা এবং দস্যুদলে নেতৃত্বদান ইত্যাদির পরও সপত্নীবেষ্টিত ব্রজেশ্বরের সংসারে এসে অতি সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে বসে। আত্মসচেতনা নারী প্রফুল্লর মনে এ নিয়ে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। বরং সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয় সখীর ন্যায় ব্যবহারের যে পরিচয় পাই, তা থেকে সহজেই মনে হয় যে, নবজাগরণের যুগের প্রতিনিধি হয়েও কৌলীন্যপ্রথা বা বহুবিবাহরূপ সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার কোনও দায়িত্ব বঙ্কিম পালন করেননি। উপরন্তু বহুবিবাহের ন্যায় কদর্যরীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রফুল্লর উক্তি আমাদের সে ধারণা পুষ্ট করে :

"আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ানবৌয়ের। আমি একা তোমার ভোগদখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন? আমায় যেমন ভালবাস উহাদিগকে তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইবে না। ওরাও আমি।" (৩য় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

মনে হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রকারান্তরে বহুবিবাহেরই সমর্থন করেছেন। বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবেও দেখা যায়। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে অন্য স্ত্রীদের প্রতি সমব্যবহারের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যে বোধ বহুবিবাহকারীদের মধ্যে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বা আইন পাস করে সমাজমনের পরিবর্তন আনা যাবে না। এর জন্য চাই নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার। শিক্ষিতা নারীরা নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই এগিয়ে আসবে এবং তখনই কেবলমাত্র এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সপত্নীদের দুঃখযন্ত্রণার কথা বলেছেন।

দুটি স্ত্রী থাকতেও তৃতীয়বার বিবাহের সংবাদে ব্রজেশ্বরের পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী "সাগরের বড় ঘৃণা হইল।" তার সে সময়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ লক্ষণীয়,

"যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। 'ছি! বুড়ো মেয়ে।' বড় রাগ হইল 'আবার বিয়ে?' আমরা কি স্ত্রী নই?" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড)

এরপর বঙ্কিম লিখেছেন, "এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্নভাবে সাগর শ্বশুর বাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথম নয়ানবৌয়ের কাছে গেল। নয়নবৌ সাগরের দুই চক্ষের বিষ, সাগরবৌ নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুই জনের এক বিপদ্। এই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারাব কাছে গেল।"

"সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে সে যেমন গর্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি

নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী স্বপত্নী দূরে থাক্, পাড়াপ্রতিবেশীরাও সে কয়দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল। তাহাদেরই বিপদ বেশী। এ কয়দিন মার খাইতে খাইতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।" (৩য় খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

সপত্নী বিদ্বেষের এই চিত্র থেকে বহুবিবাহের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই।

উপন্যাসটি লেখার চৌত্রিশ বছর আগে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েরা সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে নারীপ্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে। কাজেই আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী 'প্রফুল্ল'র চরিত্রটি সৃষ্টি করতে লেখককে নিছক কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। ভবানী পাঠকের সান্নিধ্যে এসে প্রফুল্ল একাধারে সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে। নিজের শিক্ষা, সংযম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে সে দস্যুদলে নেত্রী-দেবী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই তার পক্ষে ব্রজেশ্বরের ন্যায় বহুবিবাহকারীর মানসিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা অবাস্তব নয়। প্রফুল্ল চরিত্রটি কল্পনার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ মনোভাবই বর্তমান ছিল বলে মনে হয়।

'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। গণকের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করে সীতারাম প্রথমা পত্নী শ্রী-কে পরিত্যাগ করে, একটি নয়, পরপর দুটি বিয়ে করেছে। সমাজ অনুমোদিত এ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বঙ্কিম যে মন্তব্য করেছেন তা বহুবিবাহের বিরোধী। বঙ্কিমের ভাষায়,

"তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি 'শ্রী'র খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশি প্রতিফলিত কৌমুদীরূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।" (১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)

এখানে লেখক পুরুষের অপরিতৃপ্ত কামনার বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন ধরে নিতে হবে। কামনা পূরণের জন্য পুরুষ অবাধে বহুবিবাহ করেছে।

উপন্যাসটিতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হৃদয়গত এই সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরে বঙ্কিম বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনদের চৈতন্য ফেরাতে চেয়েছেন।

সীতারাম চরিত্রটি বাস্তব। নন্দা ও রমার সাহচর্যেও সীতারামের প্রথমা পত্নী 'শ্রী'র রূপগত তীক্ষ্ণতা যে কাটেনি, উপন্যাসটিতে তার প্রতিফলন কোথাও আকস্মিক হয়ে ওঠেনি। বরং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসঙ্গতিতে সীতারাম চরিত্রটি পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে কোনও সমজাতীয় চরিত্রের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। সীতারাম চরিত্রের এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে, "বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা সীতারামে স্তিমিত হয়নি বরং জ্বলে উঠেছে" বলে প্রখ্যাত সমালোচক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন।[১]

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের কথা', পৃ. ১৭৮

বহুবিবাহের কুফল সম্বন্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন বঙ্কিম সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের কদর্যরূপ তুলে ধরলেন তাঁদের উপন্যাসে। তবে বঙ্কিম যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তার একান্ত অভাব। দু-একজন যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন না তা নয়। তবে এঁরা এঁদের সাহিত্যাদর্শকে অপরের কাছে ততখানি অনুকরণীয় করে তুলতে পারেননি, যতখানি পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যমূল্য যাই হোক, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে সমকালীন ঔপন্যাসিকদের প্রয়াসের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আমার আলোচ্য কালসীমার মধ্যে আন্দোলনের সমর্থনে লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম ও লেখকের নাম প্রকাশকাল সহ প্রদত্ত হল :

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'যোগজীবন' (১৮৭৭), 'শরৎচন্দ্র' (১৮৭৭-৭৮), প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কালিমা' (১৮৮৫), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'কুলবালা' (১৮৮৫), হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুলীন কাহিনী' (১৮৮৫), রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬), ও 'সমাজ' (১৮৯৪), নগেন্দ্রনাথ বসুর 'একটী চিত্র' (১৮৮৬), দীনেশচরণ বসুর 'নিরাশ প্রণয়' (১৮৮৮), কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' (১৮৯০), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিমাতা' (১৮৯৩), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' (১৮৯৪), শ্যামলাল মজুমদারের 'প্রভা' (১৮৯৬), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' (১৮৯৮), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'কুলীন কুমারী নির্মলা' (১৯০০), হারাণশশী দে'র 'রাণী মৃণালিনী' (১৯০০) ইত্যাদি।

উল্লিখিত উপন্যাসসমূহ থেকে কয়েকটি নির্বাচন করে বহুবিবাহ আন্দোলনের যে-যে দিকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি তুলে ধরে আন্দোলনটির সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বহুবিবাহ চারিত্রিক অবনতির কারণ হয়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'যোগজীবন' (১৮৭৭) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

উপন্যাসটির আখ্যানাংশে দেখি, বহুবিবাহকারী হরিহরের পাঁচ স্ত্রীর মধ্যে অষ্টাদশী সুশীলা তার সবচেয়ে প্রিয়। অপর স্ত্রী জ্ঞানদার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়। হরিহর সেকথা ফাঁস করবে মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ি ও শ্যালকেরা হরিহরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু সুশীলার সহযোগিতায় হরিহর প্রাণরক্ষা করে। সুশীলার পরামর্শে হরিহর কলকাতায় হৌসের দালালি শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে তার চারিত্রিক অবনতি ঘটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা এমন পর্যায়ে পৌছয় যে, সে ৩০০০ টাকার বিনিময়ে ত্রয়োদশী স্ত্রী বসন্তকুমারীকে গৃহশিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দেয় এবং পরে জালিয়াতির অপরাধে তার হাজতবাস হয়।

জ্ঞানেন্দ্র জমিদারিতে ফিরে এসে নাম নেয় গজেন্দ্রনারায়ণ। বসন্তের নাম হয় প্রভাবতী। স্বামীর শোকে পাগলিনীপ্রায় সুশীলা ঘটনাচক্রে এবং প্রভাবতীর চেষ্টায় রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের সাহায্য লাভ করে। নায়েব শিবশঙ্করের পরামর্শে গজেন্দ্রনারায়ণ সুশীলাকে বিয়ে করে এবং প্রভাবতীকে নির্বাসন দেয়। প্রভাবতীর পুত্র সরোজকে সুশীলা লোক দিয়ে হত্যা করায়। শিবশঙ্কর সুশীলার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলে। প্রজারা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গজেন্দ্রনারায়ণকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। প্রভাবতীর হস্তক্ষেপে রাজা সে যাত্রা রক্ষা পায়। শেষে প্রভাবতী ও গজেন্দ্রনারায়ণের পুনর্মিলন হয়। অনুতপ্তা

সুশীলা গৃহত্যাগ করে।

উদ্দেশ্যমূলক এ উপন্যাসটির উদ্দেশ্য প্রকট হওয়ায় ঘটনাবলী ও চরিত্র অনেকাংশে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হরিহর ও সুশীলার চরিত্রের পরিবর্তন কোনও মনস্তত্ত্বের পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। হরিহরের অসৎ মনোবৃত্তির পেছনে ছিল তার সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ মন। একটু অনুসন্ধান করলে লেখক তা দেখাতে পারতেন, অথচ তা না করে তার দোষগুলি স্পষ্ট করে তুলেছেন। তবে বহুবিবাহকারী হরিহরের দুরবস্থার চিত্রটি বাস্তব। লেখকের ভাষায়,

"...হরিহরের শিক্ষায় এ পর্যন্ত বহুবিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে নাই, তিনি আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে আবার দুটী বিবাহ করিলেন।...হরিহর কি প্রকার বিপদগ্রস্ত, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। পাঁচটা জীবনের কুলমান, সতীত্ব রক্ষা ও ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞানচক্ষে যখন এই ভাবটা হরিহর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় কি প্রকার চঞ্চল হইল তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।" (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

গজেন্দ্রনারায়ণ সংস্কারমুক্ত হলেও অবিবেচক। লেখক কলমের খোঁচায় মনুষ্যচরিত্রের পরিবর্তন সাধন করেছেন, মনস্তত্ত্বের পথ ধরেননি।

বিবাহিতা কুলীনবধূর দ্বিতীয়বার বিবাহ (বসন্তকুমারী-জ্ঞানেন্দ্র এবং সুশীলা-গজেন্দ্রনারায়ণ) স্বচ্ছন্দে ঘটেছে এই উপন্যাসে, যা সে যুগে নতুন। দীর্ঘ আট বছর পর লেখা পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'কুলবালা' (১৮৮৫) ও হারাণশশী দে'র 'রাণী মৃণালিনী' (১৯০০) উপন্যাসে কুলবধূর দ্বিতীয়বার বিবাহের উল্লেখ আছে।

সুশীলাকে লেখা হরিহরের পত্রে লেখক স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, "একজন অধিকার পাইবে, বারংবার জঘন্য কার্য করিয়াও সমাজে স্থান পাইবে, আর একজন পাইবে না, এ কথাকে আমি ঘৃণা করি।"

পাঠককে সম্বোধন করে লেখকের বক্তব্য তাঁর প্রচারধর্মী মনোভাবের পরিচয় :

"যদি বাংলার হিতৈষী হও, তবে সতীদাহ নিবারণ হইয়াছে কিম্বা বঙ্গোপসাগরে শিশু বিসর্জন স্থগিত হইয়াছে বলিয়া সভায় নৃত্য করিয়া উচ্চকথার বক্তৃতা কিম্বা সংবাদপত্রে উন্নতির আশায় স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া উৎসাহের প্রবাহ এই সারশূন্য বঙ্গে ঢালিয়া দিও না। একবার স্থির চিত্তে বহুবিবাহের কুফল হৃদয়ঙ্গম কর।" (১ম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ)

এককথায় বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ ইত্যাদির সাহায্যে লেখক জনমানসে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁর এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। সমকালীন সমাজমনে পুস্তকটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'Brahma Public Opinion'[২]-এর স্বীকৃতি, "We have no hesitation in pronouncing it to be worthy of a place in the Library of every young man in this country.".........তবে প্রচারসর্বস্বতাই এর শেষ কথা নয়, সাহিত্যের দিকটিও[৩] সমালোচক মহলে অভিনন্দিত হয়েছিল।

২. 'Brahma Public Opinion', March 2, 1882

৩. 'বঙ্গবাসী', ১লা ফাল্গুন, ১২৮৮

বহুবিবাহ আন্দোলনের সমর্থন করে সাংবাদিক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৌলীন্যপ্রথার কলঙ্কময় চিত্র অঙ্কিত করলেন 'কুলীন কাহিনী' (১২৯২) উপন্যাসে। বহুবিবাহকারী কুলীন বামুনকে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ করেছেন, এটাই এ উপন্যাসের অভিনবত্ব। রচনাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূমিকায় লেখক বন্ধু নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন,

"সমাজের কলঙ্কময় যে চিত্রটা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা অতিরঞ্জন নহে। এবং তাহা নহে বলিয়াই এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দিনে আজও এই সর্বনেশে ব্যাপার অবিকল সত্য ঘটিতেছে বলিয়াই ইহা প্রকাশের আবশ্যকতা আছে।"

উপন্যাসটির রচনাকাল ১২৯২ বঙ্গাব্দ। কৌলীন্যের প্রতাপ যে তখনও সমাজ থেকে উঠে যায়নি, উপন্যাসটির 'ভূমিকা'তে প্রতিফলিত লেখকের বক্তব্য থেকে তা অনুমান করা যায়।

কৌলীন্যের জোরে কুদর্শন এক বৃদ্ধের সঙ্গে দরিদ্র বিধবার একমাত্র কন্যা কামিনীর বিয়ে হল। বরের রূপ দেখে ক্ষান্ত (অপ্রাপ্তবয়স্কা কুলীন কন্যা) বিস্মিত হয়ে বলে, "কামিনীর কি পোড়া কপাল ভাই, এর আবার ঘর করবে কেমন করে।' সে কথায় বিনোদিনী বলে, "হ, নিয়ে ঘর করলে তো? কুলীনে আবার নিয়ে ঘর করে কোথায় দেখেছিস।" বিয়ে হল, মহিলাদের স্ত্রীআচারও যথারীতি শেষ হল। কাক ডাকল, ভোর হল, কুলীন বর পোঁটলা পুঁটলী বাঁধলেন। উঠে ধীরে ধীরে শাশুড়িকে প্রণাম করলেন। শাশুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবা, আমি অনাথা, আর আমার কেহ নাই, এ প্রকার মাঝে মাঝে উদ্দেশ নিও।" শাশুড়ির এ মিনতিতে জামাই খুশি হল এবং মনে মনে ভাবল, "তাই ত আমরা চাই, শ্বশুর বাড়ী আসিলেই তো লাভ। যতবার আসিব তত বারই টাকা।" (সং ১২৯২ পৃ. ৪)

বিধবা বোধকরি একথা বুঝল না। জামাইয়ের জলখাবারের আয়োজন করল। জামাই জলখাবার খেয়ে উঠলেন, যেখানকার কন্যা সেখানেই পড়ে রইল। কামিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সখি বিমলা কামিনীকে সিঁদুর পরাতে গেলে কামিনী তা পরতে অস্বীকার করে এবং জানায়, "আমার আবার কল্যাণ অকল্যাণ কি বোন, চুল না বাঁধলে মা শোনেন না, তাই চুল বাঁধি, তার উপর আবার কাটাঘায়ে নুনের ছিটে কেন দিদি।"

রক্তমাংসে গড়া কামিনীর এ প্রশ্নের জবাব তখনকার সমাজে মেলেনি। কামিনীর মতো হতভাগ্য অসহায় কুলীন কন্যারা এ নিষ্ঠুর দেশাচারকে বিধির বিধান বলেই ধরে নিয়েছিল। তাই বিমলা কথাপ্রসঙ্গে কামিনীর স্বামীর নিন্দা করলে কামিনী এর প্রতিবাদ করে এবং স্বামীর গুণাগুণ বিচারের অধিকার তার নেই, স্পষ্টতই তা জানায়। কামিনীর পতিভক্তির দৃষ্টান্তে বিমলা মুগ্ধ হয় এবং মনে মনে এ দুর্গতির জন্য ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করে। বিমলা সরলা, কাজেই সে জানত না এ নীতি ঈশ্বরের নয়, এ মানুষের চক্রান্ত।

অনেকদিন কেটে যায়, কুলীন বরের আর সন্ধান মেলে না। শাশুড়ির কাকুতি মিনতিতে তাঁর দীর্ঘদিন পরে আগমন ঘটে। কিন্তু ভূপাল বংশীয় দৌহিত্র হিসাবে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ায় তিনি রেগে যান। কামিনী বিমলার কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার করে এনে দিলে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং তখনই সে গৃহ ত্যাগ করেন। অনাথা কামিনী পাচিকাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে সে স্বামীকে ডেকে পাঠায় এবং সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ স্বামীর চরণে নিবেদন করে বলে, "আমার দুঃখিনী মা

এক সময় আপনার হাতে পাঁচটা টাকা দিতে গিয়াছিলেন, আপনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়েছিলেন, এ টাকা সবই আপনার।" (পৃ. ৪৪)

ব্রাহ্মণ সর্পদষ্টের মতো চমকে উঠল, তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। জীবনে অনেক নিষ্ঠুর কাজ সে করেছে কিন্তু সেদিনকার সে ঘটনার ন্যায় আর বুঝি কখনও হয় না। ব্রাহ্মণ তা ভুলতে পারেনি।

উপন্যাসটির সমাপ্তিতে লেখক কুলীন বামুনের চৈতন্যোদয়ের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা কোথাও আকস্মিক হয়ে ওঠেনি। তবে কৌলীন্যপ্রথার কলঙ্কময় চিত্র তুলে ধরার যে উদ্দেশ্যের কথা লেখক 'ভূমিকা'তে উল্লেখ করেছেন, উপন্যাসটিতে তা প্রতিফলিত হওয়ায় নানা উপকাহিনীর ভিড়ে আখ্যানভাগ শিথিলবদ্ধ হয়েছে।

বংশকৌলীন্যের কুফল দেখিয়ে, ভ্রান্ত কৌলীন্য সম্মান বর্জন করার পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্য বর্তমান দীনেশচরণ বসুর 'নিরাশ প্রণয়' (১২৯৫) উপন্যাসে। 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলেছেন,

"বর্তমান কৌলীন্যপ্রথার অনুরোধে দিন দিন সমাজের যে সকল দুর্গতি ঘটিতেছে, পিতামাতা কৌলীন্যপ্রথার অনুরোধে প্রাণসমা কন্যাকে সুপাত্রের করে সমর্পণ করিতে পারিতেছেন না।...কৌলীন্যপ্রথা রক্ষার কারণ, সপত্নী সত্ত্বেও তাহার উপর আবার অনায়াসে কন্যাদান করিতেছেন, এই সকল বিষয় সাধারণকে জ্ঞাত করানই উদ্দেশ্য।"

কাহিনী অংশে দেখি, সুরজার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের প্রণয় সত্ত্বেও সুরজার পিতা দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে কন্যা সম্প্রদান করতে অস্বীকার করেন, যেহেতু সে কুলীন নয়। সুরজা নগেন্দ্রকে মৃত্যুর আকাঙক্ষা জানায় এবং অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহের পূর্বদিন সুরজা আত্মহত্যা করে। নগেন্দ্র শোকে সুরজার চিতায় ঝাঁপ দেয়। শোকে সুরজার মা অন্নপূর্ণা প্রাণত্যাগ করেন। উন্মত্তপ্রায় দেবেন্দ্রনাথ কাশীবাসী হন।

কৌলীন্যপ্রথাজনিত সামাজিক সমস্যাগুলির চিত্র দানের যে উদ্দেশ্যের কথা 'বিজ্ঞাপনে' লেখক উল্লেখ করেছেন, উপন্যাসটিতে তা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারেননি।

অজস্র ক্ষুদ্র ঘটনা উপন্যাসটির বক্তব্য বিষয়কে প্রায় আবৃত করে রেখেছে। এর ফলে গ্রন্থের অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি কাহিনীর সংহতি নাশ করেছে। সুরজার সঙ্গে নগেন্দ্রের প্রণয় প্রসঙ্গ বেশি স্থান পায়নি। অথচ এই প্রণয়ী যুগলের প্রণয়-পরিণামের ভিত্তিতে উপন্যাসের নামকরণ। লেখকের মাত্রাবোধের অভাবই মূল ঘটনাটিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে।

এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখিয়ে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্যের কথা লেখক 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করেছিলেন, কার্যত তিনি একেবারে ব্যর্থ হননি। উপন্যাসটি সমকালীন জনমানসে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

"...কৌলীন্যপ্রথার বিষময় ফল যদি দেখিতে চান, তবে ইহা পাঠ করুন।"[৪] গ্রন্থটি পাঠে জনৈক পাঠকের এ মন্তব্য তারই পরিচায়ক। 'Indian Mirror'[৫]-এর অনুরূপ

৪. দীনেশচরণ বসু, 'নিরাশ প্রণয়' ১ম পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত, সং ১২৯৫

৫. 'Indian Mirror', January 13, 1889

মনোভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির প্রচারধর্মিতাই এর সব নয়, সাহিত্যের দিকও ছিল, যা 'এডুকেশন গেজেটের'[৬] দৃষ্টি এড়ায়নি।

কৌলীন্য মর্যাদায় ভূষিত, বহুবিবাহকারী ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যজনিত কুলীন পত্নীর নির্যাতন ও অসহায়তার করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসে। উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি লেখক রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে উৎসর্গ করেন।

উপন্যাসটিতে বর্ণিত বংশকৌলীন্যের বলি কালীতারার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক বলেন,

"কালীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখের সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীরখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে। দেখিলে তাহাকে চত্বরিংশৎ বৎসরের চিররোগিণী বলিয়া বোধ হয়।" (ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ)

বিবাহের পাত্র নির্বাচনে পাত্রের বংশকৌলীন্য অপেক্ষা গুণকৌলীন্যই অধিক বিচার্য। অথচ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে বংশকৌলীন্যই পাত্র নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। মূল উপন্যাসটি থেকে শরৎ ও বিন্দুর কথোপকথনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে তার পরিচয় মিলবে :

"বিন্দু। আচ্ছা শরৎবাবু। তোমার মা দেখে শুনে এমন ঘরে বিয়ে দিলেন কেন? বের সময় বরকে দেখেছিলাম, লোকে বলে তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর ছিল।

শরৎ। বিন্দু দিদি, সে কথা আর জিজ্ঞেস কর না। মার এ সম্বন্ধে অধিক মত ছিল না, বরেদের কুল বড় ভাল, লোকে বললে বর্দ্ধমান জেলায় এমন কুল পাওয়া দুষ্কর। পাড়ায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ করতে লাগলেন, বাবা তাতে মত দিলেন, সুতরাং মা কি করেন? বিবাহ দিয়ে অবধি মা সেই বিষয়ে দুঃখ করেন, বলেন, মেয়েটীকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমার ভগ্নিপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁর সংসারে অনেক দাস দাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র।" (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

সমাজ-সমর্থিত এজাতীয় হৃদয়বিদারক ঘটনা, পারিবারিক জীবনের এই অসঙ্গতি ও বিপর্যয় রমেশচন্দ্রকে উপন্যাস রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। আচারে ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন হিন্দু সমাজে প্রচলিত চিরাচরিত রীতিনীতির প্রতি। অথচ কৌলীন্যের নামে হিন্দুসমাজে যে অনাচার প্রবেশ করেছিল, তার বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেননি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উদারনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, ব্যক্তি অধিকারে বিশ্বাসী রমেশচন্দ্রকে এখানে আমরা সংস্কারকের ভূমিকায় দেখতে পাই। তাঁর মতে, ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। সাহিত্যিক সমাজকে শুধু অনুসরণ করবেন না, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সমকালীন সময়ে প্রকাশিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে লেখকের এরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই।[৭]

৬. 'এডুকেশন গেজেট', ১২৯৬, ২৯ ভাদ্র

৭. ড. সুনীল সেন, 'রমেশচন্দ্র দত্ত', পৃ. ১৬

বহুবিবাহকারীর দুরবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের লেখা 'সমাজ' (১৮৯৪) নামে অপর একটি উপন্যাসে।

স্ত্রীর সেবাশুশ্রূষা, আকাঙ্ক্ষা ও বংশরক্ষার অজুহাতে প্রৌঢ় তারিণীবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সঙ্কল্প করেন। দলপতি, সমাজপতি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রাপ্তিযোগের আশায় তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। প্রতিবেশীর কন্যা নবম বয়স্কা বালিকা গোপবালাকেই এ বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করে তারিণীবাবু গোপবালার মায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠান। ধর্মের ধ্বজাধারী এসব বৃদ্ধদের রকমসকম দেখে গোপবালার মা মারমুখী হয়ে ওঠেন, "বলিস্ কি পোড়ার মুখী, আমার মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিব। ৫০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচি মেয়ের বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে খাবে, গয়না নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে? হইলাম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই থাকিব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করিব না। ওমা ছি ছি। বলি বুড়ো যে আমার গোপীর ঠাকুরদার বয়সী, বাছা উমার যদি ছেলে থাকিত, সে যে আজ প্রায় গোপীর বয়সী হইত, বিন্দুর মেয়ে যে প্রায় আমার গোপীর বয়সী, আর সেই বিন্দুর জ্যেঠা, উমার বাপ, সে কিনা আমার গোপীকে বিয়ে করতে চায়? বলি যম কি বুড়োদের ভুলে থাকে লো? আর বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতিনী বয়সী ফুটফুটে মেয়ে দেখেও মুখ দিয়ে নাল পড়ে? ছি ছি। অমন বুড়োর মুখে আগুন।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

তারিণীবাবু পিছু হটবার লোক নন। গোপবালার সহোদর ভাই গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে এ ব্যাপারে গোপনে পত্রে যোগাযোগ করেন। গোকুলচন্দ্র সুযোগ বুঝে সাড়ে চার হাজার টাকা নগদ পণের বিনিময়ে এ ব্যাপারে সম্মত হয়। তারিণীবাবুর দুরবস্থার সূত্রপাত হতে দেরি হয়নি। বিয়ের অল্পদিন পরই গোকুলচন্দ্রের পরামর্শে তারিণীবাবুর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গোপবালার হস্তগত হয়। গৃহিণী অসুস্থ অবস্থায় এ সংবাদ শুনে অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করেন। সর্বস্ব হারিয়ে গোপবালার কৃপাপ্রার্থী হয়ে তারিণীবাবু কোনওরূপে বেঁচে রইলেন।

সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখা উল্লিখিত উপন্যাস দুটিতে সংস্কারক রমেশচন্দ্রের যে প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপও সমালোচক মহলে অভিনন্দিত হয়েছে।[৮] যদিও উপন্যাস দুটির শিল্পগত ত্রুটি[৯] এঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কৌলীন্যপ্রথাজনিত নারীমনের চিরস্থায়ী বেদনার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' (১২৯৬) উপন্যাসে।[১০]

কাহিনীতে দেখি, অমৃতলাল স্নেহলতার প্রণয়ী, কিন্তু কুলীন নয়। কাজেই স্নেহলতার পিতা চক্রান্ত করে বহুবিবাহকারী কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। স্নেহলতা অমৃতলালের প্রতি শেষ প্রণয় নিবেদন করে মৃত্যুবরণ করে। কন্যার মৃত্যুর পর পিতা

৮. ড. রামদুলাল বসু, 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ', পৃ. ১২৭

৯. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৫ম সং, পৃ. ৬৩

১০. 'স্নেহলতা' (১২৯৬). পৃ. ১৯২, 'কোন মহিলা কর্তৃক প্রণীত' ও প্রথমে লেখিকার নাম ছিল না।

যদুনাথ কৃতকর্মের অনুশোচনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে সাধুসঙ্গ লাভের ইচ্ছায় গৃহত্যাগী হন। অমৃতলালও স্নেহলতার শোকে দেশান্তরী হয়।

সামাজিক এ অসঙ্গতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য লেখিকা উপন্যাসটিতে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ তুলে ধরেছেন। যেখানে স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের বিয়ের কোনও অন্তরায় নেই। উপন্যাসটির পার্শ্বকাহিনীতে তাই স্নেহলতার মাসতুতো ভাই সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলালের বোন মোহিনীর প্রণয় ও অমৃতলালের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্ভব হয়েছে।

উপন্যাসটিতে লেখিকা বংশকৌলীন্যের বলি স্নেহলতার করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কন ছাড়াও বহুবিবাহের অসঙ্গতির দিকটি ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। যথা, "স্নেহেব খুল্লতাত পুত্র নিরুপম একটি বিয়ে করেছে। কিন্তু তার বাবা ও জ্যেঠামহাশয় বলিয়াছেন আর দুইটি করিতেই হইবে নতুবা তাহাদের মেয়ের বিবাহ হইবে না। (পৃ. ৭৩)

বহুবিবাহকারীকে নিয়ে লেখিকা রসিকতাও করেছেন, উপন্যাসটিতে তার পরিচয় পাই। যেমন—

"বাইশ বৎসরে ছয়টা বিয়ে বেশি হইল? আমার কর্তা নব্বই বৎসর বয়সে একশ'র বেশি বিয়ে করিয়াছিলেন। কুলীনের শিরোমণি অমন কুল কি আর আছে?"

অপ্রধান চরিত্র মাতঙ্গীর স্বামীর একাধিক বিবাহকেও ব্যঙ্গ করেছেন উপন্যাসটিতে।

"কেহ বলিল মাতঙ্গীর স্বামীর বিয়ে কয়টা? বিয়ে আর বেশি কি, এই বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে মাত্র ছয়টা বৈ ত নয়?" (পৃ. ৭৭)

চরিত্রচিত্রণেও লেখিকার আবেগধর্মিতার পরিচয় পাই। স্নেহলতার অসহায়তা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কৌলীন্যপ্রথার চাপে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে যে যন্ত্রণা, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্নেহলতার চরিত্রে। বিবাহিত সত্ত্বেও পূর্বপ্রণয়ীর প্রতি তার আস্থা ও অনুক্ত আকর্ষণ সতীত্ববোধের উর্ধ্বে ঘোষিত নারীত্বের জয়ধ্বনি। উপন্যাসটিতে বর্ণিত স্নেহলতার মায়ের চরিত্রের অসহায়তার দিকটি বাস্তব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুবিবাহিত বৃদ্ধের হাতে কন্যা সম্প্রদান, চরিত্রটিকে যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে। অসহায় অমৃতলাল এখানে কৃপা ও অনুকম্পার পাত্ররূপে চিত্রিত। তার প্রণয় কৃত্রিম জেনেও লেখিকা সমাজব্যবস্থার উর্ধ্বে একে স্বীকৃতি দেননি। নিরুপম চরিত্রটির অসহায়তা তদনুরূপ। মনে হয় যেন কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধবাদীরা অসহায়ভাবে এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।[১১]

লেখিকার প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। বিদগ্ধ সমাজে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। গ্রন্থটি পাঠে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য [১২] তার পরিচায়ক।

"সমাজচিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানি সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজা হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

বহুবিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি থাকায় অকুলীনরাও একাধিক বিয়ে করত এবং তা পারিবারিক অশান্তির কারণ হত। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বিমাতা'[১৩] উপন্যাসে (১৩০০)

১১. ড. রামদুলাল বসু, 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ', পৃ. ৩৫২

১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', পৃ.১৮

১৩. 'বিমাতা' (১৩০০) পৃ. ১৮৭, 'অনুসন্ধান', ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

একটি কর্তব্যসচেতন বিমাতার চিত্র অঙ্কন করে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে একাধিক বিবাহের বিরোধিতা করেছেন। বিষয়বস্তুর এই অভিনবত্বই উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে দেখি, পশুপতির সন্তান না হওয়ায় স্ত্রী তারাসুন্দরী ও মায়ের আগ্রহে পশুপতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী চারুশীলাকে তারাসুন্দরী বোনের মতো দেখলেও চারুশীলা তারাসুন্দরীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। চারুশীলা চক্রান্ত করে পশুপতির সঙ্গে তারাসুন্দরীর প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটায়। বিশ্বেশ্বরী পিসির প্ররোচনায় চারুশীলা শাশুড়ির হাত থেকে সংসারের ভারও কেড়ে নেয়। স্বামীর সোহাগ বঞ্চিতা তারাসুন্দরী কিন্তু তখনও চারুশীলাকে ভালবাসত। চারুর একটি পুত্র হলে সংবাদদাতাকে তারাসুন্দরী পুরস্কৃত করল। পিতার মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী ৭-৮ লাখ টাকা তারাসুন্দরী পায়। কিন্তু তার মদ্যপ দাদা সন্তোষ, তারাকে ছুরি মারল। তারা ক্রমে সুস্থ হল। ওদিকে তহবিল তছরুপের অপরাধে পশুপতির চাকরি যায় এবং বিশ্বেশ্বরীর বশীকরণ ওষুধ খেয়ে সে উন্মাদ হয়। সংবাদ পেয়ে তারাসুন্দরী স্বামীগৃহে আসে। তাকে দেখে পশুপতির উন্মত্ততা কমে। বিশ্বেশ্বরীর চক্রান্তে ভুলক্রমে তারা দুধে বিষ মিশিয়ে দিল, সেই দুধের একটু খেয়ে চারুর ছেলের চোখ কপালে ওঠে। চারু ছুটে এসে বাকি দুধটা খায় এবং তারও মৃত্যু ঘটে। ছেলে কিন্তু বেঁচে যায়। পশুপতি ও তারাসুন্দরীর জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। পুত্র সুবোধচন্দ্রও তারার স্নেহে বর্ধিত হতে থাকে।

উপন্যাসটিতে সপত্নীবিদ্বেষের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা বাস্তব। চারুর মনে সপত্নীবিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দেয় বিশ্বেশ্বরী পিসি। তারাসুন্দরীর ধৈর্য, সহনশীলতা ও কতর্ব্যবোধ অতুলনীয়। অনেকটা যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কনে বউ'—এর সুশীলার মতো। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অদৃষ্ট'-এর মহামায়ার মতো। চারুর সঙ্গে 'কনে বউ'-এর বড়বউয়ের সাদৃশ্য আছে। চারুর মৃত্যু পরিকল্পনায় আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায়, তবে কাহিনীটি রচনাগুণে স্বচ্ছন্দ গতিলাভ করেছে। তিনি যে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন, সমকালীন মনীষীদের মন্তব্য থেকে তা অনুমান করা যায়, "I hope you will become second Bankim chandra in time."[১৪]

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একাধিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে আমরা বহুবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন আলোচনা শেষ করলাম।

আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়সীমার মধ্যে বহুবিবাহের সমর্থনে লেখা অন্য কোনও উপন্যাস চোখে পড়েনি। যদিও তথ্য সংগ্রহকালে এ ধরনের দু-একটি উপন্যাসের সন্ধান পেয়েছি 'চরিত্রবান কুলীন' (১৯১৪)। কিন্তু তা আমার সময়সীমার বাইরে, এজন্য আমার আলোচনায় সেটি বর্জিত হল।

সবটা মিলে ফল দাঁড়াল, আন্দোলন হচ্ছে, সাহিত্যিকরাও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ কুপ্রথার নিবারণ আন্দোলনেব দ্বারা হয়েছে তা নয়। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতি জনসাধারণের ঘৃণাবোধ জন্মাতে থাকে, এর ফলেই বর্তমান সমাজ এ কুপ্রথা থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

১৪. জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, 'বংশ পরিচয়' (বিংশ খণ্ড)

বহুবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা প্রবন্ধ (১৮৫০-১৯০০)

বহুবিবাহ আন্দোলনের ছাপ পড়ল বাংলা প্রবন্ধে। ১৮৫০-এ 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'তে তারাশঙ্কর তর্করত্ন বাঙালি সমাজে মেয়েদের দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কৌলীন্যের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। আশি বছরের বুড়োর সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে, কিংবা স্বীয় কুলোচিত পাত্রের অভাবে পঞ্চাশ বছরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা, এক পাত্রতে পাঁচ, ছ'টি কন্যা সম্প্রদান উনিশ শতকে বাংলার সমাজচিত্র। তার ওপর বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনের স্বভাব তারাশঙ্করের ভাষাতেই শোনা যাক :

"কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের কথা কি কহিব, স্বামী জীবিত থাকিতেও তাহারা বিধবাপ্রায় হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীর স্বামী বৎসরে একবার আইসেন, কোন বা স্বামী বিবাহের পর সে পথ একেবারে বিস্মৃত হন আর সেদিকে ভ্রমক্রমেও পদার্পণ করেন না। এই কুলীনাভিমানী স্বামীগণের গুণের কথা কি বলিব তাঁহারদের বৎসরান্তে যদি একবার আগমন হয় এবং আসিবামাত্র যদি দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা পান তবে চির দুঃখিনী কামিনীর সহিত আলাপ করেন নতুবা তাহাকে আরো দুঃখিতা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন সুতরাং তাহাদিগের ধর্ম কিরূপে থাকে।"[১]

একাধিক স্ত্রী নিয়ে যারা ঘর করে, তাদেরও দুঃখের শেষ থাকে না। এক পাত্রে অনেক কন্যা দেওয়াতে অনেক কুলীন কন্যাকে অকালে বৈধব্যের যন্ত্রণাও ভোগ করতে হত। সমাজসচেতন তারাশঙ্কর যে সেযুগে কৌলীন্যের দোষ অনুভব করে তাকে ভাষা দিয়েছিলেন, তা আমাদের তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলে।

তারাশঙ্করের এ লেখার প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর পর ১৮৭১-এ বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', এবং ১৮৭৩-এ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত ছোটখাট দু-একটি পুস্তিকা বের হলেও বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত পুস্তিকা দু'টি এ-বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর যা বললেন সংক্ষেপে তা হল এই যে, বহুবিবাহ অতি জঘন্য এবং অতি নৃশংস ব্যাপার। ইহা 'শাস্ত্রানুমোদিত' বা 'ধর্মানুগত' নয়।

১. তারাশঙ্কর তর্করত্ন, 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (২য় সং, ১৮৫১), পৃ. ৭-৯

এ প্রথার বিলোপে শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপেরও অনুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কাজেই রাজদ্বারে আইন করে হোক আর যেভাবেই হোক এ প্রথার বিলোপ সাধন অবিলম্বে প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের ভাষায়,

"বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যারপরনাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনওমতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। এক্ষণে, বহুবিবাহ প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত ; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায় ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই জঘন্য ও নৃশংসপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্ট পরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহাদের অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের বিবেচনায় যে উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্তুতঃ রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।"[২]

প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রজ্ঞান ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই। এছাড়া উদ্ধৃত অংশে বিদ্যাসাগর সমাজে অনিষ্টকারক বহুবিবাহকে আইন করে তুলে দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলেও প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। ভাষার চমৎকারিত্বও আছে।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাটি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের মন্তব্যের কোনও কোনও অংশের সমালোচনা করলেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেই অভিমত ব্যক্ত করেন।

'বহুবিবাহ' সম্বন্ধে বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, বহুবিবাহ সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, এ বিষয়ে তিনি একমত। তবে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি প্রকাশের পর এ বিষয়ে জনসচেতনা দেখা দিয়েছে একথা ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। এছাড়া বহুবিবাহকে বিদ্যাসাগর যতদূর প্রবল বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, বাস্তবিক তা তত প্রবল নয়। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার ন্যায় বহুবিবাহও কমে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একেবারেই লোপ পাবে। যা একদিন বিনা আয়াসে লোপ পাবে তাকে জোর জবরদস্তি করে আইন করে তুলে দিলে ফল আশানুরূপ হবে না। আইন করে বন্ধ করলে আইনটি হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর ওপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত। শাস্ত্রবিচারের পথ অনুসরণ করলে এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কারণ, যে যে ক্ষেত্রে শাস্ত্র বহুবিবাহ সমর্থন করেছে সেগুলি অনুসরণ করলে স্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বঙ্কিমের বক্তব্যের কিছু অংশ মূল প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি :

২. 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (সমাজ, ২য় খণ্ড), সং ১৩৪৫, পৃ. ২৫০

"বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না।...আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত।...আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নহে, অতএব বাকি প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই।"[৩]

বঙ্কিমের বক্তব্য যে যুক্তিপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। আইন পাস করে সামাজিক কুপ্রথা যে দূর করা সম্ভব নয় তা আজ আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। শাস্ত্রকারদের ওপর নির্ভর করলে এ ব্যাপারের শেষ মীমাংসা সুদূরপরাহত। বর্তমান শিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ নিন্দিত, কিন্তু আইনে নিষিদ্ধ হলেও অশিক্ষিত সমাজে আজও কম-বেশি প্রচলিত। এ পর্যন্ত আমরা বঙ্কিমের সঙ্গে একমত। তবে এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম মুসলিম সমাজের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়[৪] এজন্য যে, মুসলিম সমাজে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা অন্তত এ ব্যাপারে ছিল। প্রবন্ধটির ভাষা বঙ্কিমের সাহিত্য প্রতিভার সাক্ষ্য বহন

৩. 'বহুবিবাহ', 'বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১২৮০

৪. নারীর অধিকার সম্পর্কে মুসলিম সমাজের মনোভাব বোঝা যায় অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর 'ইছলামের মর্মকথা' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

"মহানবী নারীকে টেনে তুললেন সম্মানিত মানুষের পর্যায়ে। পুরুষের মত নারীও পেল ধর্মের অধিকার, কর্মের অধিকার, বিদ্যার্জনের অধিকার, পিতামাতা স্বামী ভাইবোনের সম্পত্তিতে অধিকার, বিবাহে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার, অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধন ছেদন করার অধিকার। ইছলাম পুরুষদের বলেছিল, সাবধান, তোমাদের নারী তাদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার, তোমাদের উপরও তাদের তেমনি অধিকার মনে রেখো, তোমরা পরস্পর পরস্পরের অলঙ্কার।"

শরৎচন্দ্র মুসলমান নারীর এই অধিকারের প্রসঙ্গ এনেছেন হিন্দু সধবা অভয়ার মুখে। অত্যাচারী স্বামীকে ত্যাগ করে রোহিণী বাবুকে গ্রহণ করার পরে সে বলেছিল,

"যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেছেন?"

অভয়ার ইঙ্গিত মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সমাজের প্রতি। একটু পরেই সে একথা বলেছে যে, মুসলমান সমাজের এই উদারতর মনোভাবের ফলেই মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে আছে। নারীর মর্যাদা, সম্ভ্রম ও অধিকার যে সমাজে যতটা সংরক্ষিত, জগতে সে সমাজের প্রসার তত বেশি।

—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শরৎসাহিত্যে সমাজধর্মের রূপ', পৃ. ১৩৪

করছে। যুক্তিবিন্যাস ও মননশীনতাও প্রশংসনীয়। তবে প্রতিথযশা বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অকারণে যে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন যেমন—'আরবী কায়দা হেলে দোলে না', 'মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নহে' ইত্যাদি সেদিনের পাঠক ক্ষমা করেননি। কাজেই বঙ্কিমের বক্তব্যের সমালোচনা করে একাধিক পুস্তিকা লেখা হল। রচয়িতারা সকলেই বহুবিবাহের বিরোধী।

'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' এ ধরনের একটি প্রতিবাদ পুস্তক। পুস্তকটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি, পুস্তকটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 'ভারত সংস্কারক'-এ প্রকাশিত একটি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। 'ভারত সংস্কারক' [৫] পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখে,

"বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে একটা প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গদর্শন লেখক জগদ্বিখ্যাত অশেষ শাস্ত্রবিদ ভারতের অমূল্যরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি রূঢ় হস্ত প্রয়োগ করিয়া যেরূপ অবিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি আপনার কুৎসিত ভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তাহাতে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পুস্তিকা লেখক ইহাদিগের মুখপত্রস্বরূপ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে বঙ্গদর্শনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষকে বৃহদায়তন করিয়া এবং তাহার সদ্‌গুণপ্রতিষ্ঠিত যশের অনর্থক বিলোপ চেষ্টা পাইয়া বালকত্বের পরিচয় দিয়েছেন এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদর্শন সহস্র দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের অদ্বিতীয় পত্রিকা। ইনি বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহার (spirit) ভাব আমাদিগের মতে ঘৃণার্হ, কিন্তু তাঁহার অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও অখণ্ডনীয়।"

কুলীন সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বাস্তব ক্লেদাত্মক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের 'বহুবিবাহ' (১২৮৮) পুস্তিকায়। লেখক শিরোনামে লিখেছেন,

"বঙ্গীয় যুবকদের কর কমলে এই গ্রন্থ সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল।" পুস্তিকাটিতে লেখকের বক্তব্য এই যে, কুলীন সমাজে প্রচলিত বিবাহ বিবাহ পদবাচ্য নয়। এ বিবাহে পত্নীকে গৃহে আনয়ন করতে হয় না। পত্নীতে হৃদয় ও মন সমর্পণ করতে হয় না, কন্যা অর্পণ করবার সময় নানাপ্রকার স্তুতিপাঠে ও যথোচিত ধন সম্পত্তি দিয়ে জামাতাকে বরণ করতে হয়। জামাতা বিয়ের পরেই পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিবাহের রসাস্বাদনের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ বিপদে একমাত্র পতিই রক্ষা করতে পারেন কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর দেখা পাওয়া দুষ্কর। যদি কখনও সেই কামিনীর কথা মনে হয় তাহলে তিনি পত্নী সমীপে আগমন করেন। কিন্তু স্ত্রীমুখ দর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহে। যেখানে শ্বশুর জামাইয়ের দক্ষিণার কোন কসুর করেন না, সেখানে সেই গরবিনী স্বামী-সান্নিধ্য লাভ করেন। এর ব্যতিক্রম হলে কোন কামিনীর ভাগ্যে পতিদর্শন আর হয়ে ওঠে না। অথচ সেই পতির মৃত্যুসংবাদে তাকে আজীবন বৈধব্যানলে দগ্ধ হতে হয়।"

৫. 'ভারত সংস্কারক', ২০ ভাদ্র ১২৮০

একই পুস্তকে সংযোজিত অজ্ঞাতনামার লেখা 'কৌলীন্য সংশোধনী'[৬] ও 'কুলকালিমা' নামে দু'টি পুস্তিকায় কৌলীন্যপ্রথার কুফল প্রতিফলিত।

প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় এসব আলোচনা ছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', 'জ্ঞানারুণোদয়', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার সুধাবর্ষণ, 'তত্ত্ববোধিনী', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'বামাবোধিনী', 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'জন্মভূমি', 'প্রদীপ' ইত্যাদি পত্রিকায় একাধিক লেখার মাধ্যমে এ প্রথার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করা হয়। সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা হল :

১) সম্পাদকীয়, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১৯.৬.১৮৫১
২) 'বন্ধুর লিখিত বিষয়', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২৮.৭.১৮৫১
৩) 'কৌলীন্যের দোষ', 'দেশ হিতৈষীজনস্য' স্বাক্ষরিত পত্র, 'সমাচার দর্পণ', ২৪.৪.১৮৫২
৪) শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার চক্রবর্তী লিখিত পত্র, 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ২.৮.১৮৫২
৫) অস্মদ্দেশীয়েরা কেন কন্যাদায় বলিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন তৎপ্রতিকারণ, 'জ্ঞানারুণোদয়', ৩১.৮.১৮৫২ ; লেখাটিতে বাঙালি সমাজে মেয়েদের দুরবস্থার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কৌলীন্যপ্রথার কথা বলা হয়েছে।
৬) 'আমি দেশহিতৈষী', স্বাক্ষরিত পত্র, 'সংবাদ প্রভাকর', ২৮.৪.১৮৫৩
৭) 'কুলিনের ব্যবহার', 'সমাচার সুধাবর্ষণ', ২৭.৪.১৮৫৫
৮) 'বহুবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র ১৭৭৭ শক
৯) 'বহুবিবাহ', 'তত্ত্ববোধিনী', ভাদ্র ১৭৭৮ শক
১০) সম্পাদকীয়, 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৫.১১.১৮৫৬
১১) 'বহুবিবাহ নিবারণ', 'বামাবোধিনী', বৈশাখ ১২৭৩
১২) 'বহুবিবাহ', 'সোমপ্রকাশ', শ্রাবণ ১২৭৮
১৩) সম্পাদকীয়, 'বহুবিবাহ', 'সোমপ্রকাশ', ৬ ভাদ্র ১২৭৮
১৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি, পত্রিকা সম্পাদকের কাছে, 'সোমপ্রকাশ', ৮ ভাদ্র ১২৭৮
১৫) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠির উত্তরে শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতির চিঠি, 'সোমপ্রকাশ', ১৩ ভাদ্র ১২৭৮
১৬) 'সোমপ্রকাশ ও বহুবিবাহ', 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ', ১৭ই ভাদ্র ১২৭৮
১৭) 'কুলীনের বহুবিবাহ নিষেধ বিষয়ক কথা', 'হালিশহর পত্রিকা', আশ্বিন ১২৭৮
১৮) 'কুলীন পুত্র', 'সুলভ সমাচার', আষাঢ় ১২৮১
১৯) 'অলস কৌলীন্য নিষেধ', 'বামাবোধিনী', জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
২০) 'মহারাজ বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথা', 'জন্মভূমি', বৈশাখ ১৩০০

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত উল্লিখিত লেখাগুলিতে একাধারে যেমন সমস্যাটা নিয়ে

৬. 'কৌলীন্য সংশোধনী' পুস্তিকাটি রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা বলে অনুমান করা হয়।

গুরুগম্ভীর আলোচনা চোখে পড়ে, তেমনই চোখে পড়ে হাস্যপরিহাসের কড়া চাবুক মেরে এ প্রথার ক্লেদাক্ত দিকটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা। অধিকাংশ পত্রিকা এ প্রথা নির্মূল করতে আগ্রহী। এমনকী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রভৃতি যে সমস্ত পত্রিকা বিধবাবিবাহকে প্রীতির চোখে দেখেনি, তারাও এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। তবে আইনের সাহায্য নিতে অনেকেরই অনীহা। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা ওল্টালে সমকালীন সমাজমনে বিষয়টি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের স্পষ্ট ছবি চোখে পড়বে।

ইংরেজি পত্রিকাগুলিও গা বাঁচিয়ে চলেনি। প্রথমার্ধের 'এনকোয়েরার', 'দি ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজার্ভার', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ছাড়া 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'রইস্ অ্যাণ্ড রায়ত', 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন' ইত্যাদি পত্রিকা, 'অশাস্ত্রীয়, যুক্তিহীন ও নৈতিকতার হানিকারক, হাজারো পাপের উৎসমুখ, নারীত্বের অপমান'[৭] এ প্রথা রদ করার পক্ষেই মত দিয়েছে।

বহুবিবাহ সমর্থন করে লেখা কোনও প্রবন্ধ আমাদের চোখে পড়েনি। সাহিত্য যে সমাজ জীবনের প্রতিফলন, এ থেকে তা অনুমান করা যায়। দ্বন্দ্ব যা চোখে পড়ে তা হল আইনের আশ্রয় নেওয়ার যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে। ফল কী হয়েছিল, আন্দোলন অংশে বলা হয়েছে। পুনরুক্তি না করে কৌলীন্যের ক্লেদাক্ত দিকটির পরিচয়বাহী একটি গল্প-রসের আমেজময় প্রবন্ধ পত্রিকা থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। গল্পটি এই যে—

এক কুলীন পুত্র ও তার বন্ধু নৌকাযোগে কলকাতা থেকে স্বদেশে (বিল্বগ্রাম) ফিরছিল। পথে এক বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ঐ নৌকায় তাঁকে তুলে নিতে অনুরোধ করেন। আমোদে ব্যাঘাত হবে মনে করে প্রথমে বৃদ্ধকে উভয়ে নৌকায় নিতে আপত্তি করে। কিন্তু বৃদ্ধের কাকুতি-মিনতিতেও শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা বৃদ্ধকে নৌকায় তুলে নেয়। নৌকার ভিতর কুলীনপুত্র ও তাঁর বন্ধু মদ খেতে থাকেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছইয়ের উপর বসে গাঁজা টানতে শুরু করেন। কিছু সময় পর কুলীন পুত্র গাঁজার গন্ধ পায় এবং মাঝি মাল্লারা খাচ্ছে অনুমান করে কলকে চাইতে এসে দেখে ব্রাহ্মণ নিজেই ছইয়ের উপর বসে গাঁজা টানছেন। কলিকা চাইলে ব্রাহ্মণ বলেন—"আমি জ্ঞাতি ভিন্ন কাউকেই হুঁকা দিই না।" এরপর ব্রাহ্মণ তাকে উদ্দেশ্য করে—"আপনার নাম, বিবাহ, পিতামহ" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। কুলীনের ছেলে, বাপের নামই ঠিক করা কঠিন। তার উপর চৌদ্দ পুরুষের নাম। কাজেই সে আমতা আমতা করতে থাকে। ব্যাপারটা বুঝতে ব্রাহ্মণের দেরী হয় না। তিনি পুনরায় যে কোন একজনের নাম জিজ্ঞাসা করায় মাতামহ 'কুসুমায়ুধ গঙ্গোপাধ্যায়' নামটি তার মনে পড়ে। নামটি শ্রবণ মাত্রই হস্তে হুঁকা লইয়া অচল হইয়া কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণ পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া, "কি? তোমার মতামহের নাম কুসুমায়ুধ। বিল্বগ্রামে একজন মাত্র কুসুমায়ুধ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁহার একটা মাত্র কন্যা, সে কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। আরে! তাহলে যে তুমি আমার পুত্র[৮]।" এই বলে বন্ধুর হস্তে হুঁকা রেখে কুলীন পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।

৭. ড. স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পৃ. ২৭৩

৮. দ্রঃ 'সুলভ সমাচার', আষাঢ় ১২৮১

বাল্যবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা কবিতা (১৮৫০-১৯০০)

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের ছাপ পড়ল বাংলা কাব্যে। বালিকাবধূর অজ্ঞানতা, অসহায়তা, পরমুখাপেক্ষিতা, স্বাস্থ্যহানি, স্বল্পায়ুবিশিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের জন্মদান ইত্যাদি বাল্যবিবাহজনিত কুফলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যের নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে :

"রাঙ্গা বরে হবে বিয়া
হেন বাক্যে ভুলাইয়া
সাজাইয়া বিয়া দেয় পুতুলের প্রায়।
সে কি জানে কত সুখ দুঃখ আছে তায় ॥ ১১৬

পরগৃহে করে পরে বালিকা গমন,
শিখে নাই হাতে তুলে ভুঞ্জিতে যখন,
পিতামাতা সঙ্গী স্মরি কাঁদে উভরায়,
শাশুড়ী ননদী যারা
সদা গালি দেয় তারা,
গৃহকর্ম সম্পাদনে প্রাণান্তিক দায়,
শমন সমান দেখে আপন ভর্তায় ॥ ১১৭

জননীর লালনের বয়ঃক্রম যার,
সে হলো জননী সুত প্রসবিত তার।
অকালের ফলে শুভ না হয় কখন ;
ভগ্নবাহু প্রসূতির
নিত্য পীড়া সন্ততির,
অকালে জনমে পায় অকালে নিধন ;
যদি বেঁচে রয় হয় ব্যাধি নিকেতন[১] ॥" ১১৮

১. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মহিলা' (জায়া), সং ১২৮৯, পৃ. ৪৫

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বাল্যবিবাহজনিত কুফলের বাস্তব চিত্র প্রতিফলনে কবির সমাজসচেতনতার পরিচয় পাই।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিফলন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা বধূ' কবিতায়। আধ্যাত্মিকতার দিকটি বাদ দিলে নবীনা, বুদ্ধিহীনা সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা বাঙালিঘরের বালিকাবধূর মনস্তত্ত্বের দিকটি অবলম্বন করে লেখা কবিতাটি বাস্তবিক মনোহর।

"কহে এরে গুরুজনে
'ও-যে তোর পতি, ও তোর দেবতা'—ভীত হয়ে তাহা শোনে।"[২]

উদ্ধৃতিটিতে বালিকাবধূর বাস্তবচিত্র প্রতিফলনে মনস্তত্ত্বের দিকটি ছাড়া কবির সমাজসচেতনতার পরিচয়ও অভিনব।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে অসংখ্য ছোট ছোট কবিতা সে সময়ে লেখা হয়েছিল, যার অস্তিত্ব বর্তমান নেই। তবে কবিতাগুলি একসময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং লোকসঙ্গীতের আকার ধারণ করে। বৈষ্ণবচরণ বসাকের 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' থেকে এ ধরনের একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি :

"ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে
পরিপূর্ণ দশদিক ঘোর হাহাকারে।
মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে
ছারখার করিল রে স্বর্ণ ভারতেরে।
ধনমান বুদ্ধিবল সব গেল রসাতল।
জাগ রে ভারতবাসী উদ্ধার মায়েরে ॥"[৩]

বাল্যবিবাহের সমর্থনে লেখা অন্য কোনও কবিতা আমাদের চোখে পড়েনি। এ থেকে অনুমান করা যায়, বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকলেও অন্তত একে টিকিয়ে রাখার তৎপরতা সে সময় তেমন দেখা দেয়নি। তাই এর সমর্থনে কোনও কবিতাও লেখা হয় নি। তবে দু-একটি নাটকে পাত্রপাত্রীর সংলাপে কাব্যাকারে বাল্যবিবাহের সুফল বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক।

॥ ২ ॥

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত 'কনসেন্ট' বিলের প্রতিবাদে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং পত্রপত্রিকায় একাধিক গান ও কবিতায় এর বিরোধিতা করা হয়। সাহিত্যমূল্য না থাকলেও সঙ্গীতগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে সমকালীন সমাজমনে আইনটির ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

কনসেন্ট বিলের প্রতিবাদে লেখা গানগুলি থেকে বোঝা যায়, বিলটির বাস্তব সুবিধা

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বালিকা বধূ', 'খেয়া', (১৩১২-১৩)

৩. বৈষ্ণবচরণ বসাক, 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত', সং ১২৯৯ (৪র্থ), পৃ. ৪৫৩

অসুবিধা যাই থাক, দেশবাসী কিন্তু ধর্মনাশের আশঙ্কায় কাতর হয়েছিল। ১৮৯১ সালে ২রা চৈত্র কালীঘাটে যেন এক 'যুগান্তকারী' ঘটনা ঘটে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে 'মা, মা' শব্দ। সর্বত্রই "মা কালী ধর্ম্মরক্ষা কর, ধর্ম্ম যায়।" এ উপলক্ষে লেখা দু-একটি সঙ্গীত 'বেদব্যাস' থেকে উদ্ধৃত করছি[৪]।

"বড়ই কাতরে, তোমার দুয়ারে
এসেছি মা ঈশানি।
ভয়েতে বিভোল, তাই উতরোল,
কাঁদি গো মা ভবরানি।
মরি মরি মাগো কি বলিব হায়...।"

"দয়া কর ওমা শিবে নহে হিন্দুধর্ম যায়।
দয়া কর দয়াময়ী রাখ গো মা রাঙ্গা পায় ॥
তুমি দয়া না করিলে কে আর রাখে সকলে।
দয়া করে রাখ ধর্ম বলি সবে বার বার ॥
তুমি গো মা ত্রিনয়নী জগত জীবের জননী।
দয়া করে সন্তানগণে রাখ নহে প্রাণ যায় ॥
কাতরে অন্তরে মোরা ডাকি গো মা ওমা তারা।
দয়া করে হিন্দুমাঝে হও গো মা উদয় ॥
যেদিন হতে হিন্দুদলে পড়েছে বিপদ জালে
দৃঢ়রূপে ডাকি শ্যামা হও গো মা উদয় ॥"

সর্বশক্তি নিয়োগ করেও বিলটি প্রতিরোধ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বরাভয়দায়িনী জগজ্জননী কালীর চরণ শরণ নিয়েছে রক্ষণশীলেরা।

"দয়া কর ও মা শিবে নহে হিন্দুধর্ম যায়"—অথবা "দয়া করে সন্তানগণে রাখ নহে প্রাণ যায়" ইত্যাদি তারই পরিচায়ক।

কালীঘাটের 'লিবারল এসোসিয়েশনের' সভ্যগণ এ উপলক্ষে[৫] একটি গান রচনা করেন। গানটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে উদ্ধৃত করছি :

"কালী কুণ্ডলিনী শক্তি উঠ একবার
জাগো জাগো জাগো মা গো ঘুমাওনা আর।
বল বল যত বল, ধর্ম্ম হতে আর কে বল,
নহিলে সব বিফল জীবনে কি ফল—
রক্ষা কর আর্যজাতি, রাজারে দেহ সুমতি
শ্রীচরণে এই সন্ততি, করি অনিবার।"

নারীজাতিকে নিয়ে যে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা সেই নারীশক্তির কাছে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আশ্রয়ভিক্ষা। নারী এখানে কল্যাণদায়িনী শক্তি। সমাজ ও পরিবারে

৪. 'বেদব্যাস', চৈত্র ১২৯৭
৫. ড. জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', পৃ. ৪১৪

তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নারীর কাছে তার দাবিরও অন্ত নেই। এই নারীই তাদের একমাত্র আশ্রয় ও পরমা গতি। দয়াময়ী মা তারারূপে সমাজ ও পরিবারে বিদ্যমান। তবু এ নারীর প্রতি পুরুষ সমাজের অবিচার ও অত্যাচারের তুলনা নেই। সামাজিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করে, তাকে যথাযোগ্য মানবিক অধিকার বা মানবিকতা প্রদর্শনে রক্ষণশীলদলের নানা সংশয় ও দ্বিধা।

কবিতাটিতে দেবীর করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে, যেহেতু আমাদের জীবনে নারীর নীরব সেবা ও ত্যাগ করুণাময়ী দেবীর মতো পবিত্র ও স্নিগ্ধ এবং সদা কাম্য। দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণময়ী নারী যেমন তার সর্বস্ব দিয়ে পরিবারের কল্যাণ সাধন করেন, তেমনি দেবী কালীও শরণাগতের মঙ্গলবিধান করবেন।

এখানে ঘরের কর্ত্রী ও দেবী তারার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অথচ ইংরেজের হস্তক্ষেপে বাঙালি সমাজে নারীকেন্দ্রিক যে সংস্কার সাধিত হচ্ছে, তাকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাতে একদল সমাজপতির ঘোর আপত্তি। কুসংস্কারের বশে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ধর্মহানির আশঙ্কায় সংস্কার আন্দোলনের প্রতিবাদে এঁরা সোচ্চার। ধর্মীয় প্রভাবের মূল বাঙালি জীবনের কত গভীরে, উক্ত কবিতার ভাববস্তু থেকে তা অনুমেয়।

চট্টগ্রাম থেকে ১৮৯১-এ 'হায় কি সর্বনাশ' নামে একটি পুস্তিকা "গর্ভাধান বিলের প্রতিবাদকারী মহাত্মাদের পবিত্র করকমলে উপহৃত" হয়। পুস্তিকাটিতে ল্যান্সডাউনকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি গানে ইংরেজের উদার সংস্কারনীতির সঙ্গে রক্ষণশীলদের মনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মতবিরোধের সুন্দর চিত্র প্রতিফলিত :

"ওহে লর্ড ল্যান্সডাউন কেন কেন তুমি আজ
ভ্রমেতে ডুবিয়া
করিলে ধর্মের লোপ নীরবে বসিয়া ॥
কান্দিল ভারতবাসী বিশকোটী প্রজা।
কি দোষে তাদের বল দিলে এই সাজা ॥
তুলিয়াছ সতীদাহ চড়ক ঘূর্ণন।
তবে তা আপত্তি কেহ করেনি কখন ॥
শিশু সুত বিসর্জন দিলে বিসর্জন।
বিরুদ্ধে একটি স্বর ছুটেনি কখন ॥
গর্ভাধানে ধর্মনাশ হইবে দেখিয়া
মনঃ দুঃখে কাঁদে সবে কাতরে ডাকিয়া ॥"

দেশীয় আচার ও রীতিনীতিতে বিদেশি সরকারের হস্তক্ষেপ একশ্রেণীর মানুষ সমর্থন করেননি। তবে শাস্তির ভয়ে রাজকানুনকে বাধ্য হয়ে তাঁরা নতমস্তকে স্বীকার করলেও ধূমায়িত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কবির লেখনীতে সরব। উদ্ধৃতিটিতে তার পরিচয় পাই :

"রাজবিধি করে রাজা সুখে যাতে রহে প্রজা,
এ আইন যে দীনের সাজা,
রাজায় সবাই বুঝাও না,
যেন আইন করে না করে না করে না তারা!
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি। বুঝাও রাজায় জননি।

পাষণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লণ্ড ভণ্ড
কর মা দানব দলনি।" (ঐ)

প্রজার ধর্মরক্ষা রাজার কর্তব্য। রাজশক্তির কাছে সাধারণ মানুষ নিরুপায়। ভ্রমের বশবর্তী হয়ে ধর্মরক্ষার মালিক রাজা ধর্মনাশে উদ্যত হলে, আবেদন নিবেদন ছাড়া অসহায় প্রজার গত্যন্তর নেই। রাজশক্তির কাছে প্রজার এই অসহায়তার চিত্র মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যেও চোখে পড়ে। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে দেবী কালীর কাছে অসহায় আকুল আবেদন চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধে অসহায় পশুগণের আকুল আবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিলের সমর্থক অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায় নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে :

"(যত) জাতি ভ্রষ্ট দুষ্ট নষ্টেরি কথায়।
দয়া মনে ক'রে রাজা ধর্ম্মনাশ করে।
(মা গো রক্ষাকালী রক্ষা কর)" (ঐ)

কনসেণ্ট বিলের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও পত্রপত্রিকার এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে অজ্ঞাতনামার লেখা 'পাষণ্ডদলন' নামক একটি কবিতায়। সবদিক বিচার করে কবিতাটিকে কনসেণ্ট বিল বিষয়ক আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। কবিতাটিকে বিলটির বিরোধী বিচারক স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে, যেহেতু বিলটি বিচার-বিবেচনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত সিলেক্ট কমিটির পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই এর বিরুদ্ধে মত দেন।[৬] বিদেশি শাসকের সুনজরে থাকার চেষ্টা না করে, স্বধর্ম ও স্বজাতিকে রক্ষায় তাঁর এ প্রয়াস হিন্দুরা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাঙ্গে স্মরণ করেছে, তীব্র সমালোচনা করেছে সমর্থকদের। কনসেণ্ট বিল সম্পর্কিত কবিতাগুলির মধ্যে এটি সবদিক বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে অবিকল উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

"পাষণ্ড দলন

ওরে কি হল হায়! ভারত জুড়ে দেখতে এ কি পাই?
যত ভারতছাড়ার আদর আছে। গুণীর পূজা নাই।
পেনসোনিয়র, স্যার রমেশের ওজনটা নয় ভারি!
এখন নলকরেতে * দিচ্ছে শলা, হরিবোল্লা হরি।
মালাবারিতে * মলের কাঁড়ি কচ্চে এনে জড়।
দেশের হিঁদুর কথা ভেস্তে গেল, তার কথাটাই বড়।

. The Hon'ble Sir Romesh Chunder Mitter said–
"So far as the protection of child-wives from personal violence is concerned she is now sufficiently protected by the provisions of the existing criminal law."
–'The Amrita Bazar Patrika', January 15, 1891

এডিটর কলম পিষে হারায় দিশে দেখে দেশের দশা,
সময়ে শিয়াল ছানা সিংহ হল, হস্তী হল মশা ॥
একদিকে স্কোবল[গ], হাচিন্স, নলকর, ব্লিস, রমেশ আর একভিতে।
পাঁচজনেতে যুক্তি করে সিলেক কমিটিতে।
ভাই। বলতে হবে, রমেশবাবু বাপের বেটা বটে,
চারটে বাঘে খেতে এল তবু না যায় হটে।
তুমি পরাণ ধ'রে, কৃপাণ করে লড়লে ভাল, ভাই।
মোরা যে কপালপোড়া হতচ্ছাড়া ভাগ্যে মোদের নাই।
বেল্লক শাস্ত্রীভায়া মিস্ত্রী হয়ে, বেদ মেরামত করে,
এরা সাহেব 'পেয়ার' পা'বার তরে জাতটি দিতে পারে।
শাস্ত্রী বটে, রাজেন্দ্রচাঁদ কচ্ছে সমাজ আলো,
হিন্দুর ছেলে, হিঁদুর ছেলে,–সেই ত দেখায় ভালো।
কোন্ সাহেব না গিয়েছিল বিদ্যাসাগর ঘরে?
গায়ে হাত বুলা'য়ে মতটা বুঝি নিতে বিলের 'ফরে'।
সেখানেতে শক্ত ঘানি, নয় ত যথা তথা–
খুব ক'রেছে হাঁকিয়ে দেছে, মুখ হ'য়েছে ভোঁতা।
কংগ্রেসেতে হিউম সাহেব হদ্দ মজা নিলে,
পথ দেখা'য়ে প্রাণের ভয়ে পেছ কাটা'যে গেলে।
কেবল ভাই! শুধু শুধু বল্‌বে পরের তরে?
সল্ট-লেকে'তে লুনটা খেয়ে, গুণটা গেয়ে মরে।
মতিভ্রম আর কারু নয় "নেটিভ"দেরই সেটা
এতদিনে চিন্‌লে নাক কে ভাল, কে ঠেটা।
বিপদ কালে ব্রাড্‌ল্য সাহেব দিল শিঙে ফুঁকে,
কেবল আর ভারত তবে বল্‌বে রুকে রুকে?
সেই ছিল এক স্বার্থত্যাগী মানুষ বলি তারে,
ছার কপালে, মুখ চাওয়া লোক, থাকবে ক'দিন ধ'রে?
বিলাত থেকে জর্জ কার্ডউড্, বলছে গভীর নাদে,
'এই বারেতে ব্রিটিশ রাজে লাগল বিধি বাদে।
অন্য কাজ নয় ত হিঁদুর ধর্মধনে হাত!'
সাহেব হ'য়েও, তাই বলেছে কড়া কড়া বাত।
শুনে যা পৈতা ফেলা দাড়ি গুলা। বিদেশী কি বলে,
তোদের গুণে ভারত মাতা ম'লেম জ্বলে জ্বলে।
নারীর গোলাম হ'য়ে তোদের বুদ্ধি হল হত–
জান না 'ডেডলেটার' হয়ে যাবে আইন পরিণত।
দেখে যা বাঁদরগুলা অজার মুখে মাখিয়ে গেল দই!
বিলাতবাসী বাপ খুড়ো হয়, আমরা কি কেউ নই?

চুনাপুঁটি এড়িয়ে গেল স্মরণ হ'ল নাক,
সময় বুঝে বলব আবার একটু খানিক থাক।
যা বল ভাই। কোম্পানিকে সাবাস দিতে হয়।
এক চাপড়ে থামিয়ে দিলে, কংগ্রেসের ভয়।"[৭]

বাংলা কাব্যে বাল্যবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন আলোচনা থেকে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ল তা হল এই যে, বাল্যবিবাহ অত্যন্ত কুপ্রথা এ বিষয়ে কোনওরূপ মতদ্বৈধ ছিল না। তাই বাল্যবিবাহকে টিকিয়ে রাখার কোনও তৎপরতা কেহ দেখাননি, অন্তত কাব্যে আমাদের তা চোখে পড়েনি। তবে বাল্যবিবাহ রদ করার জন্য প্রস্তাবিত কনসেন্ট বিলটি দেশবাসী সমর্থন করেননি। এর কারণ, রক্ষণশীলরা ধর্মহানির আশঙ্কা করলেও, আইনগত জটিলতার কথা চিন্তা করে প্রগতিশীলরা সমর্থন জানাননি। উপরন্তু পর পর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল লক্ষ্য করে অনেকে সে সময়ে বুঝেছিলেন আইন পাস করে সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় সফলতার সম্ভাবনা কম। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলে সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাধারার পরিবর্তন আসবে এবং তখন স্বাভাবিকভাবে সমাজ থেকে এসব অশুভ রীতিনীতি বিদায় নেবে।

---

৭. 'সুবোধিনী', চৈত্র ১২৯৭

ক. নলকর—গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (রায়বাহাদুর কৃষ্ণজীলক্ষ্মণ নলকর)

খ. মালাবারি—(বেরামজি মালাবারি, ১৮৫৩-১৯১২) পার্সী সংস্কারক। কলমনবিশ ছিলেন বলে মালাবারি পাশ্চাত্যমহলে অপরিসীম খ্যাতিলাভ করেছিলেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষায় রচিত তাঁর অলঙ্কৃত বেদনা সাহিত্য অনেক বিদেশিরই মন কেড়ে নিয়েছিল। সাহেব মহলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। ২১ মার্চ, ১৮৯৯ মাদ্রাজ মেলের একটি সম্পাদকীয়তে লেখা মন্তব্যের কিছু অংশ উপস্থিত করতে পারি। 'সর্বাপেক্ষা সমর্থ দেশীয় সিভিলিয়ানদের অন্যতম মিঃ দয়ারাম গিদমল ১৮৮৮ সালে ইংরাজিতে মালাবারির একটি জীবনী লিখেছিলেন, যখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। তারই ফরাসি সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষেই মাদ্রাজ মেলের উক্ত সম্পাদকীয় রচিত হয়' যার প্রথম বাক্য—"এই শতাব্দীর অথবা অন্য কোনো শতাব্দীর কোনো ভারতীয়, বোম্বাইয়ের এই পার্সী সমাজ সংস্কারকের তুল্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন এমন বলা যাবে না।"

—দ্রঃ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬৫-৬৭

গ. স্কোবল—গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য। সম্মতি আইনের সমর্থনে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা পরে বাংলায় 'সম্পত্তির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা' নামে প্রকাশিত হয়।

বাল্যবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫০-১৯০০)

বাল্যবিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা নাটক ও প্রহসনকে আমরা এখানে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখাব। ১৮৬০ সালে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন পাস হওয়ার পর আইনের সমর্থনে লেখা নাটক ও প্রহসনের পরিচয় মিলবে প্রথম পর্যায়ে। ১৮৯১ সালে কনসেণ্ট বিল পাস হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা নাটক প্রহসনের পরিচয় মিলবে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে অনেক নাট্যকার এগিয়ে এসেছিলেন। একাধিক নাটক ও প্রহসনে বাল্যবিবাহের কুফল চিত্রিত হয়েছে। বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে যে নাটকগুলি লেখা হয়েছিল তার মধ্যে যেগুলির সন্ধান পেয়েছি সেগুলি হল :

'বাল্যবিবাহ' (১৮৬০), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
'বাল্যোদ্বাহ' (১৮৬০), শ্যামাচরণ শ্রীমানী
'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে গামছা পর গে' (১৮৬৪), হরিমোহন কর্মকার
'সম্বন্ধ সমাধি' (১৮৬৭), অজ্ঞাত
'বাল্যবিবাহ' (১৮৭৪), রামচন্দ্র দত্ত
'বাল্যবিবাহের অমৃতময় ফল' (১৮৮৪), সারদাচরণ ঘোষ

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৬০ সালে আইন পাস করে হিন্দু মেয়েদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১০ বৎসর নির্দিষ্ট হয়। বিদ্যাসাগরের সমর্থনে যে সমস্ত নাট্যকার এগিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে প্রথম নাম করা যায় শ্যামাচরণ শ্রীমানীর। নাটকটির নাম 'বাল্যোদ্বাহ' নাটক (১৮৬০)। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে লেখা নাটকগুলির মধ্যে আমাদের মতে এটি শ্রেষ্ঠ। নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নাট্যকার বাল্যবিবাহের অযৌক্তিকতা ও তার বিষময় ফলের কথা বর্ণনা করে শেষ পর্যন্ত তা প্রতিরোধ করার জন্য সকলের কাছে আবেদন করেছেন। নাটকটির 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন,

"এক্ষণে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎও যদি স্যাৎ এই নাটকে কীর্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য

সিদ্ধি বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব।"[১]

সুধীর চরিত্রটির মাধ্যমে নাট্যকার সে উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য উৎকট হলে শিল্পের বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। সুধীর চরিত্রটি এর ব্যতিক্রম নয়। সুধীর ও ধনহীন মহদাশয় এ দুটি চরিত্রের মুখে বাল্যবিবাহের যেসব দোষ উল্লিখিত হয়েছে, নাটকের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাহীনের বিষভক্ষণ এবং বলহীন ও গোপালের মৃত্যু ঘটিয়ে নাট্যকার নাটকে যে বিষাদাত্মক সুর এনেছেন তা বাল্যবিবাহের অনিবার্য পরিণতি মনে করা শক্ত। চরিত্রগুলির নামকরণের মধ্যে প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাই। যথা বলহীন ধনাঢ্য, স্বার্থপর ঢোল, লজ্জাহীন স্ত্রৈণ, চতুরা বিলাসিনী ইত্যাদি। বাল্যবিবাহের সমর্থক বিদ্যাহীন দীর্ঘ কবিতাকারে বাল্যবিবাহের সুখ বর্ণনা করে বলেছেন,

"ছেলেবেলা বিয়ে হলে হয় বড় মজা।
শাশুড়ী তুলিয়া দেয় খায় খাজা গজা ॥
আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝালে আর ঝোলে ॥
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ ॥
ঠারে ঠারে কনেটীর মুখপানে চায়
আধো আধো হাসি দেখে নয়ন জুড়ায় ॥
সহিতে না হয় কভু, পাঠশালার ক্লেশ।
খায় দায় বেড়ায় বালিশে মেরে ঠেস ॥
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুলনারী।
রতি শাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি ॥
কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায় ॥
তাই বলি এ অপেক্ষা সুখ কিবা আছে
করো না ইহার নিন্দা লোকে নিন্দে পাছে ॥"

শেষে অবশ্য বাল্যবিবাহের বিষময় ফল দেখে বিদ্যাহীন বলে,, "হা ঈশ্বর। কেনই বা আমি আমার পুত্রগণের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়েছিলাম পরে তাহাদের দশা কি হবে এই মাত্র স্মরণ হলে আমার প্রাণ দেহের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করে না।"

ধনহীন চরিত্রটির মুখ দিয়ে নাট্যকার এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন :

"আহা। সে দিনের সূর্য শীঘ্র সমাগত হউক—হা ঈশ্বর। এই ভারত ভূমির উপর করুণাবারি বর্ষণ করিয়া এই প্রজ্বলিত--অনলশিখাকে নির্বাণ কর, অবলা কুলবালাগণের গতিবিধান কর, কুসংস্কারের কেশাকর্ষণ করিয়া পৃথিবী হইতে নির্বাসিত কর এবং দেশীয় বন্ধুগণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন দুঃসহ দুর্গতিকে দূর করত এই দয়াশূন্য দেশের শ্রী সাধন কর।

১. শ্যামাচরণ শ্রীমানী, 'বাল্যোদ্বাহ' নাটক, শকাব্দ ১৭৮২, বিজ্ঞাপন।

নাটকটির প্রারম্ভে নটীর গীত, যথা,

"গেল হে গেল বঙ্গ কি আর দেখিছ রঙ্গ
দেহ হলো ভঙ্গ সবাকার ॥
না হোতে যৌবন কাল, সত্বরেতে গ্রাসে কাল, হায়
কাল চমৎকার।
তেজহীন বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মেতে নাহি প্রবৃত্তিকীর্তি
বৃত্তি, সব ভ্রষ্ট করে ॥
ভূমিষ্ঠ হোলে কুমার বিবাহ সম্বন্ধতার, সর্বা—
গ্রেতে সার বুঝি করে ॥
কে কোথা শুনেছে বাপ্, কচি ছেলে ছেলের বাপ্
অঙ্গ কাঁপে বাপ্ দেখে শুনে ॥"

ইত্যাদির মধ্যে বাল্যবিবাহজাত সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এদিক থেকে গানটি মূল নাটকের ভূমিকার মর্যাদার দাবি রাখে। নাটকটির সমাপ্তিতে বুদ্ধিহীনের দীর্ঘ খেদোক্তিতে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনার মধ্যেও নাট্যকারের প্রচারধর্মিতারই পরিচয় পাই।

"মহাশয়। বাল্যবিবাহ যেন আর এই পৃথিবীতে কেহই না করে। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে এই বিষময়ী প্রথানুঘাতকীরূপ এই ভারত ভূমে অবতীর্ণা হইয়া ইহাকে একেবারে ছারখার করিতেছে, কত কত প্রাণীর কত প্রকারে কতবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কতশত অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত কত কামিনীরা কুলে জলাঞ্জলি দিতেছে, কত কত যুবা পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে, কত কত ভদ্রসন্তানেরাও অতি ঘৃণাস্কর ও লজ্জাকর চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে এবং কতশত মহাপুরুষেরা জরা ও রোগগ্রস্ত হয়ে হীনবল পিণ্ডের ন্যায় সন্তান সকল উৎপাদন করে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছে। এই সকল পাপ প্রবাহের বাল্যবিবাহই প্রধান প্রস্রবণ, ইহাকে না সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিলে দেশের মঙ্গল নাই, প্রতিবেশীর মঙ্গল নাই, আপনার পরিবারের মঙ্গল নাই, আপনার মঙ্গল নাই।"

বাল্যবিবাহের এসব কুফল আলোচনা করে লেখক দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে ও ব্যক্তিস্বার্থে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে মাতৃভূমির উপকার সাধন করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

নাটকটির অভ্যন্তরে নটীর গীতের মধ্যে নাট্যকারের যে অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে তা যে নাটকীয় ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের অনিবার্য পরিণতিরূপে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই বলা যায় যে, নাটকটি প্রচারধর্মিতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তবে চরিত্রগুলির নামকরণের মধ্যে প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—যথা বলহীন ধনাঢ্য, ধনহীন মহদাশয়, স্বার্থপর ঢোল, বিদ্যাহীন দাম্ভিক, সুধীর সদাশয়, অর্জুন স্পৃহ ভট্টাচার্য, বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্ন ইত্যাদি। এদিক থেকে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকটির প্রয়োজনীয় অংশের পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম যে, নাট্যকার নাটকের সৌকর্য বিধানের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বিজ্ঞাপনে অভিব্যক্ত লক্ষ্যের প্রতি

দৃষ্টি রেখে (যথা দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, ব্যক্তির স্বার্থে) বাল্যবিবাহের বিষময় পরিণতিকেই এই নাটকে দর্শকের প্রত্যক্ষগোচর করে তুলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচরণের সপক্ষে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক 'সম্বন্ধ সমাধি' (১৮৬৭), নাট্যকার অজ্ঞাত। আমাদের দেশে দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত কুল সম্বন্ধ বাল্যবিবাহ সমস্যাকে কিরূপ জটিল করেছিল, নাটকটিতে তা বর্তমান। নাটকটি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয় এবং এর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, "কস্যচিৎ সম্বন্ধ শত্রুনা প্রণীতম্ কুলীন বৈদিক কুল কৌলীন্য করবাল ভূতং সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্।" নাটকটির 'বিজ্ঞাপনে' দেখি নাট্যকারের সেই একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে,

"কুলীন বৈদিকদিগের সম্বন্ধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার অভীষ্ট সমুহ সন্দর্শন করিয়াও কেহ ইহা নিবারণ করিতেছেন না। নাটক লেখা ইদানীন্তন সময়ে কুপ্রথা পেষণের একক চমৎকার যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সেই যন্ত্রের সাহায্যে এই কুপ্রথা পেষণ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমি অম্লানবদনে স্বীকার করিতেছি যে, এই নাটকযন্ত্র সুন্দররূপে নির্মিত হয় নাই। এজন্য ইহাতে কুপ্রথা পেষণকার্য সম্যকরূপে সম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সাধারণের মানস পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল এই কুপ্রথা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, এইমাত্র চেষ্টা।"

এ চেষ্টা একমাত্র 'সম্বন্ধ সমাধি' নাটক রচয়িতার নহে, সে যুগের অধিকাংশ নাট্যকারের এই একই উদ্দেশ্য। তাই নাটকগুলির সাহিত্যমূল্য প্রশংসনীয় না হলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। নাট্যকারের নাম না থাকলেও নাটকটির বক্তব্য বিষয় ও উৎসর্গপত্রের শিরোনামা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, নাটকটি 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন অথবা তাঁর ভাই প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।[২] এঁরা ছিলেন বৈদিক। সামাজিক নির্যাতনের ভয়ে সম্ভবত নিজেদের নাম গোপন রেখেছিলেন। নাটকটির কাহিনীতে দেখি,

গরিব কুলীন আশুতোষ চক্রবর্তীর একটি কন্যা জন্মিলে সামাজিক রীতি অর্থাৎ জাত মাত্রেন কন্যায়া বাগ্‌দান্ কুললক্ষণম্ অনুযায়ী সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশুতোষ পাত্রের সন্ধানে বের হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও মীমাংসা না করেই বাড়িতে ফেরে। আশুতোষের স্ত্রী আবার সামাজিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী। বাল্যবিবাহের গোঁড়া সমর্থক। তার ধারণা, এসব সামাজিক রীতিনীতির পালনই কুলীনদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় করেছে। সূত্রধরের মুখ দিয়ে বৈদিকদের কুলসম্বন্ধপ্রথার প্রতি নাট্যকারের তীব্র ব্যঙ্গ আরও বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে,

"এবার মরিয়া আমি বৈদিক হইব।
পেটের থেকে পড়ে আমি বিবাহ করিব ॥"

আশুর মামা ন্যায়ভূষণ কিন্তু আশুকে না জানিয়েই কন্যাটির জন্য পূর্বেই এক সম্বন্ধ স্থির করে রেখেছিলেন। পাত্রের কুল সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না ঠিক, তবে দুঃস্থ অবস্থা দেখে

২. ড. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৪৮

আশুর তা মনঃপূত হল না। আশুর স্পষ্ট কথা, "না খাইয়া প্রাণ গেলে কুলে কি করিবে বল।" তাই কুলীনদের এই ঘৃণ্য সামাজিক রীতিতে আস্থা না রাখতে পেরে উপায়ান্তর না দেখে শেষে সে সংস্কারক দলে নাম লেখায় এবং কন্যাকে বড় করে অন্যত্র বিয়ে দেয়। আশুর সে-সময়কার স্বগতোক্তিতে কুলীন সমাজের এ কুপ্রথার বিরুদ্ধতাই প্রমাণিত হবে :

"জনম দিবস হৈতে সম্বন্ধঘটন।
দশমে দিলেন পিতা বিবাহ বন্ধন ॥
শৈশবে বিবাহ পাশে আবদ্ধ হইয়া।
নারিনু করিতে কিছু সংসারে আসিয়া ॥
জঠর চিন্তায় গেল রজনীবাসর।
না পাইনু বিদ্যালাভে কিছু অবসর ॥
গৃহস্থ আশ্রম সব আশ্রমের সার।
বিবাহ নির্বাহ বিধি দয়ার তাহার ॥
শৈশবে প্রবেশি সেই গৃহস্থ আশ্রম।
যাতনায় অভাগার গেল এ জনম ॥"

বৈদিক সমাজের গোঁড়াদের প্ররোচনায় পূর্বনির্দিষ্ট পাত্রের অভিভাবক দুর্গাচরণ চক্রবর্তী আশুর বিরুদ্ধে আদালতে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনে। মামলায় দুর্গাচরণ হেরে যান। উচ্চতর আদালতে আপীল করলে সেখানেও ঐ রায়ই বজায় রইল। এতে বৈদিক কুলীন সমাজে শৈশববিবাহ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হয়।

বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতি দেখিয়ে আমাদের হৃদয়কে সমস্যার আঘাতে বিচলিত করলেন রামচন্দ্র দত্ত 'বাল্যবিবাহ' (১৮৭৪) নাটক লিখে।

কাহিনীতে দেখি, জয়গোপালবাবু তাঁর পুত্র মহেন্দ্রের বাল্যবিবাহ দিয়েছিলেন। শঠ ও দুর্বিনীত মহেন্দ্র অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে স্ত্রী সরলার ওপর শারীরিক ও মানসিক অকথ্য অত্যাচার শুরু করল। জয়গোপালেরই সম্পর্কে জ্ঞাতি ভূষণের প্রতি সরলা আসক্ত হয়ে পড়ল। শাশুড়ি ও স্বামীর যুগপৎ অত্যাচারে এ আকর্ষণ তীব্রতর হল। শেষপর্যন্ত সরলার জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি ঘনিয়ে এল। সবকিছু দেখে জয়গোপালবাবু মন্তব্য করেছেন : "সধবা স্ত্রীলোকের চরিত্রে দোষ ঘটে পূর্বে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। সরলা যে সকল কারণ লেখায় যদি সমস্ত সত্য হয় তাহলে বাল্যবিবাহই ত এর মূলে।"

নাট্যকারের উপযুক্ত মুনশিয়ানার অভাবে সরলার করুণ পরিণতি দর্শকের মনে দৃঢ় ও সুগভীর রেখাপাতের সুযোগ পায়নি। সেই কারণে নাটকের করুণ পরিণতি সম্পর্কে নাট্যসমালোচক মহলে দ্বিধার ভাব রয়েছে। ড. অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্যের মধ্যে আমরা সেই দ্বিধার পরিচয় পাই। তিনি মন্তব্য করেছেন,

"বাঙালী ঘরে স্বামী ও শাশুড়ী দ্বারা নিগৃহীতা বধূর প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি এতই প্রবল ছিল যে, তাহার আচরণের বিসদৃশতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সেইজন্যই ভূষণের সহিত বিবাহিতা বধূ সরলার অবৈধ প্রণয় তাঁহার কাছে অপরিমিত প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে।"[৩] সরলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ সমস্যা প্রাধান্য পায়নি, প্রণয়-বিষাদিনী মূর্তিই বড় হয়ে উঠেছে।

৩. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃ. ৬৩

॥ ২ ॥

বাল্যবিবাহ আন্দোলন পর্বের আলোচনার সময়ে আমরা কনসেন্ট বিল সংক্রান্ত ব্যাপক বিরোধিতার কথা বলেছি, সাহিত্যেও এর পরিচয় মিলবে।

কনসেন্ট বিলের প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন নাট্যকাররা। একাধিক নাটক প্রহসনে তাঁরা এর তথাকথিত ভয়াবহ রূপ তুলে ধরলেন। আইনের সুযোগ নিয়ে সামাজিক দলাদলি ও ব্যক্তিগত রোষ কী পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তার পরিচয় পাই হরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০) নাটকে।

কাহিনী অংশে দেখি, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট জমিদার। প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শত্রুতা সাধনের জন্য বহুদিন ধরেই সুযোগ সন্ধান করছিলেন। এমন সময় সম্মতি আইন পাস হল। তিনি এ আইনের সুযোগে পূর্বের শত্রুতার প্রতিশোধ নিলেন। ভূপতির পুত্র বিবাহ করে সম্মতি আইন ভঙ্গ করেছে বলে তিনি আদালতে নালিশ করলেন। ব্রাহ্মসমাজের জনৈক আচার্যের সহযোগিতায় আইন ভঙ্গের অপরাধে শেষপর্যন্ত ভূপতি এবং তার পুত্র উভয়েরই জেল হয়। সম্মতি আইনের সুযোগে শত্রুতা সাধনের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি নাটকে ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে।

সম্মতি আইনের বিরোধিতা করলেন রক্ষণশীল নাট্যকার অমৃতলাল বসু 'সম্মতি সঙ্কট' (১৮৯১) নাটকে। রক্ষণশীল সমাজ জাতিপাতের আশঙ্কায় কিরূপ অস্থির হয়ে পড়েছিল, একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে নাট্যকার তা দেখিয়েছেন।

"মানিক। আর যদি তার আগে (বারো বছরের আগে) কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয়, তখন যে দ্বিতীয়সংস্কার না করলে সূর্যিপূজা না হলে ধর্মে পতিত হতে হবে, চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে।"

মানিকের স্ত্রী রাসমণির বক্তব্যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুনর্বে হলে "জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হলে শোবে আবার আইন করছেন বারো বছর। তিলক জানে না, ঐ যে—আমার তের বছরে হয়েছিল।"

আন্দোলনের মুখপাত্র হল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক তিলক। সে প্রত্যহ মিরর কাগজ পড়ে। তার ব্যজস্তুতিমূলক উক্তিতে পণ্ডিতপ্রবর নিতাইচাঁদ সাধুখাঁ, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে।

সার্বভৌমের মুখ দিয়ে বাল্যবিবাহের সমর্থক অমৃতলাল হিন্দুধর্ম, হিন্দুনারীর সতীত্ব মহিমা ব্যাখ্যা করেন। অল্পবয়সের সন্তানও বুদ্ধিমান হয়, সার্বভৌম একাধিক মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বুঝিয়ে দেয়। সার্বভৌমের মুখ দিয়ে হিন্দুধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুগণের নিকট অমৃতলালের আবেদন প্রচারধর্মী মনোভাবের পরিচায়ক। "হিন্দুসন্তান সাবধান হও। বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের দ্বারে বান এনো না। ঐ যে গর্ভাধানের বিধি হচ্ছে বড় সর্বনাশ হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দুকুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন রয়েছে তা ছিন্ন হবে। সাবধান।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল দিকটি নাট্যকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তাই নিতাইচাঁদ সাধুখাঁ, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করা হয়েছে। পণ্ডিতদের অর্থলালসাকেও বিদ্রূপবিদ্ধ করা হয়েছে। রঙ্গিণীর গানে কনসেন্ট বিলের সমর্থক সংস্কারক নামধারী হুজুগে

মাতা বাবুদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। কারণ এই গোষ্ঠীর সমর্থনেই কনসেন্ট বিল বা সম্মতি আইন পাস হয়। রঙ্গিণীর গানে আছে,

"সংস্কারক 'তারকদা' বলেছে আমায়।
সম্পাদক, 'মদকমেদো' দেছে তায় সায় ॥
বারো না হইলে পার, যদি করে অধিকার,
দেশ হবে ছারখার, পতিগতি ব্যভিচার,
উকীল অখিল, এতে দিয়েছেন রায়।
ফুটিয়ে উঠিলে কলি তবে দিব কায় ॥"

অন্য একটি গানে,

"ভাল ভাল আমি দিব না সম্মতি।
কভু না লইব শেষে বে আইনি পতি ॥
বয়স বারোর নিচে, সম্মতি আইনে মিছে,
জ্বলুক হৃদয়ে বিছে, ফিরুক সে পিছে পিছে,
পাছু ফিরে আমি কভু চাব না চাব না।
এগারোর বরাবর নেব না নেব না ॥

গা লো সই, গা লো সই, গা লো জয় জয়!
জয় সংস্কারের জয়, জয় দেশ উদ্ধারের জয়,
গা লো লেক্‌চারের জয়, গা লো এডিটারের জয়,
কি জয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয়,
গা লো গা, মকর গঙ্গাজল।
মালাবারির পিরিতে সব হরি হরি বল ॥"

রক্ষণশীলদের গাত্রদাহ কিরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, গানগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে তা বোঝা যায়। নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে সে সময়ে দেশবাসীর মনোভাব জানা দরকার। 'অনুসন্ধান পত্রিকা'[৪] 'কি দেখিলাম, কি শিখিলাম' শিরোনামে লেখে,

"আমরা একদিকে যেমন দেখিলাম, দুর্দান্ত অসুরগণের বিকট আসুরিক অট্টহাসি, অন্যদিকে তেমনই ধর্মপর শান্তশীলগণের মর্মভেদী নিদারুণ হাহাকার। একদিকে যেমন দেখিলাম রাজা প্যারিমোহন, রাজা শশিশেখরেশ্বর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের ভাবী ভাবনা ভাবিয়া আকুল, অন্যদিকে তেমনই দেখিলাম, ব্রাহ্ম আনন্দমোহন, দ্বিজরাজ কৃষ্ণকমল ও সর্ববিরোধী শম্ভুচন্দ্র সকলেই আমাদিগকে দুর্দশার চরম সীমায় পতিত করিতে পারিলেই যেন সন্তুষ্ট। একদিকে যেমন বঙ্গবাসী দৈনিক, বঙ্গনিবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, হিন্দুরঞ্জিকা, ঢাকা প্রকাশ, টাইমস্, সুধাকর, প্রভৃতি হিন্দু

৪. 'অনুসন্ধান', ফাল্গুন, ১২৯৭

মুসনমান, খৃষ্টান ও পার্শী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী। আর অন্যদিকে দেখিলাম, ব্রাহ্মিকা সখী, সঞ্জীবনী, ব্রাহ্ম সময় প্রভৃতি হিন্দুর গৃহশত্রুরা এ বিল যাহাতে পাশ হয়, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগী।"

রক্ষণশীল অমৃতলালের কথা বাদ দিলেও উদারপন্থী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কবি নবীনচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারক স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিলটি সমর্থন করেননি। অপরদিকে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের) মন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়েছিল—কদর্য রক্ষণশীলতার চেহারা দেখে। সমকালীন পত্রপত্রিকায় এঁদের মতামত ও সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, এ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ব্যাপক হয়েছিল।[৫] অমৃতলালকেও কিরূপ ভাবিয়ে তুলেছিল তা 'সম্মতি সঙ্কটে' প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯২৯, ১৯ জানুয়ারি হরবিলাস সারদা কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিবারণ বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত না হওয়ায়—অমৃতলাল আনন্দিত হয়েছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে একটি প্রবন্ধে তাঁর সে জাতীয় মানসিকতার পরিচয় মেলে, "কালিকাদলনের ফলে সময়ে সময়ে যে নানারূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না এবং তাহারই গোটা কতক বাছা বাছা নজীর দেখাইয়া নব্যতন্ত্রের উজিরগণ সংস্কারের পরিবর্তে সংহারের অস্ত্রলাভের জন্য আজ ইংরাজ শাসনের শরণাপন্ন হইয়াছে।"[৬]

'সম্মতি সঙ্কট' (১৮৯১) নাটকেও এই জাতীয় মানসিকতার প্রতি ব্যঙ্গবিদ্ধ কটাক্ষ লক্ষ্য করি। সূচনায় কৈলাসপর্বতে মহাদেব, দুর্গা ও নারদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সন্তানদের বিপদ নিবারণের ব্যগ্রতা ইত্যাদিই তার প্রমাণ। সম্মতি সঙ্কটে ধারাবাহিক কাহিনী নেই। নক্‌শাটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি। নানাভাবে সম্মতিবিষয়ক আইনের প্রতিবাদই লেখকের অভিপ্রেত ছিল। স্টার থিয়েটারে ১৮৯১-এর ২১ মার্চ 'সম্মতি সঙ্কট' অভিনীত হয়।

এ পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক হরিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সহবাস বিভ্রাট বা দেবগণের দ্বিতীয়বার মর্ত্যে আগমন' (১২৯৮)।

কৌতুকপূর্ণ নাট্য পরিস্থিতিতে স্বর্গধামে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উপস্থিতির মধ্যে নারদের উপস্থিতি ও মর্ত্যের বিস্ময়কর সমস্যাবিষয়ে আলোকপাত।

"নারদ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, গর্ভাধান নিয়ে এত গোলযোগের কারণ কি? জানেন না? কে এক ব্যাটা হরি মাইতি বলে লোক ছিল, সে নাকি তার দশ বছরের স্ত্রীর প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তাহাতে সেই বালিকাটি নাকি মারা যায়। গবর্ণমেন্ট ফরিয়াদী হয়ে

৫. ক) 'চিত্রদর্শন', ১২৯৭ (চৈত্র) "কলিকাতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের জন্য, আইনের জন্য কখনও এত লোক একত্রিত হয় নাই...।"

খ) 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' ১৭. ১. ১৮৯১

৬. 'দৈনিক বসুমতী', ২৯ পৌষ, ১৩৩৫

তাকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেন, অনেক মামলা মোকদ্দমার পর লোকটার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়, সে ত জাহাজে চড়ে কলা দ্যাখালে আর এদিকে গবর্ণমেন্ট সেই একটা ছুতো পেয়ে একটার জন্য সমস্ত দেশটার বুকে শেল বসাবার জোগাড় কচ্চেন।

বরুণ। সে লোকটা কে আর কি জাত।

নারদ। কে হরির খুড়ো, মাধাইদাস, জেতে উড়ে না কি একটা হবে।

বরুণ। যে জাতীয় লোক সেই জাতীয়দের পক্ষে এই আইন কতকটা সম্ভবপর। ভিন্ন জাতীয়দের বুকে এ পাথর চাপানটা গবর্ণনেন্টের উচিত নয়।

বিষ্ণু। এ তো দেখতে পাচ্ছি গবর্ণমেন্টের মন্দ খেয়াল নয়।"

এজাতীয় আলাপ-আলোচনার পর প্রকৃত ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্তের জন্য দেবতারা কলকাতা দর্শনে মর্ত্যে এলেন। ময়দানে মহাসভায় শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন—অক্ষত শরীরে দীর্ঘায়ু হয়ে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখুন।

দেবগণের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ইন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর বিবাহের বয়স বাড়ানোর হাস্যকর চিত্র প্রতিফলিত। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষও লক্ষণীয়।

"ইন্দ্র। কাল ছিল দশ বছর। আজ হল বার বছর, আবার হয়ত পোনের বছরেও সম্মতির বিধান চলিবে। একেবারে গর্ভাধানের শেষ করিয়া দিলেই ত চুকে যায়। একেবারে চল্লিশ করিলেই ঠিক হইত। বার বছরের স্ত্রীলোক যদি বড় ও সবল সন্তান দিতে পারে, তা হোলে চল্লিশ বছরের মেয়ে দাড়ি গোঁফ শ্মশ্রু ও ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলংয়ের পতাকাযুক্ত বড় বড় বীরপুরুষ একেবারে প্রসব করিয়া ফেলিতে পারিত।"

মর্ত্য পরিদর্শনের পর পুনরায় দেবতারা স্বর্গধামে গমন করলেন। নাটকের সমাপ্তিতে একটি গীতে সহবাসসম্মতি সংক্রান্ত প্রশ্নটির একটি সমাজসম্মত ইতিহাস বিবৃত করেছেন নাট্যকার :

"কলিতে বাজলো ডঙ্কা দূর হবে নারী শঙ্কা
মনন কোরেছেন যত ভায়াদের দল।
দশেতে গর্ভ হোলে, গর্ভস্রাব তারে বলে
গর্ভাধান নিয়ে গেছে বড় গণ্ডগোল ॥
হোয়েছে এক নব্যদল, তার নাম ইয়ং বেঙ্গল
লেগেছে উঠে পড়ে এ কি রে বালাই।
দৈত্য দেব ত কথাই নাই, আপনা আপনি মাথা খাই
মাণিক তলায় তাদের বুঝি নাট্য জুটে নাই ॥

ধন্য, বঙ্গবাসী এই তো স্বদেশবাসী
কেমন লিখিছে দ্যাখ স্বদেশের তরে।
কোনদিকে চক্ষু নাই, রাজা প্রজা জ্ঞান নাই,
লেখাতে উন্মুক্ত সদা দ্যাখ হে অন্তরে ॥

দেখ তার লেখার কায়দা কোনদিকে নাইকো ফয়দা
প্রকৃত হিন্দুর কাজ এই তো এখন।
আর এক সহযোগী, তিনি হন মহাযোগী
সাধারণে নাম তার 'বঙ্গনিবাসী'
কেঁদেছো ধর্মের তরে, সুফল পাইবে পরে
পূজিবে সবাই যাঁরা বঙ্গের নিবাসী ॥"[৭]

সহবাস আইনের সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'পাঁচ কনে' (১৮৯৬) প্রহসনে।

বনবিহারীর একটি গীতে বিষয়টির প্রতি নাট্যকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন,

"চৌদ্দ পেরয়নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত বাড়াবাড়ি বল না কিসে।
আমি লেডী ফার্স্ট রেট
হয়েছি তাইতে ডেলীগেট,
যেতে হবে মেল ট্রেনে নইলে হবে লেট
বক্তৃতা দিয়ে শুষে দেব। ক সে হাঁড় পিষে ॥" (চতুর্থ দৃশ্য)

"বন। পিতা। কনসেন্ট বিলের সময় আমার চৌদ্দ পেরোয়নি আপনারা মুখে বলেছেন আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ কর্ব্বেন না। পুনা কংগ্রেসে যাবার জন্য আমায় ডেলীগেট্ ইলেক্ট করেছেন। আমি সোসিয়্যাল রিফর্মেশনের জন্যে যাচ্ছি, আপনি বাধা দিয়ে আমার আশায় নৈরাশ কর্ব্বেন না।"

এইভাবে বাল্যবিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত সহবাস সম্মতি আইন তৎকালীন সমাজ জীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এবং নাট্যসাহিত্যের আশ্রয়ে তা ব্যাপক প্রচারলাভ করে।

৭. 'সহবাস বিভ্রাট', হরিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫-৪৬

বাল্যবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস (১৮৫০-১৯০০)

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের ছাপ পড়েছিল বাংলা উপন্যাসে। যে সমস্ত উপন্যাসে আলোচ্য সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়ের 'সুরেন্দ্র নলিনী' (১৮৫৫), দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'শরৎচন্দ্র' (১৮৭৭-৭৮), 'যোগজীবন' (১৮৮২), অজ্ঞাতনামার 'নবদুর্গা' (১৮৮৪), পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের 'চিরসঙ্গিনী' (১৮৮৪), প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কালিমা' (১৮৮৫), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'কুলবালা' (১৮৮৫), রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬), নগেন্দ্রনাথ বসুর 'একটী চিত্র' (১৮৮৬), সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'নিরাশ প্রণয়' (১৮৮৮), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' (১৮৮৮), স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' (১ম খণ্ড, ১৮৮৯, ২য় খণ্ড, ১৮৯৩), শ্যামলাল মজুমদারের 'প্রভা' (১৮৯৬), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'কুলীনকুমারী নির্মলা' (দ্বি. সং ১৯০০) ইত্যাদি।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উল্লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন রয়েছে, এ ধরনের নির্বাচিত কয়েকটির সাহায্য নিয়ে আমরা উপন্যাস সাহিত্যে বাল্যবিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একথা বলে রাখা ভাল যে, উল্লিখিত উপন্যাসসমূহের কোনটি সর্বতোভাবে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচিত হয়নি, পাঠক তা বুঝতে পারবেন এ ঘটনা থেকে যে, অন্যান্য আন্দোলনের সাহিত্যে প্রতিফলন আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ ও পর্যালোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের সয়মসূচির মধ্যে বাল্যবিবাহ রদ করার জন্য ১৮৬০ ও ১৮৯১ সালে পরপর দু'বার আইন পাস করে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স প্রথমে ১০ বছর, পরে বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে কোনও বিধিনিষেধ আইনে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। আইন যা হয়েছিল, নারীকেন্দ্রিক।

সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, বালবিধবার সংখ্যা হ্রাস ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে মেয়েদের

বিবাহের বয়সের সময়সীমা বাড়ানো। এ দুটি বিষয়ের প্রতি সংস্কারকরা সে সময় সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহ ছাড়া অসমবিবাহ নামে আর একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, কৌলীন্যপ্রথা যার কারণ। কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করে নিজেকে ধন্য মনে করার মানসিকতা থেকে এটা হয়েছিল। কি অতিবৃদ্ধ পাত্র, কি শিশু পাত্র, যে কোনও কুলীন পাত্রে মেয়ে সম্প্রদান করা পিতামাতার কাছে একটা পারিবারিক মর্যাদার গুরুত্ব পেয়েছিল। কুলীন সমাজের বাইরে সাধারণভাবে সমাজের ভেতর ছেলে ও মেয়ে উভয়ের অল্প বয়সে বিয়েটা তখন গুরুত্ব পেয়ে আসছিল, যা আগে বলেছি। তবে অসমবিবাহ একমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তাহলে আমরা বুঝতে পারব, বাল্যবিবাহ বলতে আন্দোলনকারীরা যেমন, তেমন সাহিত্যিকরাও মেয়েদের বাল্যবিবাহজনিত অনিষ্টকারিতা মাত্র বোঝাননি। একই সঙ্গে দুই লক্ষ্য (ছেলে ও মেয়ে) সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহজনিত দাম্পত্য অসন্তোষের চিত্র—প্রতিফলিত হয়েছে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'শরৎচন্দ্র' (১৮৭৭-৭৮) উপন্যাসে।

উপন্যাসটিতে বাল্যবিবাহিত শরৎচন্দ্রের খেদোক্তির মাধ্যমে লেখক বাল্যবিবাহের কুফলের প্রতি এর সমর্থকদের যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন, পাঠককে তা অবহিত করছি :

"শরৎ। যদি জানিতাম বিবাহ দাসত্ব, তবে কখনই বিবাহ করিতাম না। যদি জানিতাম অজানিত বিষপান বিবাহ, যদি জানিতাম লুক্কায়িত ব্যাধের ফাঁস বিবাহ, যদি জানিতাম মনোবাসনা পূর্ণ করিবার দারুণ কন্টক বিবাহ, তবে যে মুহূর্তে বিবাহের কথা কর্ণে প্রবেশ করাইয়াছিল ; সেই মুহূর্তে আত্মঘাত হইতাম। কিন্তু তখন জানি নাই বিবাহ কি? তখন শৈশব সময়, সংসার সম্পূর্ণ জানিতাম না। ভুলাইয়া আত্মীয় পরিজন এই সর্পবিবরে আমাকে পাঠাইয়াছেন, এইক্ষণ কালসর্প দংশনে প্রাণ যায়? কোথায় আত্মীয় পরিজন, কোথায় স্বার্থপর সংসার?" (প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ)

উপন্যাসটিতে বর্ণিত বিষ্ণু ও শরতের কথোপকথনে বাল্যবিবাহজনিত দাম্পত্য অসন্তোষের অনুরূপ চিত্র প্রতিফলিত। পাঠকের অবগতির জন্য এর কিছু অংশ মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করছি :

"শরৎ। স্ত্রীজাতির যদি কিছু সুখ থাকে, সে সুখ যৌবনে স্বামী সহবাস। একথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের ভাগ্যে সুখ নাই। বাঙ্গালায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত, যাহারা দুগ্ধ-পোষ্য বালিকাগণকে বিবাহ করে, তাহারা স্কুলের ছাত্র, বালিকাগণের যৌবন অতিবাহিত না হইলে আর বালকগণের পাঠ্যাবস্থা শেষ হয় না। পাঠ্যাবস্থায় যাঁহারা স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা পাইলে পাইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত নহি।" (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

উল্লিখিত অংশগুলিতে বাল্যবিবাহজনিত দাম্পত্য অসন্তোষের বাস্তব চিত্র প্রতিফলনে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাই। তবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ নীতিগর্ভ বক্তৃতা লেখকের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হলেও গল্পের গতিকে মন্থর করেছে।

পুস্তকটি জনমানসকে কমবেশি আলোড়িত করেছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বান্ধব' প্রত্রিকা[১] পুস্তকটিকে 'মোটামুটির উপর প্রীতিকর' বলেছে। 'বান্ধবের' এ সমালোচনা তারই পরিচায়ক।

বাল্যবিবাহ ছাড়া অসমবিবাহের কুফল ত হয়েছে, 'যোগজীবন' (১৮৮২) নামে লেখকের অপর একটি উপন্যাসে।

কৌলীন্যের অনুরোধে শিশু বরের হাতে কোনও পরিবারের ৩৮ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত তিনটি কন্যা একই রাতে সম্প্রদান করার চিত্র তুলে ধরে লেখক একাধারে বাল্যবিবাহ ও অপরদিকে অসমবিবাহের কুফল প্রদর্শন করেছেন।

শিশু বর হরিহরকে বিবাহবাসরে কিরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার সরল বর্ণনার কিছু অংশ মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করছি :

"শিশু হরিহর বিবাহের মর্ম্ম কিছুই জানেন না, ৩৮ বৎসর বয়স্কা জ্ঞানদার ঠাট্টায় বিরক্ত হইয়া বাসরঘরে কাঁদিয়া উঠিলেন। অতিকষ্টে হরিহরের মাতুল হরিহরকে বাসরঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইয়া তাহার মন সুস্থ করিলেন। শিশুর মন সেইদিন হইতেই জ্ঞানদার প্রতি বিরক্ত হইল।" (১ম খন্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)

পরিণতিতে জ্ঞানদাই হরিহরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, উপন্যাসটিতে তা চিত্রিত করে, লেখক সম্ভবত বাল্যবিবাহের নিম্নলিখিত কুফলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

প্রথমত, পতি-পত্নীর দাম্পত্য ব্রতপালনের পথে, পবিত্র সংসারধর্ম পালনের পথে, শিশুমনে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে তা আর কখনও দূর হয় না, জ্ঞানদার প্রতি হরিহরের বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন না হওয়ার এটাই সঙ্গত কারণ।

দ্বিতীয়ত, যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতে অক্ষম স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক আক্রোশ অথবা নীতিবহির্ভূত পথে যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিজনিত উচ্ছৃঙ্খলতাবশত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করতেও অনেক সময় এসব স্ত্রীদের বিবেকে বাধত না। উপন্যাসটিকে বালক হরিহরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জ্ঞানদার মাধ্যমে লেখক তা দেখিয়েছেন।

হরিহরের দুরবস্থার চিত্র বর্ণনার মধ্যে লেখকের সমাজসচেতনতার পরিচয় ছাড়া, পরিহাসপটুতারও পরিচয় রয়েছে, যা অস্বীকার করা যায় না।

পত্রপত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। 'তত্ত্বকৌমুদী'[২] সমাজের কু-রীতি পরিবর্তনে এই প্রকার নীতিপূর্ণ উপন্যাসের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

সম্ভবত একই কারণে 'Brahma Public Opinion' লেখে[৩] "We have no hesitation in pronouncing it to be worthy of a place in the Library of every young man in this country".

১. 'বান্ধব', দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৯১, পৃ. ৫২৯-৩৩

২. 'তত্ত্বকৌমুদী', ১৬ ফাল্গুন, ১৮০২ শক

৩. 'Brahma Public Opinion', 2nd. March, 1882

প্রচারধর্মিতা ছাড়া এই নীতিগর্ভ উপন্যাসটির 'ভাষারীতি'র দিকটি 'বঙ্গবাসী'[৪] বিশেষ প্রশংসা করেছে।

বাল্যবিবাহ ও অসমবিবাহ যুগপৎ উভয় সমস্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'একটী চিত্র' (১৮৮৬) উপন্যাসে।

পাঠকের অবগতির জন্য আমরা এর কিছু অংশ মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করছি।

"যখন শুনি এক সপ্তবর্ষীয় কন্যা (যাহাকে রাত্রিতে অন্ততঃ দুইবার তুলিতে হয়) এক বৃদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে উৎকণ্ঠিত হই, অবশেষে চক্ষে জল আইসে। যখন দেখি, চতুর্দ্দোল করিয়া বাঁধা রোসনায়ের ভিতর দিয়া ১৫ নং শীখ ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক বিবাহ করিতে যাইতেছে, তখন আমাদের যুগপৎ হাস্য ও করুণারসের আবির্ভাব হয়। মনে হয় স্ত্রীলোক জড় পুত্তলিকার বিবাহ দিতেছে।...

এ প্রকারের বিবাহকে আমরা নমস্কার করি, আর যাঁহারা এ প্রকার বিবাহের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি। কিন্তু সমাজপতিগণের কথা ছাড়িয়া দিই, কেননা, তাঁহারা 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' তাঁহারা দেখিয়াও দেখিবেন না, শুনিয়াও শুনিবেন মা, বুঝিয়াও বুঝিবেন না। কেবল কতকগুলো বাজে তর্ক শিখিয়া রহিয়াছেন, বলিতে যাইলে মাথা ধরাইয়া দিবেন। সেই ভয়ে আমরাও আর বড় যাই না।"

উল্লিখিত অংশে বাল্যবিবাহ ও অসমবিবাহের বাস্তব চিত্র প্রতিফলনে লেখকের সমাজ সচেতনতার সুন্দর পরিচয় পাই। তবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখকের দীর্ঘ নীতিগর্ভ উপদেশ ও এর সমর্থকদের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ উপন্যাসটির শৈল্পিক মাধুর্য ক্ষুণ্ণ করেছে।

বাল্যবিবাহজনিত কারণে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' (১৮৮৮) উপন্যাসে।

উপার্জনক্ষমতা অর্জনের পূর্বে সামাজিক বিধান অনুসারে সংসারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হলে বালক স্বামীকে কিরূপ দুঃখানলে দগ্ধ হতে হয়, উপন্যাসটিতে বর্ণিত শরৎ ও বিনয়ের কথোপকথন প্রসঙ্গে বিনয়ের বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

"বিনয়। যাহার দায়িত্ব সে তাহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিবার পূর্ব্বেই অন্য কর্ত্তৃক তাহার মস্তকে দায়িত্বভার নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা, জনসমাজের উন্নতির মূলে, সত্যের বিস্মৃতির মূলে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার মূলে, বিবেকের প্রদীপ্তাবস্থা রক্ষাকরণের মূলে আর কি গুরুতর আঘাত করা যাইতে পারে? এমনকি এ আঘাত জনমানসে এত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে যে কালস্রোত তাহার পর বহুকালের জন্য প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইলেও তাহার সংশোধন হয় না। অল্পবয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ হওয়ার বিষময় ফল এদেশে যেমন ফলিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি নহে—ইহার কুফলের সংখ্যা গণনাতীত। এইরূপ বিবাহের পর পতি পত্নীর ব্রত পালনের পথে, পবিত্র সংসার ধর্ম্ম পালনের পথে, মনের অমিলনরূপ কন্টক যদি জন্মে, তবে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বিত

৪. 'বঙ্গবাসী', ১ ফাল্গুন, ১২৮৮

হয় না। দম্পতি চির দুঃখানলে নিমজ্জিত হয়, অনন্ত শোকানল তাহাদের অন্তরে প্রজ্বলিত থাকে। এ দুঃখানল নির্বাণ করিতে, এ শোকানলে স্নিগ্ধবারি সিঞ্চন করিতে, আজ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।...কত লোক যে অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া, স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া যাইতেছে, অকালমৃত্যু, বিধবা ও অনাথ বালক বালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে, সমাজের দুঃখদারিদ্র্যও সেই পরিমাণে বাড়াইতেছে।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

বাল্যবিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক, যথা বালক স্বামীর স্বাস্থ্যহানি, পাঠে বিঘ্ন, দাম্পত্য অসন্তোষ ইত্যাদি ছাড়া এর যে একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল, যা উপেক্ষা করা যায় না। আলোচ্য উপন্যাসে তা প্রতিফলিত করে লেখক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছেন। এদিক থেকে উপন্যাসটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

'বিদ্যাবুদ্ধি' ও 'অর্জনক্ষমতা'র অভাবসম্পন্ন পরিবারের কর্তা, বাল্যবিবাহিত পুরুষকে 'সোমপ্রকাশ'[৫] পত্রিকা সম্পাদক একটি 'দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তু' বলে অভিহিত করেছেন।

বিনয়ের মুখে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখকের নীতিগর্ভ বক্তৃতা পাঠকের বিরক্তির কারণ বলে মনে হলেও লেখকের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক।

উপন্যাসটি পত্রপত্রিকায় সমালোচিত হয়, 'নির্দোষ ও সুপাঠ্য'[৬] বলে সমালোচক মহলে অভিনন্দিতও হয়।

বাল্যবিবাহ প্রচলনের পেছনে শাস্ত্রীয় কারণই সব নয়, মানবিক বাসনা-কামনার বীজও তার মূলে রয়েছে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা'[৭] (১৮৯০) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

উপন্যাসটিতে বৃদ্ধ জগৎবাবু, আন্দোলনের সমর্থক প্রগতিশীল যুবক চারুকে বলেছেন,

"চারু তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখে ওরূপ উৎসাহের কথা শোভা পায়। কিন্তু আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে আমরা নাতি-নাতনীর মুখ দেখবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে পড়ি যে, আমাদের আর ও সকল কথা মনে আসে না।" (নবম পরিচ্ছেদ)

বাল্যবিবাহের সমর্থনে জগৎবাবু শাস্ত্রীয় কারণের আশ্রয় না নিয়ে যে মানবিক ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেছেন, ত সত্য বলে ধরে নিলে বাল্যবিবাহ-বিরোধী মনোভাব যে তখন সমাজে দানা বেঁধেছিল এবং শাস্ত্রীয় কারণেরও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, তা স্বীকার না করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, উনিশ শতকের শেষের দশকে ব্যক্তিগত কারণে সমাজে বাল্যবিবাহ চলছিল, তবে অদূর ভবিষ্যতে এসব কুপ্রথা সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যাবে, উপন্যাসটিতে লেখিকা তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

লেখিকার সমাজ সচেতনা ও চরিত্রচিত্রণের অকৃত্রিমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫. 'সোমপ্রকাশ', ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫, সম্পাদকীয়।
৬. 'বামাবোধিনী, কার্তিক, ১২৯৫
৭. 'স্নেহলতা বা পালিতা', প্রথম ভাগ, বাং ১২৯৯, পৃ. ২৩৮, 'স্নেহলতা' দ্বিতীয় খণ্ড, ইং ১৮৯৩, বাং ১২৯৯, পৃ. ১৮২। বৈশাখ ১২৯৬ থেকে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯৭ থেকে নাম বদলে 'পালিতা' করা হল।

বাল্যবিবাহের সমর্থনে জগৎবাবুর উক্তি তাঁর চরিত্রেই অনুরূপ।

চারু এখানে প্রগতিশীল সংস্কারকের ভূমিকা নিলেও বয়সে নবীন, কাজেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তার বক্তব্যও স্বাভাবিক।

বাল্যবিবাহ, বালিকাবধূর শারীরিক স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর কারণ হয়। কিশোরী পত্নীর অকালমৃত্যু গুরুতর পারিবারিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' (১৮৯৯) উপন্যাসে তা প্রতিফলিত।

উপন্যাসটিতে লেখক অবিনাশের বালিকাপত্নীর সন্তান প্রসবজনিত শারীরিক অসুস্থতা ও মৃত্যুর করুণ চিত্র তুলে ধরে এ সামাজিক ক্ষতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। "অত ছেলেমানুষের সন্তান হলে প্রায় একটা বিভ্রাট ঘটে।"—নয়নতারার এ বক্তব্য তারই পরিচায়ক।

উপন্যাসটি প্রচারধর্মী হলেও বাল্যবিবাহের ফলে বালিকাপত্নীর স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যুর যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা বাস্তব, অর্থাৎ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় লেখক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সে হিসাবে উপন্যাসটি শিল্পগুণবর্জিত নয়।

॥ ২ ॥

বাল্যবিবাহের সমর্থনে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা খুবই স্বল্প। আমরা একমাত্র পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের 'চিরসঙ্গিনী' (১৮৮৪) উপন্যাসটিকে, বিষয়টি সপক্ষে উল্লেখ করতে পারি।

বাল্যবিবাহ শিক্ষার পরিপন্থী নয় বরং সহায়ক, উপন্যাসটিতে তা প্রতিফলিত। লেখকের বক্তব্য,

"যদি বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার সময় তাহাদিগকে স্বামীর অধীন করা না যায়, কোন মূঢ় মানব অস্বীকার করিবে যে, ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা সংসার কার্যক্ষেত্রে বিষময় ফল প্রসূন হওয়া অসম্ভব...?"

বাল্যবিবাহের সমর্থনে লেখা এ উপন্যাসটিতে লেখক যে যুক্তিজাল বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছেন, তা অনেকটা হাস্যকর।

বাল্যবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা উপন্যাসগুলির আলোচনায় দেখলাম, বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গটি বাংলা উপন্যাসের স্বল্পতম পরিসরে স্থান পেয়েছে। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে বাল্যবিবাহ সমাজ থেকে একেবারে দূর না হলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসছিল। সমস্যাটি তাই তেমন প্রবল ছিল না। কাজেই একদিন যে তা সুনিশ্চিতভাবে সমাজ থেকে দূর হবে, তা সে সময়ে অনেকেই অনুমান করেছিলেন। অবশ্য সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রয়াসও এ পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বাল্যবিবাহ আন্দোলন ও বাংলা প্রবন্ধ (১৮৫০-১৯০০)

বাল্যবিবাহজনিত সমস্যা বাংলাদেশে কি পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে বাংলায় বেশি বইপত্র লেখা হয়নি। না হওবার মানে কিন্তু এই নয় যে, সমকালীন বাঙালি সাহিত্যিকরা বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি যে তাঁদের কতখানি ভাবিয়ে তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পুরনো পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টালে। সাময়িকপত্রে বাল্যবিবাহের পক্ষেবিপক্ষে এসব লেখালেখি যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমরা পাই বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উনিশ শতকের সব মনীষীকেই। বিদ্যাসাগরকে দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ উনিশ শতকে এই মানুষটি সম্ভবত প্রথম বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে বাঙালি সমাজকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। প্রবন্ধটির নাম 'বাল্যবিবাহের দোষ'। প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা নিয়ে শাস্ত্রসম্মত বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে সমাজপ্রগতির স্বার্থে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য নিম্নরূপ :

১) বাল্যবিবাহ দৈহিক দুর্বলতার কারণ। ২) বাল্যবিবাহ বন্ধ না হলে স্ত্রীশিক্ষা হবে না, ফলে জনশিক্ষারও প্রসার ঘটবে না। ৩) পুরুষের পক্ষে উপার্জন ক্ষমতার আগেই বিবাহ ঘটনায় অর্থসঙ্কট ও পরমুখাপেক্ষিতা। ৪) দুষ্প্রবণতা যা বিদ্যারত হলে জাগা সম্ভব নয় ইত্যাদি দোষের কথা বলার পর, বিবাহের উদ্দেশ্য যে পতি-পত্নীর পরস্পর প্রণয়, তা উল্লেখ করে বলেন,

"যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্র যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয় কালে তাদৃশ পরিণেতরা আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।...

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে, অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না। অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্রপরিচয়ের কথা

দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়ন সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুলঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না কেবল প্রণয়ী ভর্ত্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহ পরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।"[১]

যুগপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মন যে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল, ওপরের দু'টি তার প্রমাণ। বিবাহ ব্যাপারটাকে শাস্ত্রের নাগপাশ থেকে ও প্রজাসৃষ্টির তা থেকে মুক্ত করে নরনারীর পরস্পরের মনের মিল ও প্রণয়কেই প্রাধান্য দিয়ে, স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন, তা সেকালে চিন্তা করা যায় না, এমনকি একালেও অনিচ্ছার বশেই স্বীকৃত হয়।

প্রবন্ধটিতে আবেগ অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এছাড়া শব্দচয়নের নিপুণতা, ভাষার গাম্ভীর্য, বিরাম চিহ্নের বহুল প্রয়োগ ইত্যাদি যে সমস্ত গুণে বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত, প্রবন্ধটিতে তা বর্তমান। তবে পুনরুক্তি দোষ, শব্দাড়ম্বর ইত্যাদি দু'-একটি ত্রুটিও চোখে পড়ে।

উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের দশ বছর পর বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করে আইন পাস করা হয়। এ বয়সসীমা ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত, কাজেই এ নিয়ে কোনও বাদ-প্রতিবাদ হয়নি। এর বারো বছর পর অর্থাৎ ১৮৭২-এ 'তিন আইন' পাস করে ব্রাহ্মরা সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪, ছেলেদের ১৮ বছর নির্দিষ্ট করে। ১৮৭৮-এ আইনটির উদ্যোক্তা কেশবচন্দ্র সেন নিজেই তা লঙ্ঘন করে কন্যার বিয়ে দেন। পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদের ঝড় উঠল, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে লেখা অজস্র প্রবন্ধও প্রকাশিত হল আন্দোলনের ইতিহাসে যার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে সাহিত্যের বিচারে সেগুলি মূল্যহীন, কাজেই আমাদের আলোচনায় তা স্বাভাবিকভাবে বাদ পড়ছে। অ-ব্রাহ্ম হিন্দুরাও এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না, বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স বাড়ানোর জন্য এঁরা আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশ্য যাঁরা এ সংস্কার সমর্থন করলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ দু'-একজন উদারপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যতিক্রম মাত্র।

সত্তরের দশকে বাল্যবিবাহের কয়েকটি দোষের প্রতি 'মিত্রপ্রকাশ'[২] আলোকপাত করে "বাল্যবিবাহ দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ ও তাহাদিগের সন্তানাদির স্বাস্থ্যের হানি হয়, তদ্বারা মানসিক প্রকৃতি সকলের হ্রাস হইয়া পড়ে এবং অল্প বয়সে ভোগ ইচ্ছা হইলে দূর স্থানে গিয়া বিদ্যা ও অর্থোপার্জনের ব্যাঘাত হয় এবং স্ত্রী পুরুষের বাল্যাবস্থা প্রযুক্ত পরস্পরের মনোনীত করিবার ভার তাহাদিগের পিতামাতার উপরেই ন্যস্ত থাকে। বংশমর্যাদা, ধন, রূপ, বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয় তদন্ত করিয়াই কন্যাপুত্রের বিবাহ পিতামাতা দিয়া থাকেন। কিন্তু বাল্যকালে তাহাদের প্রকৃতি পরিণত নয়, এজন্য এতদূর দেখিয়া বিবাহ দিলেও পশ্চাৎ তাহাদিগের মন্দ প্রকৃতি লইয়া পরস্পরের কষ্ট জন্মাইতে পারে।"

১. 'বাল্যবিবাহের দোষ', 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (সমাজ), সং ১৩৪৫, পৃ. ৫
২. 'মিত্রপ্রকাশ', ২৩ শ্রাবণ, ১২৮৯

'মিত্রপ্রকাশ'-এর বক্তব্যের মধ্যে কোনও অভিনবত্ব নেই। বিদ্যাসাগর পূর্বেই এসব কথা বলেছিলেন। শুধু 'মিত্র প্রকাশ'ই বা কেন? বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যাঁরা জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা কেউ বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করতে পারেননি। কাজেই আমরা সেসব প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা না করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম পরে প্রকাশ-কাল-সহ উল্লেখ করব।

॥ ২ ॥

সেকালে অনেকে বাল্যবিবাহ সমর্থন করতেন, তাঁরা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে ভূদেব বাল্যবিবাহ সমর্থন করে যে বক্তব্য রাখেন তা এইরকম :

"ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা-বাপের প্রতি, ভাই-ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটী যেমন কোমল ভাবাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারও প্রায়ই মন তেমন হয় না। ছেলেবেলা বন্ধুদিগের কোন দোষই ধরিতে ইচ্ছা হয় না। তাহারা যাহা করে তাহা ভাল, যাহা বলে তাহাই মধুর। তাহাদিগের কাহাকেও দেখিলে ভাবিলে কাহার নাম মাত্র শুনিলে, মন সরল এবং আদ্র হইয়া পড়ে। ফলতঃ ছেলেবেলার সময় দাম্পত্য প্রণয়ের বীজবপন না করিয়া যাহারা বিলম্ব করে, তাহারা প্রণয় পীযূষের প্রকৃত রসাস্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত থাকে।"[৩]

পরিণত বয়সে যুবকযুবতী পরস্পর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলে উভয়ে উভয়ের চরিত্র বুঝতে পারে বলে যে ধারণা, ভূদেব তা ভিত্তিহীন মনে করে প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন,

"অন্যের স্বভাব চরিত্রের পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। এ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯/২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪/২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্যপ্রায় থাকে। একটী সুতীব্র কটাক্ষ, একটী মৃদু মধুর হাস, একটী অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়, স্বভাবচরিত্র রুচি পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না, এইজন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।[৪]

ভূদেবের অন্যান্য লেখার তুলনায় পারিবারিক প্রবন্ধের অন্তর্গত এ ধরনের প্রবন্ধগুলিই এ দেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, অথচ তাঁর মতের সঙ্গে একালের চিন্তাধারার এতটুকু মিল নেই। ভাবতে অবাক লাগে, ইনি হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং মধুসূদনের সহপাঠী। কিভাবে এমন হলেন? আপাতদৃষ্টিতে তাই একে মানব প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য

৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বাল্যবিবাহ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', একাদশ সংস্করণ, পৃ. ২-৩
৪. ঐ

বলে মনে হলেও এর মূল কারণ হিন্দু কলেজে পড়লেও ভূদেব ছিলেন মূলত পিতা বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীর ছাত্র। যার পাণ্ডিত্য হিন্দু কলেজের অধ্যাপকদেরও অজানা ছিল না। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি উদার চিন্তার অধিকারী ছিলেন বলেই পুত্রকে হিন্দু কলেজে পাঠাতে দ্বিধা করেননি। বাল্যশিক্ষাগুণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি তাঁর মনে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ইহলোকসর্বস্ব না হলেও অন্তত ইহলোকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। প্রবন্ধটিতে তারই প্রতিফলন। প্রবন্ধটির সাহিত্য-মূল্যও উল্লেখযোগ্য। নিরলঙ্কৃত ভাষা, অপূর্ব তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিশৃঙ্খলের অচ্ছেদ্য-বন্ধন, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি প্রবন্ধটিকে সাহিত্যগুণ-যুক্ত করেছে। তবে লেখকের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চোখ এড়ায় না, যা বিংশ শতাব্দীর পাঠকের বিস্মৃতির কারণ বলে[৫] অনেকে অনুমান করেন।

'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাল্যবিবাহ বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন সমাজে কিরকম বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, প্রারম্ভে তার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখেন,

"বিবাহ লইয়া ইদানীং কিছু মতান্তর দাঁড়াইয়াছে। কেহ বলেন বাল্যবিবাহ মহাপাপ, কেহ বলেন ইহা মহা পুণ্য, ইহাতে গৌরীদানের ফল হয়। কেহ বলেন বিবাহ সম্বন্ধে বিজাতীয়দিগের হস্তক্ষেপ করা অতি অন্যায়, কেহ বলেন তাহা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত।"

বাল্যবিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে এসব মন্তব্যের উত্তরে লেখক বলেন, "দেশের জলবায়ুর পার্থক্যের জন্যে এক এক দেশে এক এক নিয়ম বর্তমান। তাই প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হলে এ সব কিছুবিচার করে দেখা কর্তব্য এবং এসব বিচার করেই মনুর সময় থেকে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। ইংলণ্ডে বাল্যবিবাহ নেই, তা সেখানকার জলবায়ুর জন্য। শীতপ্রধান দেশে ২৩/২৪ বছর না হলে মেয়েরা পূর্ণযৌবনা হয় না, তাই ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে মেয়েদের বিবাহের বয়স অন্যূন ২৪ বৎসর। আবার আমাদের দেশের মত গরম দেশে ১২/১৩ বছর বয়সেই মেয়েরা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়। যৌবনই যদি বিবাহের প্রশস্ত সময় হয় তাহলে ১৩/১৪ বছরই কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সময়।

অনেকে মনে করেন ১৩/১৪ বছর বয়সে কন্যা যৌবনে উপনীত হলেও ঐ সময়ে অবয়বসমূহ পুষ্টিলাভ করে না। তাই সন্তান অপুষ্ট ও রোগগ্রস্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। এঁরা যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ এদেশে বাল্যবিবাহ বহুদিন থেকে প্রচলিত কিন্তু ভারতীয়দের শৌর্যবীর্যের অভাব কোনদিন ঘটেনি। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বাঙালী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কথা বলেছেন, যাঁর শারীরিক তেজ ও অবয়ব-সমূহ অনেকের ঈর্ষার কারণ অথচ যিনি মাত্র এগার বছর বয়স্কা বালিকার গর্ভজাত। নাম না করলেও ইনি যে লেখকের সহোদর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। লেখক সমকালীন মুসলিম সমাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে বাল্যবিবাহ অপ্রচলিত কিন্তু যাদের দৈহিক বল হিন্দুদের তুলনায় অধিক। পশ্চিম অঞ্চলেও এ রীতি প্রচলিত অথচ সেখানকার অধিবাসীরা দুর্বল নয়। কাজেই বাল্যবিবাহই দুর্বলতার একমাত্র কারণ নয়। মনুর নির্দেশ অনুযায়ী মেয়েদের বয়স যাই হোক, পুরুষদের বয়স অন্ততপক্ষে পঁচিশ বছর

৫. দ্রঃ প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), 'ভূদেব রচনাসম্ভার', (সং ১৩৭৫), ভূমিকা

হওয়া বিধেয়। মনুর এ নির্দেশ মেনে চললে আর কোন দোষ ঘটবে না। এ সব বিষয় চিন্তা না করে কেবল ইংরেজী বা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী হয়ে একদিক অবলম্বন করা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়।

আমাদের দেশে ১৩/১৪ বছর বয়সেই কন্যার দেহে যৌবনের বাহ্যিক চিহ্ন ফুটে ওঠে। যদিও এর আগে ১০/১১ বছরেই কন্যা রজস্বলা হয়। রজস্বলা কন্যা বিবাহ যোগ্য একথা অনেকেই বলেছেন, কারণ সেই সময় থেকেই যৌবন আরম্ভ। যাঁরা যৌবনের প্রথম অবস্থায় বিবাহ দিতে চান তাঁরা ঐ ১০/১১ বছরেই তা দেন। অনেকের ধারণা ঐ সময়ে বিয়ে দিলে মেয়েরা ২/১ টি দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকেও রক্ষা পেতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ দিলে পিতৃগৃহের সংস্কার কন্যার মনে প্রবল থাকে, যা স্বামীগৃহে অশান্তির কারণ হতে পারে, বাল্যবিবাহে তা এড়ানো সম্ভব। বালক বয়স থেকে উভয়ে একসঙ্গে প্রতিপালিত হলে পরস্পরের স্বভাব একরকম হয়ে যায়, কাজেই মানসিক অশান্তিরও কারণ থাকে না। অনাথা যুবতীর সংখ্যা কমাতেও বাল্যবিবাহ প্রয়োজন। পরিশেষে বাল্যবিবাহে প্রণয় গাঢ় হয় না বলে যাঁরা মনে করেন প্রবন্ধটির শেষে লেখক তাঁদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন,—

"আমাদের সংসারের এই সুখ, এই ভালবাসা কতকটা বাল্যবিবাহজনিত বলিয়া বোধ হয়। যিনি তা স্বীকার না করেন, না করুন, তাঁহারা যৌবনজাত তপ্ত প্রণয়ের পক্ষপাতী চিরকাল থাকুন, আমরা আপত্তিও করি না।....আমরা এইমাত্র বলি, যে বাল্যবিবাহের প্রণয় ক্রমে যেটুকু জন্মে, সেটুকু স্থায়ী হয়, সংসার যাত্রা সুখে কাটে।"[৬]

প্রবন্ধটিতে লেখকের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। বর্তমানে কেউ বাল্যবিবাহ সমর্থন করে না, সমর্থনযোগ্য নয়ও। দেশের আইনও এর প্রতিকূল, স্ত্রীশিক্ষারও পরিপন্থী। তবে যাঁরা এ প্রথা সমর্থন করতেন, তাঁরা অন্ততপক্ষে মেয়েদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি। স্ত্রীশিক্ষা বলতে তাঁরা গার্হস্থ্য শিক্ষাকেই বুঝতেন। পুরুষদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যেও যে তা অনিবার্যভাবে প্রসার ঘটবে বা ঘটার প্রয়োজনও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে, একথা চিন্তা করার মতো উদারতা অন্তত প্রবন্ধকারের থাকা উচিত ছিল। এর কারণ প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় তেত্রিশ বছর আগে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদ্যাসাগরও বিভিন্ন স্থানে একাধিক বালিকা বিদ্যালয় খুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েরা উত্তীর্ণও হচ্ছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীভর্তির ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন চলছে, অথচ সে সময়ে লেখক 'গৌরীদান' প্রথাকে সমর্থন জানিয়েছেন। বাল্যবিবাহজনিত দোষ এড়ানোর জন্য লেখক পুরুষের বয়সবৃদ্ধির যে কথা বলেছেন, তা কতদূর সমর্থনযোগ্য, ভেবে দেখা দরকার। ২৪/২৫ বছর বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে ১০/১২ বছর বয়স্কা বালিকার বিবাহ হয়তো বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু আমাদের সমাজে বিশেষ করে বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন সে নিয়মের অস্তিত্ব কোথায়? থাকলে হয়তো বিরুদ্ধে এত লেখালেখি হত না। একদিকে যেমন বালিকা কন্যার বিবাহ, অপরদিকে তেমনই দুগ্ধপোষ্য বালকের বিবাহ, এমন ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি?

---

৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সঞ্জীব রচনাবলী', (সং ১৯৭৩), পৃ. ৫০৬

তা কিরূপ জিনিস? যারা তা বুঝে না "বিবাহ কালো না সাদা, খাবার না পরিধানের বস্তু যাহারা জিজ্ঞাসা করে, এমত অজ্ঞান শিশুদিগকেও অনেকস্থলে এমনকি বাক্‌স্ফূর্তিহীন স্তন্যপায়ী অঙ্কবিহারী বালক বালিকাকেও বিবাহ শৃঙ্খলবদ্ধ করা হইয়া থাকে।"

এছাড়া লেখক প্রবন্ধটিতে অনাথা যুবতীর সংখ্যা হ্রাসের জন্য বাল্যবিবাহ সমর্থন করেছেন, যার বাস্তবতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

তবে প্রবন্ধটি সাহিত্যগুণযুক্ত। ভাষা সরল, সহজবোধ্য, ও অলঙ্কারবর্জিত। তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাপক সমারোহ সত্ত্বেও পাঠক সহজ রসবোধের দ্বারা প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন। এছাড়া লেখক সহজ বর্ণনায়, গীতিরসের পরিবেশনায় ও কৌতুকের অবতারণায় পাঠককে কৌতূহলী করে তুলেছেন। এদিক থেকে সঞ্জীবচন্দ্র জাত শিল্পী। যদিও আঙ্গিক শিথিলতা ও অসতর্কতা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি বাদ দিয়ে আশির দশক পর্যন্ত বাল্যবিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখা ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

বাল্যবিবাহের সমর্থনে :

১) 'পঠদ্দশায় বিবাহ হওয়া উচিত'	'কল্পনা', ৪র্থ বর্ষ, ১২৯২-৯৩, পৃ. ২৩২-২৪০ (গোবিন্দলাল দত্ত)'	
২) 'পঠদ্দশায় বিবাহ'	'ভারতী ও বালক', (শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়)	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩
৩) 'বিজয়বসন্তের কথোপকথন	'নবজীবন',	শ্রাবণ, ১২৯৪
৪) 'সংস্কারক সম্প্রদায় ও বালিকাবিবাহ',	'অনুসন্ধান',	পৌষ, ১২৯৭
৫) 'বাল্যবিবাহ' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'সাধনা',	ভাদ্র ও আশ্বিন, ১২৯৯

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে :

১) 'বিবাহ'	'ধর্মতত্ত্ব',	জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৭ শক
২) 'বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজের পরিবর্তন',	'সোমপ্রকাশ,	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫
৩) 'বাল্যবিবাহ'	'পরিচারিকা',	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬
৪) 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা',	'আর্যদর্শন',	কার্তিক-চৈত্র, ১২৮৯
৫) 'বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থার প্রতিবাদ',	'আর্যদর্শন',	ভাদ্র, ১২৯০
৬) 'বাল্যবিবাহের দোষ', (শ্রীশ)	'আর্যদর্শন'	মাঘ, ১২৯০
৭) 'বাল্যবিবাহ', (শ্রীসীতানাথ নন্দী)	'নব্যভারত',	৩য় সংখ্যা, ১২৯৩

বাল্যবিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধগুলির তালিকায় দেখা গেল বিরুদ্ধবাদীরাই দলে ভারী। সমর্থকদের বক্তব্যও যে খুব জোরালো নয় তা আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই আন্দোলন এখানে থেমে যায়নি। পক্ষে-বিপক্ষে মতবাদ ক্রমে পুষ্ট হয়ে শতাব্দীর শেষে সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় 'কনসেন্ট বিল' পাস হয় এবং মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স ১২ বছর নির্দিষ্ট হয়। 'কনসেন্ট-বিলের' সমর্থনে সে সময় পত্রপত্রিকায় দু'-একটি প্রবন্ধ[৭] বের হলেও, অজস্র প্রবন্ধ এর বিরুদ্ধেই লেখা

৭. 'ভারত সংস্কারক', শ্রাবণ ১২৮০

হয়। বিরোধীদের বক্তব্য, বিলটি পাস হলে ধর্মীয় সংস্কারের পরিপন্থী হবে। জনসাধারণের উপর পুলিসী নির্যাতনও বেড়ে যাবে। তবে লেখাগুলির কোনওটিই সাহিত্যপদবাচ্য নয় পক্ষে-বিপক্ষে মতামত মাত্র। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিলটির বিরুদ্ধে লেখা এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের নামোল্লেখই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট :

১) 'আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রদ করা যায় কিনা?'	'তত্ত্বকৌমুদী' শ্রাবণ, (শ্রী জয়গোবিন্দ সোম)	১৮০৯ শক
২) 'হরিষে বিষাদ', একটি চিত্র,	'নবজীবন',	শ্রাবণ ১২৯৪
৩) 'সম্মতি আইনে মহা আন্দোলন',	'চিত্রদর্শন',	চৈত্র ১২৯৭
৪) 'বাল্যবিবাহ ও বালিকা সহবাস'	'বেদব্যাস',	ভাদ্র ১২৯৭
৫) 'নতুন আইন'	'বেদব্যাস',	ফাল্গুন ১২৯৭
৬) 'আইনের পরিণাম'	'সুবোধিনী',	ফাল্গুন ১২৯৭
৭) 'সংস্কারক সম্প্রদায় ও বালিকাবিবাহ'	'অনুসন্ধান'	পৌষ ১২৯৭
৮) 'হিন্দুসমাজের অবনতির কারণ কি?'	'অনুসন্ধান',	চৈত্র ১২৯৭
৯) 'সহবাস সম্মতি আইন'	'জন্মভূমি',	চৈত্র ১২৯৭

ইংরেজি পত্রিকাগুলিতেও একাধিক লেখা বের হয়েছিল, যা উল্লেখের দাবি রাখে[৮]।

৮. এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু লেখা :

Age of consent	'National Magazine', December, 1890 (A Bengali Hindu)
Age of Consent	'The Amrita Bazar Patrika', January 15, 1891 (R. C. Mitra)
Age of Consent	'Reis and Rayyet', January 17, 1891
Age of Consent	'The Amrita Bazar Patrika', January 22, 1891 (The Philanth ropists)
Age of Consent	'The Amrita Bazar Patrika', January 29, 1891 (Nabin Sen)
Age of Consent	'Reis and Rayyet', January 31, 1891 (A. Mussalman)
Age of Consent	'Reis and Rayyet', February 14, 1891 (A. Hindu)
Age of Consent	'Hindu Patriot', February 16, 1891 (Rajkumar Sarvadhikari)
Age of Consent	'Reis and Rayyet', February 21, 1891

The memorial prepared by the Calcutta Commitee in support of the Age of Consent Bill–'Reis and Rayyet' February 28, 1891.

গ্রন্থপঞ্জি

আমরা এই গবেষণার কাজে এমন অজস্র গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি গ্রন্থপঞ্জিতে যেগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত গ্রন্থ সবসময়ই ব্যবহার করেছি এখানে সেগুলিই মাত্র উল্লেখ করছি :

ওদুদ, কাজী আবদুল, 'বাংলার নবজাগরণ' কলকাতা, ১৩৬৩

গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প', কলকাতা, ১৩৮২

গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' কলকাতা, ১৩৭০

গুপ্ত, সুশীলকুমার, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ' কলকাতা, ১৯৫৯

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গের মহিলা কবি' কলকাতা, ১৩৬০

গোস্বামী, জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' কলকাতা, ১৩৮১

ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ১৯৭০

ঘোষ, বিনয়, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) কলকাতা, ১৯৫৭-৫৯

ঘোষ, বিনয়, (সম্পাদিত) 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১ম-৫ম) কলকাতা,১৯৬২-৬৬

ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনন ও সাহিত্য' কলকাতা, ১৯৬৮

চক্রবর্তী, প্রবোধরাম, 'সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র' কলকাতা, ১৩৭২

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' (সমাজ) কলকাতা, ১৩৪৫

চ্যাটার্জী, সত্যেন্দ্রমোহন, 'বাংলার সামাজিক, ইতিহাসের ভূমিকা' কলকাতা, ১৯৭৪

চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (২য় খণ্ড) কলকাতা, ১৩৮০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আধুনিক সাহিত্য' কলকাতা, ১৩৮৫

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, 'আত্মজীবনী' কলকাতা, ১৯৬২

দত্ত, ভবতোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' কলকাতা, ১৩৭৫

দত্ত, ভবতোষ, 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' কলকাতা, ১৯৭৩

দত্ত, অজিত, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' কলকাতা, ১৯৬০

দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'সাহিত্য স্রোত' কলকাতা, ১৯৩২

ন্যায়রত্ন, রামগতি, 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' চুঁচুড়া, ১৩৪২

পোদ্দার, অরবিন্দ, 'বঙ্কিম মানস' কলকাতা, ১৯৫৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাংলা সাহিত্য' কলকাতা, ১৩৬৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, (সম্পাদিত) 'সঞ্জীব রচনাবলী' কলকাতা, ১৯৭৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, (সম্পাদিত) 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী' কলকাতা, ১৯৭১
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুপ্রকাশ, 'কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত' কলকাতা, ১৩১৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১ম-৫ম) কলকাতা, ১৩৫১-৫৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড) কলকাতা, ১৩৫৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বাংলা সাময়িকপত্র' (২য় খণ্ড) কলকাতা, ১৩৮৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৫ম সং) কলকাতা, ১৩৭২
বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, 'বিদ্যাসাগর' কলকাতা, ১৩৭৬
বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত' কলকাতা, ১৯৫২
বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (৩য় খণ্ড) কলকাতা, ১৩৮৫
বসু, নগেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (ব্রাহ্মণ কাণ্ড) কলকাতা, ১৯১২
বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' (১৮২৬-৫৬) কলকাতা, ১৯৭৫
বসু, রামদুলাল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ' কলকাতা, ১৯৭৪
বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'বাংলার নবজাগরণের কথা' কলকাতা, ১৩৭০
বাগল, যোগেশচন্দ্র, (সম্পাদিত) 'রমেশ রচনাবলী' (সমগ্র উপন্যাস) কলকাতা, ১৯৬০
বিশী, প্রমথনাথ, 'বাংলার লেখক' (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৩৫৭
বিশী, প্রমথনাথ, 'মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ' কলকাতা, ১৩৮১
বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' কলকাতা, ১৩০০
বিদ্যানিধি, মহেন্দ্রনাথ, 'সন্দর্ভ সংগ্রহ' কলকাতা, ১৩০৫
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' (১ম সং) কলকাতা, ১৯৬৪
ভট্টাচার্য, দেবীপদ, (সম্পাদিত) 'উপন্যাসের কথা' কলকাতা, ১৯৬১
মজুমদার, মোহিতলাল, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' কলকাতা, ১৩৭০
মজুমদার, কেদারনাথ, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' ময়মনসিং, ১৩২৪
মিত্র, ইন্দ্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' কলকাতা, ১৯৬৯
মিত্র, হবপ্রসাদ, 'বিবেকান্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা' কলকাতা, ১৩৭৫
মিত্র, অরুণকুমার, 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' কলকাতা, ১৯৭০
মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' কলকাতা, ১৯৭৩
মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, 'বাংলা কবিতার নবজন্ম' কলকাতা, ১৩৬৯
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'বাংলাগদ্যের শিল্পী সমাজ' কলকাতা, ১৯৫৭
মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি' কলকাতা, ১৯৭১
মুখোপাধ্যায়, তারাপদ, 'আধুনিক বাংলা কাব্য' কলকাতা, ১৩৮৪
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৭০
মুখোপাধ্যায়, কুমারদেব, 'ভূদেব চরিত' কলকাতা, ১৩২৪
মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ, 'বাঙলা সাময়িক সাহিত্য' ময়মনসিং, ১৩২৪
মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন, 'বঙ্গভাষার লেখক' (১ম ভাগ) কলকাতা, ১৩২১
রায়, অপূর্বকুমার, 'উনিশ শতকের বাংলা পদ্য সাহিত্যে ইংরেজি প্রভাব' কলকাতা, ১৯৭৬
রায়, সুবোধরঞ্জন, 'কবি নবীনসেনের সমগ্র কাব্য মূল্যায়ন' কলকাতা, ১৯৬২

রায়, কার্তিকেয়চন্দ্র, 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' কলকাতা, ১৯৩২
লাহিড়ী, শিপ্রা, 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' কলকাতা, ১২৯১
শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১য় সং) কলকাতা,
শীল, বৈদ্যনাথ, 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' কলকাতা, ১৯৭২
সরকার, অক্ষয়চন্দ্র, 'কবি হেমচন্দ্র' কলকাতা, ১৩১৮
সরকার, বিহারীলাল, 'বিদ্যাসাগর' (৪র্থ সং) কলকাতা, ১৯২২
সান্যাল, ত্রৈলোক্যনাথ, 'কেশবচরিত' কলকাতা, ১৯৩২
সান্যাল, দুর্গাচরণ, 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস' কলকাতা, ১৩১৭
সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর, 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' কলকাতা, ১৩৬৫
সেন, নবেন্দু, 'গদ্যশিল্পী, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' কলকাতা, ১৯৭১
সেন, সুকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড, ৩য় সং) কলকাতা, ১৩৬২
সেনগুপ্ত, প্রদ্যোত, 'বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৬

বাংলা সাময়িক পত্র ....
'অনুসন্ধান' (১২৯৪—১৩০৮), 'অন্তঃপুর' (১৩০৬-১৩০৭), 'আর্যদর্শন' (১২৮১-১২৯১), 'এডুকেশন গেজেট' (১৩২৯-১৩৩৮), 'কল্পনা' (১২৮৭-১২৯৪), 'গভর্ণমেন্ট গেজেট' (১৮৫০), 'জন্মভূমি' (১২৯৭-১৩০৪), 'তত্ত্বকৌমুদী' (১৮০১-১৮৫৪ শক), 'তত্ত্ববোধিনী' (১৭৭৩-১৮২২ শক) 'ত্রিশূল' (১৩২০--১৩৩০), 'ধর্মপ্রচারক' (১৮০১-১৮২০ শক), 'নবজীবন' (১২৯১-১২৯৬), 'নববিধান' (১৩০১-১৩০২), 'নব্যভারত' (১২৯০-১৩২৬), 'পরিচারিকা' (১২৮৫-১৩০৮), 'প্রচার' (১২৯১-১২৯৫), 'প্রদীপ' (১৩০৪-১৩১২), 'প্রবাসী' (১৩০৮-১৩১২), 'প্রবাসী' (১২৮৯-১২৯০), 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৭-১২৮২), 'বঙ্গমহিলা' (১২৮২-১২৯০), 'বান্ধব' (১২৮১-১৩১২), 'বামাবোধিনী' (১২৭০-১৩১০), 'বালক' (১২৯২), 'বিদ্যাদর্শন' (১৭৬৪ শক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৩৭৩-১৩৭৩ শক), 'বেদব্যাস' (১২৯৩-১৩০৩), 'ব্রাহ্মণ সমাজ' (১৩১৯-১৩২২), 'ভারতী' (১২৮৪-১৩০৯), 'মধ্যস্থ' (১২৮০-১২৮২), 'মহিলা' (১৩০৩-১৩১৬), 'মাসিক পত্রিকা' (১২৬২-১২৬৪), 'রহস্য সন্দর্ভ' (১২৮০), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৮৫১-১৮৭২), 'সংবাদ প্রভাকর' (১২৫৬-১২৯৯), 'সচিত্র শিশির' (১৩৩০-১৩৩৪), 'সনাতন • ধর্মোপদেশিনী' (১২৭৮-১২৭৯), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১২৮৩-১২৮৪), 'সম্বাদ ভাস্কর' (১২৫১-১২৬১), 'সমাচার দর্শন' (১২৪৪), 'সর্বশুভকরী' (১৭৭২ শক), 'সাধনা' (১২৯৮-১৩০২), 'সাধারণী' (১২৮০-১২৮২), 'সাহিত্য' (১২৯৭-১৩১০), 'সুবোধিনী' (১২৯৭-১২৯৮), 'সুলভ পত্রিকা' (১২৬০-১২৬২), 'সুলভ সমাচার' (১২৭৭-১২৮৬), 'সোমপ্রকাশ' (১২৬৮-১২৮৭), 'হালিশহর পত্রিকা' (১২৭৮-১২৭৯) 'হিন্দুদর্শন' (১২৮৮-১২৮৯)।

Ahmed, A. F. Salahuddin, 'Social Ideas and Social changes in Bengal' (1818-1835), Leiden, 1965
Bhatnagar, O. P. (Edited), 'Studies in Social History' (Modern India), Allahabad, 1964

Banerjee, Krishna Mohan, 'A Prize Essay on Native Female Education', Calcutta, 1840

Bose, B. D., 'Education in india under East India Company' (Second edition), Calcutta.

Bose, Namai Sadhan, 'Indian Awakening and Bengal', Calcutta, 1976

Baradley Birt, F. B. 'Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century'

Buckland, C. E. 'Bengal under the Lieutenant Governors', Two Volumes, Calcutta, 1901

Burke, Marie Louise, 'Swami Vivekanand in America : New Discoveries', Calcutta, 1958

Chapman (Priscilla), 'Hindu Female Education', London, 1839

Chattopadhyay, Gautam, (Edited) 'Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents)' Vol. I, Cal, 1965

Dasgupta, H. N. 'Indian Stage', Vol. II Calcutta, 1946

Dasgupta, H. N. 'Studies in Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry' (1857-1887), Calcutta, 1935

Datta, Kalikinkar, 'Dawn of Renascent India' (Second Edition) Calcutta, 1964

Datta, Kalikinkar, 'Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India', Patna, 1936

Datta, Ramesh Chandra, 'The Literature of Bengal' (Second Edition), Cal, 1896

De, Sushil Kumar, 'Bengali Literature in the Nineteenth Century', (Second Revised Edition), Calcutta, 1962

Datta, Hurchandra, 'An address on Native Female Education' Calcutta, 1856

Ghose, Jogendra Chandra, 'The Age of Consent', Calcutta, 1891

Ghose, J. C., 'Bengali Literature in the Nineteenth Century', Calcutta

Ghosh, K. C. 'Keshub Chandra Sen and the new Reformation', Hazaribag, Second Edition, 1938

Gupta, Atul Chandra (Edited), 'Studies in the Bengal Renaissance', (Bipin Chandra Paul Birth Centenary Volume), Calcutta, 1958

Heimsath, Charles H., 'Indian Nationalism and Hindu Social Reform,' Prinception N. G. 1964.

Karve, G. K., 'My Twenty years in the cause of Indian Women, Bombay, 1916

Kopf, David, 'British Orientalism and the Bengal Renaissance', Calcutta, 1969

Kopf, David, 'The Brahma Samaj and the sharping of the modern Indian Mind', Oxford, 1976

Majumdar, Pratap Chandra, 'The Life and Teachings of Keshab Chandra Sen', Calcutta, 1884

Majumdar, Jatindra Kumar, 'Raja Ram Mohan Roy and Progressive Movements in India' (1775-1875), Calcutta, 1941

Majumdar, R. C. 'Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century', Cal, 1960

Majumdar, R. C. 'History of Freedom Movement in India' (in 3 Volumes) Calcutta, 1962-64

Majumdar, R. C. 'On Ram Mohan Roy', Calcutta, 1973

Majumdar, R. C. (Edited) British Paramouncy and Indian Renaissance', Part-II, Bombay, 1965

Majumdar, R. C. 'Renascent Bengal' (1817-1857), (Proceeding of a Seminar Organised by The Asiatic Society), Calcutta, 1972

Marshman, J. C. 'The Life and Times of Carvey, Marshman and Ward' in two Vols., London, 1889

Mullar, Friedrich Max, 'Ramkrishna his Life and Sayings', Edited by Nanda Mookherjee, Calcutta, 1975

Mullar, Friedrich Max, 'Rammohun to Ramkrishna', Calcutta, 1952

Mukherjee, Amitava, 'Reform and Regeneration in Bengal', (1774-1823) Calcutta, 1968

Mukherjee, Nilmoni, 'A Bengal Zamindar Joykrishna and his times' (1808-1888) Calcutta, 1975

Malabari, B. M., 'Inphant Marriage and Enforced Widowhood in India', 1877

Natarajan, S., 'A Century of Social Reform in India', Asia Publishing House

Nivedita, Sister, 'The Master as I saw him', Calcutta, 1910

O, Malley, L. S. S. (Edited) 'Modern India and the West', Oxford, 1968

Pal, Bipin Chandra, 'Memories of my Life and Times' (Vols. II), Cal, 1932

Poddar, Arabinda, 'Renaissance in Bengal : Quests and Conforntations' (1800-1860), Simle, 1972

Riclrey, J. A., 'Selections from Educational Records', Part. II (1840-1859), Second Edition, Calcutta

Rolland, Romain, 'The Life of Ramkrishna', Almora, 1931

Sastri, Sibnath, 'History of Brahma Samaj', (Two Volumes), Calcutta, 1911-12

Sastri Sibnath, 'Men I have seen', Personal remeniscences of seven great Bengalies, Calcutta, 1966

Sastri, N. L., 'The Childmarriage restraint act' (As ammended upto date) R. B. Sethi (Edited) Second Edition, Allahabad, 1956

Sen, Amit, 'Notes on The Bengal Renaissance', (Second edition), Calcutta, 1957

Sen, P. R., 'Western influence in Bengali Literature', Calcutta, 1932

Sen, Prasanta Kumar, 'Biography of A new Faith', (Vol.II), Calcutta, 1954

Sinha, N. K. (Edited), 'The History of Bengal', (1757-1905), Calcutta, 1967

Sinha, Prodip, 'Nineteenth Century Bengal', Calcutta, 1965

Sinha, Nirmal, 'Freedom Movement in Bengal', (1819-1904), Cal, 1968

Tattabhusan, Sitanath, 'Social Reform in Bengal', Calcutta, 1904

Selected English Journals :

'The Friend of India', 'The Calcutta Review', 'The Hindoo Patriot', 'Englishman', 'The Indian Mirror', 'The Statesman', 'The Amrita Bazar Patrika', 'The Indian Daily News', 'Mookherjee's Magazine', 'The Reis and Rayyet', 'The Brahma Public Opinion', 'Journal of Asiatic Society', 'Indian Social Reform'.

উপসংহার

আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীমুক্তি আন্দোলন ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনায় 'সহমরণ' স্থান পায়নি যেহেতু বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কোনও সাহিত্য লেখা হয়নি। সহমরণ রদ হল। বিধবার ব্রহ্মচর্যের বিধান দিলেন শাস্ত্রকাররা। শুধু তাই নয়, তাঁরা একে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। জোর গলায় বললেন, "আমাদের বিধবার মত কার সমাজে এমন দেবী আছে?" এখানেই থেমে রইলেন না। কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখে, দেশাচারের দোহাই দিয়ে, সুনীতির দোহাই দিয়ে, বিধবার নির্জলা একাদশী ব্রত পালনের বিধান দিয়ে একাহারী ও সর্বপ্রকার সংযম শিক্ষার উপদেশ দিয়ে তাকে তিলে তিলে দেবী করে তোলার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। কার্যত কিন্তু এ দেবীর অধিকার ছিল শ্রাদ্ধের পিণ্ড রন্ধনে। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি অশুভ জ্ঞান করা হত। অথচ পঞ্চাশ বছর বয়সে নিতান্ত দায়ে পড়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় লোকের অনুরোধ ফেলতে না পেরে, নিতান্তই কৌলীন্য বজায় রাখতে 'শাস্ত্রপ্রবর' এ 'বিজ্ঞ মানুষটি' আর একটি বিয়ে করে আনলেন। বলে রাখা ভাল তিনি অকৃতদার নন, দারার সংখ্যাও হয়তো শতাধিক। সংসারে একাধিক অবিবাহিতা কন্যা। বিধবা কন্যাও বর্তমান, যার বয়স নববধূর তুলনায় কিছু বেশি। কাজেই নববধূর দেখাশোনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত মনে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে চলেন। যে একই বাড়িতে বাস করে একাধিক পত্নী থাকা সত্ত্বেও নিজের মেয়ের চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারে, সে কোন মুখে দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবার আত্মসংযম শিক্ষা দেয়, একবেলা আহারের বিধান দেয় ও থান ফাড়া কাপড় বরাদ্দ করে?

এ বিষয়ে সমস্ত বাঙালি সমাজ জুড়ে এক বিরাট ভণ্ডামি ছিল। ব্যাপকভাবে ভ্রূনহত্যা চললেও এই সামাজিক পাপ সম্বন্ধে সম্ভব হলে সকলে চুপ করে থাকত। যদিও বিধবার এ পদস্খলনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে পুরুষরাই দায়ী। অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তারা এরূপ কু-কর্মে প্রবৃত্ত হত। অথচ এ দায়ভার নির্লজ্জের মতো চাপিয়ে দেওয়া হত অসহায় একাহারী নারীর ওপর।

বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুঃখ, অসহায়তা এবং সামাজিক এ অনাচার দেখেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিও করেছিলেন।

বিধবাবিবাহের পক্ষে শেষপর্যন্ত আইনও পাস হল, কিন্তু এখানেই ইতি। সমাজমন প্রসন্নমনে একে মেনে নিতে পারেনি, আইন আইনই রয়ে গেল।

বিধবাসমস্যা সমাধানের পথ বের করতেই সংস্কারকরা বহুবিবাহ রদ করতে উদ্যোগী হলেন। একদল কিন্তু তখনও শাস্ত্রীয় সমর্থন জড়ো করে এ কদর্য প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেন। এদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা যে পতি-পত্নীর মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগের কথা বলেছেন, বহুবিবাহে তা কতটা সম্ভব জানিনা, তবে এ বিধানে সত্যকার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, এটা নিশ্চিত।

সত্যকার ভালবাসা থাকলে কেহ এক রাতের পর অপর রাতে ভিন্ন পত্নীতে উপগত হতে পারে না। অথচ বহুবিবাহ সগর্বে চালু থাকায় তা একান্ত স্বাভাবিক। শুধু তাই বা কেন? এক রাতে একাধিক পত্নীতে উপগত হওয়ার ব্যাপারটিও স্বাভাবিক, বিশেষ করে প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরলে। ভবানন্দ মজুমদার প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরে অনুরূপ পরিস্থিতিতে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী এই দুই পত্নী নিয়ে কিরূপ বিপদে পড়েছিলেন তার পরিচয় দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"শুনি মজুমদার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিল ॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদ হাটা আগুলিয়া পথ ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর এক চক্ষু রাঙা হয়ে বড়জনে চায় ॥

দুই পত্নীই সতীসাধ্বী। সওদাগরের আগমন শুনে উভয়েই দাসীসহ দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, ইশারাতে ছোটপত্নীর সঙ্গে সওদাগরের একটা ফয়সালা হল, তিনি দাসীদের বললেন,

"দুজনার ঘরে গিয়া দুইজনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক ॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে ॥

শেষপর্যন্ত অবশ্য বড়রাণী তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন। কর্তব্যের খাতিরে মজুমদার তাঁর ঘরেই গেলেন। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্যের অবসান হল না।

"ছেলেপিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হইল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর ॥

বেশি দেরী হলে পদ্মমুখী হয়তো মারমুখী হয়ে উঠবে একথা ভেবে মজুমদার চিন্তিত।

"রাত্রি শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কইবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কচু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥"

মজুমদারের মতো বহুবিবাহকারীদের সমস্ত চিন্তার অবসান হল। সংস্কারকরা বহুবিবাহের কদর্যরূপ তুলে ধরলেন এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন। শেষপর্যন্ত তের চাপে পড়ে এপ্রথা রদ হয়। বহুবিবাহ আন্দোলন তাই সফল আন্দোলন, সন্দেহ নেই।

নারীসমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংস্কারকরা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নিলেন। মুখোমুখি হলেন প্রবল বাধার। মেয়েদের শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করে যাঁরা চিরকাল এদের রন্ধনশালায় আবদ্ধ রাখতে চাইলেন, তাঁরা এ বিষয়ে সকলে একমত যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা 'অসতী' হয়। এদের প্রতি আমাদের বক্তব্য, উপরি উক্ত লাম্পট্য জ্ঞানাভাবেই সম্ভব। বিদ্যা ও জ্ঞান থাকলে নারীগণ কোন কুৎসিত কাজে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করবে। আত্মসংযম মনের উদারতা ইত্যাদি শিক্ষা থেকেই আসবে।

১৮৫৪-তে স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'মাসিক পত্রিকা'য় হরিহরের স্ত্রী পদ্মাবতীর মুখে সে সংশয় উপস্থিত কবেছিলেন। ' মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে?" পদ্মাবতীর মত অন্তঃপুরিকাদের আজ সে সংশয় দূর হয়েছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, চাকরি করে টাকা আনছে ও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করছে। শুধু তাই নয়, যাঁরা একসময় ভেবেছিলেন লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধিও মেয়েদের নেই, বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি তাঁদের সে ভ্রান্তি নিরশন করেছে। এ ব্যাপারে চুলচেরা হিসাব করলে বর্তমানে বরং বিপরীত দৃষ্টান্তই চোখে পড়বে। এখানেই সংস্কারকদের দূরদর্শিতা।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বাল্যবিবাহ অন্তরায় হল। তাই মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করার তাগিদ উপলব্ধি করলেন সংস্কারকরা। ১৮৬০-এ আইন পাস করে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স ১০ বৎসর নির্দিষ্ট করা হয়। ১৮৯৯-তে তা বাড়িয়ে ১২ বছর করা হল। সমাজে ঝড় উঠল, কিন্তু এখানেই এ পর্বের শেষ হল না। এর পর একের পর এক আইন পাস করে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স বাড়ানো হয়েছে।

বিংশ শতকে সাতের দশক পর্যন্ত একের পর এক আইন পাশ করে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বিবাহের বয়স বাড়ানো হয়েছে।

১৯৭৮-এ জন্মের হার ঠেকানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইন পাস করে মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স বাড়িয়ে ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বৎসর করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাল্যবিবাহ আন্দোলন যে বিফল হয়নি, বর্তমান সরকারি পদক্ষেপ তা প্রমাণ করে।

এ আন্দোলনটির ঐতিহাসিক দিকও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যবিবাহ আন্দোলনের হাত ধরেই বিংশ শতকে রাজনৈতিক আন্দোলন জোর কদমে এগিয়ে এল। এর কারণ আন্দোলন অংশে আমরা দেখেছি জনসাধারণ সংস্কার-বিমুখ। প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতিতে বিশ্বাসী, অথচ অল্পসংখ্যক মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে সরকার একের পর এক আইন পাস করে সামাজিক প্রথাসমূহের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। ১৮৯১-এ জনসাধারণের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার আইন পাস করে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স ১২ বছর নির্দিষ্ট করে যা রক্ষণশীলরা ধর্মীয় কারণে, বুদ্ধিজীবীরা আইনের জটিলতার দিক বিচার করে সমর্থন করেন নি। বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ দেশনায়ক চিন্তা

করলেন বিদেশী সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে লাভ নেই। চাই স্বরাজ। সামাজিক আন্দোলনের পর্ব শেষ হল। শুরু হল স্বাধীনতা আন্দোলন।

॥ ২ ॥

মানুষ সামাজিক জীব। কাজেই সমষ্টিগত জীবনের মাহাত্ম্য ইতিহাসে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য ও মহিমা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বাস্তব জীবনে যা ঘটে, মানুষ সাহিত্যে শুধু যে তার প্রতিবিম্বই দেখতে চায় তাই নয়, সে চায় আরও সুসম্বন্ধ ঘনীভূত ও তীব্র ছবি। এজন্য আমাদের আলোচনায় সাহিত্যও মুখ্য স্থান পেয়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় মানুষ সাহিত্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের সব দিকেরই --তা সে যে-দিকেরই হোক না কেন, বিবরণ চেয়েছে। এই চাওয়া হতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। এ চাওয়া থেকে সাহিত্য যা দিল, তা মানবজীবনের দৈনন্দিন ও সাধারণ অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, এর ওপরে অতিরিক্ত অনেক কিছু। এর ফলে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে আন্দোলনগুলির যে চিত্র ফুটে উঠল তাতে অনুভূতি আরও গভীর, আদর্শ ও কর্ম আরও উচ্চ, সুখ-দুঃখ আরও অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এককথায় সাহিত্য বাদ দিলে আন্দোলনগুলির মধ্যে মানুষের সাধারণ জীবনের ক্ষীণ ছায়া মাত্র অনুভূত হবে, এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে না। এমনকি একথা বলাও অসঙ্গত হবে না যে, ব্যক্তিগত জীবনের মহিমা সাহিত্যেই প্রথম উপলব্ধি হয়ে পরে বাস্তব জীবনে গিয়েছে। আমরা তাই বিস্মৃতির গহ্বরে লুকিয়ে থাকা সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য উদ্ধার করে পুরুষশাসিত সমাজে নারীজীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। সুধীমণ্ডলী এ প্রয়াসের গুরুত্ব স্বীকার করলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

নির্ঘণ্ট